শওকত আলী
প্রদোষে
প্রাকৃতজন

সেনরাজার শাসন থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে দেশ, তুর্কী আক্রমণ অত্যাসন্ন। তবু সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচারের শেষ নেই। সেই অত্যাচার রুখে দাঁড়ায় কখনো অন্ত্যজেরা, কখনো বৌদ্ধেরা। শাসকদের বিশেষ রোষ তাই তাদের উপরেই। তাদেরই একজন প্রশ্ন করে: "দেখো, এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই, কেবলি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে— এর শেষ কোথায়? এ জীবন কি যাপন করা যায়? বলো, কতোদিন এভাবে চলবে?"

ইতিহাসের সেই প্রদোষকালের জটিল আবর্তে ঘূর্ণ্যমান কয়েকজন প্রাকৃত নরনারীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো অন্য নামে তারা বাস করেছে সেই কালে, হয়তো অন্য কালেও। মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের যত্নকৃত শিল্প রচনায় কেন ছেদ পড়ে, কিসের অন্বেষণে তাকে নিরুদ্দেশযাত্রা করতে হয়? স্বামী পরিত্যক্তা লীলাবতী কী চায়, কেন পায় না? মায়াবতীর কোমল বাহুবন্ধন ছিন্ন করে বসন্তদাস কেন মিত্রানন্দের সঙ্গী হয়?

মানুষকে স্বপরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে বলে মিত্রানন্দ, নতজানু দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে বলে। এর বেশি সে জানে না, জানবার আবশ্যকতাও বোধ করে না। বসন্তদাসও চায় প্রচলিত ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে, কিন্তু সে আরও জানতে চায় যে, তার পরিবর্তে কী পাবে সকলে?

এসব প্রশ্নের মীমাংসা হবার আগেই ইতিহাসের ঝঞ্ঝা এসে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে। কিন্তু এইসব জিজ্ঞাসা আর ভালোবাসা, স্বপ্ন আর প্রয়াসের সারাৎসার তারা সঁপে দিয়ে যায় উত্তরসূরীদের হাতে।

বড়ো যত্নের সঙ্গে শওকত আলী লিখেছেন তাদের কথা, সেই সময়ের কথা। গবেষণার সঙ্গে এই বইতে যুক্ত হয়েছে দরদ, তথ্যের সঙ্গে মিলেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অনুপম ভাষা। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' আমাদের উপন্যাসের ধারায় একটি স্মরণীয় সংযোজন।

আনিসুজ্জামান

শওকত আলীর জন্ম ১৯৩৬ সালে। জন্মস্থান পশ্চিম বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ। স্কুলের পড়াশোনা শ্রীরামপুর ও রায়গঞ্জে। দেশ-বিভাগের চার বছর পর তাঁর চিকিৎসক পিতা সপরিবারে দিনাজপুর শহরে চলে এলে শওকত আলী সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কলেজ শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর অধ্যাপনা করার পর বর্তমানে তিনি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।

একটি ছোট উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৪) তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। এর পর প্রকাশিত হয়েছে দুটি ছোটগল্প সংকলন ও একটি উপন্যাস। শিশু-কিশোরদের জন্যেও তিনি লিখে থাকেন।

বাংলা ছোটগল্পে বিশেষ অবদান রাখার জন্য শওকত আলী বাঙলা একাডেমি পুরস্কার পান ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির তাঁকে হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে। এ ছাড়াও তাঁকে ১৯৮৩ সালে অজিত গুহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৯ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রিয় পুরস্কার ২১শের পদকে ভূষিত করা হয়।

নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত গভীর। বাংলার প্রায়-লুপ্ত ও ঝাপসা ইতিহাসে তাঁর সৃজনশীল অনুসন্ধান আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

প্রদোষে প্রাকৃতজন

শওকত আলী

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রদোষে প্রাকৃতজন

রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ সমতটবাসী প্রাকৃতজনের
সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের স্মরণে

চৈত্রের দাবদাহে অশ্বত্থছায়া বড়ই শ্রান্তিহারক। নতুবা এতো শীঘ্র ক্লান্তি অপনোদন সম্ভব ছিলো না। দণ্ড দুই আগেও তার দৃষ্টি ছিলো অস্বচ্ছ। দৃশ্যবস্তু বিচিত্র বিভঙ্গে দোলায়িত হচ্ছিলো। কঠিন পথ বারেক মনে হচ্ছিলো সম্মুখে ঢেউয়ের মতো উপরে উঠছে, আবার মনে হচ্ছিলো, ক্রমেই নেমে যাচ্ছে অতলে। পদক্ষেপও তখন স্ববশে ছিলো না। প্রমত্ত মাদকসেবীর মতোই সে টলে টলে যাচ্ছিলো। কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে।

সে বড় বিচিত্র অবস্থা। এখন স্মরণ হলে কৌতুক বোধ হয়। অবশ্য তখনও তার কৌতুক বোধ হচ্ছিলো। কৌতুক বোধ হবারই কথা। কারণ প্রথমে তুমি দেখলে বংশবীথিকার বিনত শাখায় একটি বনকপোত। পরক্ষণে সেই ক্ষুদ্রাকার পাখিটি হয়ে গেলো একটি উর্ধ্বলম্ফী মর্কট—মুহূর্তেক পরে সেই মর্কটও আর থাকলো না, নিমিষে হয়ে গেলো একটি বিশুষ্ক বৃক্ষশাখা। চক্ষু কচালিত করলে অতঃপর তুমি আর কিছুই দেখলে না। বংশবীথিকা না, বনকপোত না, মর্কট না—বিশুষ্ক শাখাও না। কী অদ্ভুত কাণ্ড—আসলে কিছুই নেই সম্মুখে। শুধুই ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপ্ত কুশক্ষেত্র। গ্রাম নেই দিগন্ত রেখায়, বৃক্ষরাজি গোচরে আসে না, প্রান্তরের বিস্তৃতি কেবলই দূর থেকে দূরে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, আকাশসীমা ধূসরতায় বিলীন।

শ্যামাঙ্গ অশ্বত্থের ছায়ায় শয়ান অবস্থায় নিমীলিত চোখে নিজ অভিজ্ঞতা স্মরণ করে। সে বোঝে, তার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব ছিলো না। তার সৌভাগ্য যে ঐ সময় দূর থেকে একটি পথিক দল তাকে দেখতে পায়। তার কিছুই স্মরণ নেই, কখন সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলো, কখন ছুটে এসেছিলো পথিক দল এবং কীভাবেই বা তারা শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে।

প্রৌঢ় লোকটি ঐ সময় কাছে এসে জানতে চাইলেন, এখন সুস্থ বোধ করছেন তো?

শ্যামাঙ্গ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায়নি এতোক্ষণ। এবার বললো, আপনারা আমার প্রাণরক্ষা করেছেন—আমি কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো জানি না—

থাক, থাক, এখন ওসব কথা নয়—আপনি বিশ্রাম নিন, পথিক প্রৌঢ়ের কণ্ঠে প্রগাঢ় মমতা প্রকাশ পায়।

অশ্বত্থের পাতায় পাতায় চৈত্রের বাতাস শব্দ করে যাচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গ সেই শব্দ শুনতে শুনতে আবার নিমীলিত-চক্ষু হলো। তার মনে হচ্ছিলো, প্রৌঢ় পথিক অহেতুক তার জন্য চিন্তিত হয়ে রয়েছেন। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। একবার ভাবলো, উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, কী দরকার প্রৌঢ় লোকটিকে অস্থির করে, আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই বা ক্ষতি কি? ততক্ষণে নদীতীর থেকে লোকটি ফিরে আসুক।

প্রৌঢ় পথিক ঐ সময় পুনরায় কাছে এসে উপবেশন করলেন। বললেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গী হবেন?

শ্যামাঙ্গ বুঝতে পারে না, কী করবে। কিছু পূর্বে প্রৌঢ়ের আরও একজন সঙ্গী এই প্রশ্ন করেছিলো। তখনও সে কিছু বলতে পারেনি। নৌকাযোগে এরা যাবে দক্ষিণে, বাণপুরের দিকে—আর তাকে যেতে হবে আত্রেয়ী তীরে, রজতপটে। কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গী হওয়া যায়। তারপর তাকে আবার একাকীই পথে নামতে হবে। সে অকপট হলো প্রৌঢ়ের কাছে। বললো, আমার গন্তব্য তো আপনার জানা, আপনিই বলুন, আমার কি কর্তব্য—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি পরামর্শ দিন।

প্রৌঢ়টি কিছু বলতেন হয়তো। কিন্তু ঐ সময়ই প্রেরিত লোকটিকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখা গেলো। সে জানালো যে অনতিবিলম্বে একখানি নৌকা যাত্রা করবে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশে।

যারা লম্বমান হয়ে ছিলো অশ্বত্থ তলে, তারা লম্ফ দিয়ে উঠলো এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলো। প্রৌঢ়টিও ঈষৎ চঞ্চল হলেন। তবু তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, আপনি কি যাবেন আমাদের সঙ্গে?

শ্যামাঙ্গ এবারও কোন উত্তর দিতে পারে না।

শেষে নিজেই বললেন প্রৌঢ়, আপনাকে একাকী এভাবে রেখে যেতে প্রাণ চায় না। আর যদি সঙ্গে নিয়ে যাই, তাহলে পরে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কালে আপনার অধিকতর কষ্ট হবে, সেও এক চিন্তার বিষয়।

কথাটা ঠিক। সত্যিই যদি পুনর্ভবার স্রোতোবাহী হয়ে দক্ষিণে যেতে হয় তাকে, তাহলে মধ্যপথে তাকে নৌকা থেকে নামতে হবে এবং দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করতে হবে পদব্রজেই। ঐ পথ আবার অরণ্য-সঙ্কুল।

শ্যামাঙ্গ যাবে কি যাবে না সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই পথিক দল অশ্বত্থ তল পরিত্যাগ করলো। এক যুবকের স্কন্ধে দেহভার রেখে ধীর পদক্ষেপে শ্যামাঙ্গও হেঁটে এলো নদীতীর পর্যন্ত। সেখানেও একটি বটবৃক্ষ ছিলো। শ্যামাঙ্গ বটতলে উপবেশন করে চতুর্দিকে চেয়ে দেখলো, ছায়াদায়ী বৃক্ষ একটি নয়, কয়েকটি। তার অনুমান হলো, পুনর্ভবা তীরের অধিবাসীরা সজ্জন। স্থানটি তার ভালো লাগলো। বিশ্রামস্থলটি ভারী মনোরম।

পর পারে একটি ধবল গাভী চরছে—দুটি ছাগ শিশুকে তাড়না করে ছুটছে একটি শ্যামলী বালিকা। নদীর জলস্রোত ভারী ধীর। তীরের নৌকাগুলি ভাসমান কিন্তু স্থির। মনে হয় না, তাদের নিচে জলস্রোত বইছে।

পথিকেরা কাল বিলম্ব না করে নৌকায় আরোহণ করলো। তারা কেন যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো বলা দুষ্কর। কেননা নৌকাটি শীঘ্র যাত্রা করবে এমন মনে হচ্ছিলো না।

নৌযানটি বৃহৎ নয়, তবে এই স্বল্প পরিসর নদীতে ওটিকে বৃহৎই দেখাচ্ছিলো। যাত্রী এবং নানাবিধ সামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে রয়েছে বলে অনুমান হলো। কারণ যাত্রীদের অনেকেই আচ্ছাদনীর বাইরে বসে আছে। নৌযানটির বহির্দেহে নানান কারুকার্য। ঐ প্রকার কারুকার্য সে আত্রেয়ী তীরে কখনও দেখেনি।

প্রৌঢ় পথিক তখনও নৌকায় আরোহণ করেননি। তাঁর মধ্যে কেমন ইতস্তত একটি ভাব। কি ভাবছিলেন তিনিই জানেন। শেষে কাছে এসে জানতে চাইলেন, আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো? ভেবে দেখুন, আমাদের সঙ্গে যাবেন কিনা। আপনি একাকী, তায় এমন অপরিচিত স্থান—

শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করলো ঐ সময়, প্রৌঢ়ের চক্ষু দুটিতে বড় মায়া। প্রিয়জনের জন্য আন্তরিক উদ্বেগ ফুটে আছে তাঁর মুখভাবে। সে বললো, অহেতুক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আপনি, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ঐ কথার পরও প্রৌঢ় আশ্বস্ত হলেন কি না বোঝা গেলো না। খুব ধীর পদক্ষেপে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে, তিনি নদীর দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রৌঢ়ের গমন পথের দিকে দৃষ্টি রেখে শ্যামাঙ্গ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেললো। ঐ মুহূর্তে নিঃসঙ্গ লাগলো নিজেকে। সে উঠে বসলো। এইভাবে শয়ান অবস্থায় সে কতক্ষণ থাকবে? তার এবার ওঠা উচিত। একাকিত্বই তার ভবিতব্য। কখনও তো সে সঙ্গলাভ করতে পারেনি। গুরুদেব তাকে ত্যাগ করেছেন, সতীর্থ বন্ধুরা তার সঙ্গী হয়নি কখনও, আর এ তো মাত্রই দণ্ড দুয়েকের সান্নিধ্য। তবে ভারী সজ্জন এদেশের লোক। বিশেষত প্রৌঢ়টি একেবারেই আপনজনের মতো আচরণ করছিলেন। তার মনে হলো, প্রৌঢ়ের কথা শুনলেই হয়তো বা তার জন্য ছিলো ভালো।

দ্বিতীয় দীর্ঘ নিঃশ্বাসটি নির্গত হওয়া মাত্রই সে নিজেকে ধরে ফেললো। বুঝলো, তার মনের মধ্যে আশ্রয় লাভের একটি বাসনা আবার জেগে উঠতে চাইছে। আসলেই কি তার লতার স্বভাব? সহকার শাখা দেখলেই অবলম্বনের জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে? ধিক তোকে, ধিক দুর্বলচিত্ত কাপুরুষ! তোর শিক্ষা হয় না এতো কিছু কাণ্ডের পরও। ঐ একাকী নদীর বটতলে বসে বসে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু তখনও বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেনি।

সে পশ্চাতের দৃশ্যাবলীতে মনোনিবেশ করেছে তখন। না, নৌকাটির দিকে সে আর দৃষ্টিপাত করবে না। সে দেখছিলো দুটি বালককে। দূরের বৃক্ষতলে দণ্ডগুলি খেলায় তারা মত্ত। ভাবছিলো, বালক দুটিকে ডাকলে কেমন হয়। ঐ সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই সে দেখলো, প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আবার উঠে আসছেন। এ আবার কি কাণ্ড! লোকটির মস্তিষ্কে কি দোষ আছে? নৌকা ওদিকে প্রস্তুত—আর উনি চলে আসছেন? তার মনে কৌতূহল জাগ্রত হয়।

পশ্চাতে একজন যুবক চিৎকার করে ডাকছে, তবু প্রৌঢ়ের ভ্রূক্ষেপ নেই।

তার মনে হলো, লোকটি বোধ হয় তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসছেন। সে মনে মনে কঠিন হলো। না, আর সে পরনির্ভর হতে যাবে না। প্রৌঢ়টি নিকটে এলে সে হাসলো, কি সংবাদ, আবার যে ফিরলেন?

হ্যাঁ ফিরলাম, তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত বোধ করতে পারছি না।

এবার শ্যামাঙ্গ উঠে দাঁড়ালো। বললো, দেখুন আপনার বিশ্বাস হয় কিনা—আমি প্রকৃতই এখন একজন সুস্থ ব্যক্তি।

শ্যামাঙ্গকে দেখতে লাগলেন প্রৌঢ়টি। তাঁর দৃষ্টি যেন সরতে চায় না। হঠাৎ জানতে চাইলেন, বৎস, কিছু মনে করো না, তুমি সম্বোধন করছি বলে, সত্যিই কি তুমি আত্রেয়ী তীরের লোক?

এ আবার কি রহস্য! শ্যামাঙ্গ হতচকিত হয়। বলে, এ আপনি কি বলছেন? আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আমার কি লাভ?

প্রৌঢ় অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, আমার কেমন মনে হচ্ছে তোমাকে একাকী রেখে যাওয়া আমার উচিত নয়। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো—দু'দিন আমরা তঙ্গন তীরের মেলায় অবস্থান করবো। তারপরই আবার ফিরে আসবো। তোমার মন্দ লাগবে না, এ অঞ্চলের মেলায় নানান উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক ক্রিয়াকাণ্ডের সমাবেশ হয়।

শ্যামাঙ্গ হাসলো, না মহাশয়, সত্বর গৃহে ফেরা আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রৌঢ় অধোমুখে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার শ্যামাঙ্গের মুখোমুখি হলেন। বললেন, তুমি বিরক্ত হয়ো না বৎস, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, অর্থ-সামগ্রী কিছু আছে তো তোমার? না হলে কিন্তু পথিমধ্যে বিপদ হতে পারে।

শ্যামাঙ্গের এতোক্ষণে যেন সম্বিৎ হয়, সত্যিই তো, ও চিন্তা তো তার মস্তিষ্কে আসেনি। সে কটিদেশে দু'হাত স্পর্শ করে আশ্বস্ত হয়—না, কটিবন্ধনে স্থলীটি অক্ষতই আছে। বললো, আমার সঙ্গে কিছু পাথেয় অবশ্যই আছে—কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—আপনি আমার প্রতি এতো স্নেহশীল হয়ে উঠেছেন যে—

প্রৌঢ় শ্যামাঙ্গের কৃতজ্ঞতা-ভাষণ সম্পূর্ণ শুনলেন না। বলে উঠলেন, বৎস, তোমাকে কি বলবো বলো, আমি একজন হতভাগ্য পিতা। আমার একটি বন্ধু পুত্র ছিলো—নিজের পুত্র নেই—ওকেই আমি পুত্রবৎ স্নেহ করতাম, আমার কন্যাটিও ওকে বড় ভালবাসতো, কিন্তু গত বছর এমনই সময়ে দস্যুহস্তে সে—

আর বলতে পারলেন না। বাকরুদ্ধ অবস্থায় থাকলেন কিছুক্ষণ। ক্ষণেক পরে আবার বললেন, আমার কন্যা বিশ্বাস করে না যে সে নেই—সে অপেক্ষা করে আছে, চন্দ্রদাস ফিরে আসবে এবং তার বিবাহ হবে।

প্রসঙ্গটি করুণ। প্রৌঢ় পথিকের আবেগ বিহ্বল ভাব, তাঁর মুখের তুমি সম্বোধন এবং সর্বোপরি শ্যামাঙ্গের জন্য তাঁর উদ্বেগ বিচলিত করে দিলো শ্যামাঙ্গকে। সে কী বলবে ভেবে উঠতে পারছিলো না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে সে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এই

প্রৌঢ়কে কী বলবে সে? তাকে অবলম্বন করে তাঁর ব্যাকুল চিত্ত হয়তো উদ্বেল হয়ে উঠেছে। নিজের কন্যার বেদনা-ভার বহন করতে করতে তাঁর হৃদয় ক্লান্ত, এখন যদি তাঁর আশা হয়ে থাকে যে, বান্ধবহীন স্বজনহীন একাকী পথিক তাঁর বেদনার ভার কিছুটা লাঘব করতে পারবে, তাহলে কি সেটা তাঁর অপরাধ?

ঐ সময় সমস্বরে চিৎকার আরম্ভ হয় নৌকা থেকে। তাতে শ্যামাঙ্গ সচকিত হয়। বলে, আপনার সঙ্গীরা ওদিকে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

হ্যাঁ, যাই আমি, প্রৌঢ় পশ্চাতে দেখে নিলেন বারেক। তারপর বললেন, বৎস, এটি তুমি রাখো, পথে তোমার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রৌঢ় পথিক চলে গেলেন। 'জয় গঙ্গা মাতা' বলে নৌকাটি ভাসলো স্রোতের অনুকূলে। প্রৌঢ় প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ডে কুণ্ডলীকৃত বস্তুটি হাতে নিয়ে শ্যামাঙ্গ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নৌকাটি দৃশ্যের বাইরে চলে গেলে তার সম্বিৎ ফিরলো। তখন সে কুণ্ডলীকৃত বস্ত্রখণ্ড খুলে দেখলো। অবাক হবার মতোই ব্যাপার। মাত্রই দণ্ড দু'তিনের পরিচয়। কিন্তু তবু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তার শুশ্রূষা করেছেন, সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন সুস্থ করে তুলতে—তদুপরি আবার এই দান! দেখলো বস্ত্রখানি উত্তরীয় এবং তারই এক কোণে গ্রন্থিবদ্ধ কয়েকটি মুদ্রা। তার মনে হলো এই দান স্নেহধন্য। সে পরম শ্রদ্ধাভরে দান গ্রহণ করলো।

কি বিচিত্র এই সংসার। কোথাও সে বিতাড়িত হচ্ছে। আবার কোথাও তাকে স্নেহডোরে বাঁধবার জন্য ব্যাকুল বাহু প্রসারিত হয়ে আছে। তার ইচ্ছা হলো প্রৌঢ় পথিকের গ্রামে গিয়ে কন্যাটিকে দেখে আসে একবার। আহা কি আকুল প্রতীক্ষায় দণ্ড পল অনুপল কাটছে বালিকাটির। বালিকা না তরুণী সে কিছুই জানে না। এ কিসের প্রতীক্ষা করছে তরুণীটি—জীবনের না মরণের? শবরীর প্রতীক্ষার কাহিনীটি তার মনে পড়ে। একটি মৃৎফলকে চিত্রটি সে উৎকীর্ণও করেছিলো। কিন্তু হায়, গুরু বসুদেব বুঝতে চাইলেন না।

সে ধীরপদে নদীতীর ধরে অগ্রসর হলো। যে বালক দুটি দণ্ডগুলি নিয়ে খেলছিলো তারা শ্যামাঙ্গকে দেখেও যেন দেখলো না। শ্যামাঙ্গ যখন জানতে চাইলো, বাপু হে, তোমাদের নিবাস কোন গ্রামে? তখন সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে তারা শ্যামাঙ্গের আপাদ-মস্তক দেখে নিলো। অতঃপর একটি বাক্যও ব্যয় না করে হাত তুলে এমন একটি দিক নির্দেশ করলো যেটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব-অধ সব দিকই হতে পারে।

পথক্রমণ করতে করতে সে অনুভব করলো শরীরে এখনও তার অবসাদ, সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। সূর্য এখন মুখোমুখি। দেখে মনে হচ্ছে, পশ্চিমাকাশে একখানি উত্তপ্ত তাম্রস্থালী কেউ যেন সংলগ্ন করে রেখেছে।

তার কেবলি মনে হতে লাগলো নীলাম্বর তাকে ভুল পথের সন্ধান দিয়েছে। সে বলেছিলো, পুনর্ভবা তীরের নবগ্রাম হাটে গিয়ে উপনীত হলে তখন আর সমস্যা থাকবে না তোমার। কিন্তু কোথায় সেই নবগ্রাম হাট? সে জানে, নবগ্রাম হাট আত্রেয়ী তীরের

অনেক গোশকট আসে। আত্রেয়ী তীরে একবার পৌঁছাতে পারলে তখন গৃহ গমন তো এক দণ্ডের ব্যাপার।

সে নদীতীর ধরে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে। কিন্তু না, কোনো কোলাহল তার কানে আসছে না। পথে লোকই নেই—কোলাহল করবে কে? কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হলে পথিমধ্যে সে একটি তরুণীর সাক্ষাৎ পায়। তরুণীটি একটি গাভীকে তাড়না করে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে দেখে শ্যামাঙ্গ দাঁড়ালো। ইতস্তত হচ্ছিলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করেও পারলো না। সে খুবই বিনয়ের সঙ্গে দু'হাত জোড় করে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে বললো, ভদ্রে, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনি বলতে পারেন, এই গ্রামের নাম কি?

তরুণীটি অপাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলো চকিতে, তারপর বললো, মরণ! নাটগীতের আর স্থান পাওনি?

দেখুন, আমি দূরের লোক, এ অঞ্চলের পথঘাট কিছুই চিনি না।

পথের রমণীকে তো ঠিক চিনতে পারেন দেখছি।

ঐ তীক্ষ্ণ মন্তব্যে শ্যামাঙ্গ বুঝতে পারে এ অঞ্চলের রমণীরা ক্ষুরধার জিহ্বার অধিকারিণী। প্রয়োজন নেই বাপু তোমাদের সঙ্গে কথার—তোমাদের খুরে দণ্ডবৎ একশতবার, মনে মনে এই বলে সে পুনরায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়। অবশেষে শ্যামাঙ্গ একটি বটবৃক্ষের নিচে মৃত্তিকা বেদীতে প্রথমে উপবিষ্ট ও পরে অর্ধশয়ান হলো। তার সন্দেহ হতে লাগলো, নবগ্রাম হাট নিশ্চয়ই দূরে। নীলাম্বর শূকরপুত্রটা তাকে এভাবে বিপদে ফেলবে, কল্পনাও করা যায় না।

বিল্বগ্রাম থেকে প্রত্যূষেই সে বেরিয়ে এসেছিলো। কেননা গুরু বসুদেব যা করেছেন তারপর সেখানে থাকবার, কি বিলম্বের, কোনই অবকাশ ছিলো না। বিল্বগ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় নীলাম্বর বলে দিয়েছিলো—বন্ধু, তুমি পথ ধরে গেলে দু'তিন দিন সময় লাগবে, আবার পরিশ্রমও হবে। বরং তুমি প্রান্তরে নেমে যেও—পশ্চিমে পুনর্ভবা তীর, মাত্রই ক্রোশ তিনেক পথ—সেখানে নবগ্রাম হাটে তুমি আত্রেয়ী তীরের শকট পাবে।

সেই কথা শুনে এই অবস্থা তার। প্রাণ চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিলো না। সে তো রৌদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলো। যদি পথিকের দলটি না দেখতে পেতো তাকে—তাহলে ঐভাবে জ্ঞানহারা অবস্থাতেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যেতো! পরিশেষে তার শরীর ভক্ষ্য হতো শকুন এবং শৃগালের।

নদী এখানে বঙ্কিম। তীরে কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। শ্যামাঙ্গ তীর ত্যাগ করে পথে উঠলো। অদূরে একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তলে মৃত্তিকাবেদী। বেদী না বলে মণ্ডপ বলাই সঙ্গত—বিস্তৃত চত্বরের মতো একেবারে। শ্যামাঙ্গ সেখানে গিয়ে উপবেশন করলো। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছিলো। বারেক ইচ্ছা হলো নদীর জল পান করে আসে। কিন্তু এমন আলস্য তাকে পেয়ে বসলো ঐ মুহূর্তে যে সে উঠলো না। বরং আরও অলস ভঙ্গিতে অর্ধশয়ান হলো।

চৈত্রের অপরাহ্ণ বড় ধীর। সূর্য পশ্চিমাকাশে সংলগ্ন, এমন স্থির যে মনে হয় না কখনও নিচে নামবে। স্থানটি নির্জন নয়। অদূরে কয়েকজন গ্রামবাসী কিছু দেখবার জন্য সমবেত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—এবং ঐ স্থান থেকেই একেক সময় সোল্লাস চিৎকার ধ্বনি উঠে আসছে। কৌতূহলী হয়ে সে উঠে বসলো। লক্ষ্য করে দেখলো, স্থানটি নিচু এবং জলাশয়। সম্ভবত পুনর্ভবারই একটি মৃত শাখা। ঐখানেই মৎস্য শিকার হচ্ছে।

পুনর্ভবার মূল স্রোত এখানে বঙ্কিম। নদী খাত যেটি সরল, সেইটিই মৃত। এমন ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না। তবে নদীর মতিগতি তো রমণীরই মতো, সুতরাং সেটি বোঝাও মানুষের সাধ্য নয়।

নদীতীরের ভূমি ঢেউয়ের মতো—কোথাও উন্নত কোথাও অবনত। বেলাভূমিতে স্থানে স্থানে বদরীকুঞ্জ—এখন বিগতফল এবং নিষ্পত্র। ইতস্তত মনসাকণ্টক ও দীর্ঘ তৃণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ। শঙ্খচিল উড়ছিলো—দূরে টিট্টিহি টিট্টিহি রবে টিট্টিভ পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গের মনে হলো, চরাচর বড় শান্ত। চৈত্রের নদীস্রোত যেমন, তেমনি এ অঞ্চলের জীবনধারাও।

অবশ্য ওদিকে নদীবক্ষে কোলাহল হচ্ছিলো, কিন্তু সেই কোলাহল চরাচরব্যাপী নিঃশব্দতাকে যেন আরও অধিক প্রকট করে তুলছিলো।

সে লক্ষ্য করলো, যারা স্রোতহীন মৃত নদীর জলকে কর্দমাক্ত করে তুলেছে তারা ধীবর নয়, নিতান্তই সাধারণ গ্রামবাসী। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ আছে, যুবক আছে, এমনকি বালক-বালিকারাও রয়েছে। ওদের সোল্লাস চিৎকারই থেকে থেকে কানে আসছিলো। এবং ঐ চিৎকারই বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে এই সমবেত মৎস্য শিকার জীবিকার প্রয়োজনে নয়, নিতান্তই আনন্দের কারণে।

সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। জালপাশ থেকে মৎস্যের উল্লম্ফ পলায়ন, তরুণ ও বালক-বালিকাদের সোল্লাস চিৎকার, নিষিক্ত কৃষ্ণদেহে রৌদ্রের প্রতিফলন—সব একত্রে একটি অসাধারণ দৃশ্য বলে তার মনে হলো। কৌতুক এবং উল্লাস, শক্তি এবং আনন্দ, জল এবং মানবসন্তান—এমন একত্রে আর কখনও তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে মুগ্ধ নয়নে দেখছিলো এবং তার মনে নানান চিত্র মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছিলো।

তার মনে হচ্ছিলো যেন একটি দীর্ঘ চিত্রমালা তার চোখের সম্মুখে গ্রথিত হচ্ছে। ঐ সময়ই আবার গুরু বসুদেবের কথা স্মরণ পথে উদিত হচ্ছিলো। বসুদেব তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেননি। বারবার নিষেধ করেছেন। ঘুরে ফিরে এসে দেখেছেন তার কাজ। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দেখো, কোনোভাবেই যেন তোমার ফলকে ব্রাত্য প্রসঙ্গ না থাকে—শাস্ত্রানুশাসন বিচ্যুত হয়ো না।

সে একদিন প্রশ্ন করেছিলো, কেন গুরুদেব, ব্রাত্য মুখচ্ছবিতে অপরাধ কি?

অপরাধ? গুরু বসুদেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। বলেছিলেন, অপরাধের কথা তো বলিনি, বলেছি প্রয়োজনের কথা। মন্দির গাত্রে যে মৃত্তিকাপট থাকবে তাতে পবিত্র

ভাবটি থাকা চাই। ম্লেচ্ছ ব্রাত্যের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার না থাকলে তাদের প্রসঙ্গ কেমন করে মন্দির গাত্রের মৃত্তিকাপটে উৎকীর্ণ হতে পারে বলো?

শ্যামাঙ্গ বুঝতে পারেনি তখনও। জানতে চেয়েছিলো, গুরুদেব, বুঝতে পারছি না, ব্রাত্যজন অপবিত্র হতে পারে, কিন্তু মৃৎপট, কি শিলাপট—এসব তো আর মানুষ নয়, নিতান্তই মৃত্তিকা অথবা শিলা—এসবের আবার পবিত্র অপবিত্র কি?

বসুদেব ঈষৎ বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মূর্খের মতো কথা বলো না শ্যামাঙ্গ, মৃত্তিকা ও শিলা তো পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বত্র, কিন্তু দেবতার পীঠস্থান কি সর্বত্র? সকল মৃত্তিকাই কি দেবতা হয়, বলো? সকল শিলাই কি দেবতা?

সে বিভ্রান্ত বোধ করছিলো, সে জানতো, গুরু বসুদেব প্রতিমা নির্মাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রেও যে তাঁর প্রবল অধিকার এ তথ্য তার জানা ছিলো না। তার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হচ্ছিলো—কিন্তু হৃদয় বিভ্রান্ত হয়নি। সেখান থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠে আসছিলো। সে নীরব থাকতে পারেনি। বলেছিলো, গুরুদেব, তাহলে দেবতা কী? ভগবান কী? জগত কি দেবসম্ভূত নয়?

এই প্রশ্নে বসুদেব চমকে উঠেছিলেন। সম্ভবত নিদারুণ বিব্রত বোধও করেছিলেন। শেষে বলেছিলেন, জটিল তর্ক ক'রো না শ্যামাঙ্গ, দেবতার পীঠস্থান ধর্মসিদ্ধ—তুমি শুধু এইটুকু মনে রাখবে যে ধর্মই সত্য, পরম ব্রহ্মই সত্য—ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর আছে সেই ব্রাহ্মণের নির্দেশই পালনীয়—আর অন্য কিছু সত্য নয়, পালনীয় নয়।

শ্যামাঙ্গের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বসুদেব যা বলেছেন তা তাঁর আদেশ। কিন্তু তবু সে নিজের কথাটি না বলে পারেনি। খুব ধীর কণ্ঠে বিনীতভাবে সে জানিয়েছিলো—প্রভু, আমি ইতোমধ্যে মৃৎফলকে কিছু মানবী মূর্তি উৎকীর্ণ করেছি।

মানবী মূর্তি? বসুদেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো মুহূর্তে। বলেছিলেন, দেবপীঠে মানবী মূর্তি কেন থাকবে? এখনই বিনষ্ট করো, কোন পটে—কোন ফলকে তোমার সেই মানবী মূর্তি, দেখি?

শ্যামাঙ্গকে তখন তার রৌদ্রশুষ্ক ফলকগুলি একে একে দেখাতে হয়েছে। রামায়ণ কাহিনীর চিত্রমালা পরিস্ফুটনের দায়িত্ব ছিলো তার। জানকীর বরমাল্য দান, রামের বনগমন, হনুমানের গন্ধমাদন বহন ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ সে মৃৎফলকগুলিতে উৎকীর্ণ করেছিলো। এবং ঐসব ফলকের সঙ্গে সঙ্গে আরও ক'টি মানবী মূর্তির ফলকও ছিলো। প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না ব্যাধ তরুণীর প্রণয়দৃশ্য ছিলো একটি, একটি ছিলো শবর যুবতীর প্রতীক্ষার দৃশ্য আর ছিলো মাতৃময়ী ধীবর রমণীর সন্তানকে স্তন্য দানের দৃশ্য।

বসুদেব দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, এ কী করেছো তুমি? এসব কেন করেছো? দেব মন্দিরের সঙ্গে এসবের প্রসঙ্গ কোথায়?

শ্যামাঙ্গ সবিনয়ে বোঝাতে চেয়েছে, প্রভু, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন সেই প্রসঙ্গেই আমার শবর যুবতীর কথা মনে হয়েছে—আর ধীবর মাতা গোদাবরী তীরের। বনবাসের দৃশ্যে অরণ্যচারী ব্যাধ যুবক-যুবতীর প্রণয় কি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হবে?

না, বসুদেব কঠিন কণ্ঠে বলে উঠেছেন, এ হয় না, প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটি তুমি ছলনাক্রমে আনছো। এ কেমন মুখাবয়ব, এ কেমন মুখভাব বলো? এ মানবিক লালিত্যে কি প্রয়োজন? কেন তোমার ফলকচিত্রে কেবল নমনীয় পেলব রেখা? কেন এই বৃত্তাকার ভঙ্গি? ঋজুতা কোথায়, দৃঢ়তা কাঠিন্য কোথায়? ওষ্ঠ কেন এমন বিলোল হবে? এ হয়নি—সব ভুল হয়েছে তোমার। শ্রীরামচন্দ্রের কি এই মুখাবয়ব হয় কখনও? জানকী আর যক্ষিণী মূর্তিতে যে কোনো পার্থক্য নেই। এসবে কাজ হবে না—বিনষ্ট করো এসব।

ঐ কঠিন রুক্ষ নির্দেশ যেন এখনও বক্ষের নিচে এসে আঘাত করে। শ্যামাঙ্গ স্মরণ করে শিহরিত হলো।

ঐ সময় কাতর আর্তনাদ করে উঠেছিলো শ্যামাঙ্গ। আকুল প্রার্থনার মতো করে বলেছিলো, গুরুদেব, এসব মূর্তিতে যে আমার আবেগ স্পন্দিত হয়েছে, রক্ত ধারার ছন্দ যে এদের রেখায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। দেখুন আপনি, এই ব্যাধ তরুণ-তরুণীর মুখভাবে সঙ্গীত মর্মরিত হচ্ছে কি না?

বসুদেব প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন—কেন যে হঠাৎ এমন আচরণ করলেন, শ্যামাঙ্গ এখনও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। বসুদেব বলে উঠেছিলেন, মূর্খ, তুমি শ্যামাঙ্গ, একেবারেই মহামূর্খ। তোমার স্মরণে থাকা উচিত যে এসব নির্মিত হচ্ছে তোমার পিতৃধনে নয়। এসব নির্মাণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করছেন কায়স্থ কুলতিলক মহাসামন্ত সুধীমিত্র। সুতরাং তাঁর আদেশ-নির্দেশই তোমাকে মান্য করতে হবে। তুমি আদেশের দাস মাত্র—তাঁর আদেশ পালনের জন্যই তোমাকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে—প্রতিমা নির্মাণশাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য নয়।

ঐ সময় সুধীমিত্রের আশ্রিত উদ্ধব দত্ত এসে দাঁড়িয়েছিলো কাছে, কাজ ছেড়ে উঠে এসেছিলো সতীর্থ নীলাম্বর। নীলাম্বরই তাকে সরিয়ে আনে বসুদেবের সম্মুখ থেকে।

সরিয়ে এনে বলে, কাজটা তুমি ভালো করোনি বন্ধু।

শ্যামাঙ্গ তখনও ক্ষুব্ধ। জানায়, কিন্তু আমার অপরাধ কোথায়? গুরুদেব সেটা তো আমাকে বলছেন না—কেবলই ধর্মের কথা আর শাস্ত্রের কথা বলছেন।

শ্যামাঙ্গ ঐ বিতর্কের কথা জীবনে ভুলবে না। তার সাধ এবং আশা সে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে সুধীমিত্রের ঐ মন্দিরেই। না, আর সে শিল্প রচনায় যাবে না।

ঐ গুরুদেবই তাকে সংবাদ পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সুধীমিত্রের বিল্বগ্রামে। বলেছিলেন, মৃৎফলকের কাজ আর কেউ করে না—মহাসামন্ত সুধীমিত্র সম্মত হয়েছেন, তাঁর নির্মিত মন্দিরে মৃৎফলকও থাকবে। তুমি এ সুযোগ হারিও না। সুযোগ পেয়ে সে ধন্য মনে করেছিলো নিজেকে। আশা ছিলো তার, সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার ফলকে নিঃশেষে ঢেলে দেবে ঐ মন্দির গাত্রের মৃৎফলকগুলিতে। দেবপীঠে প্রস্তর প্রতিমার পাশাপাশি শোভা পাবে মৃৎফলকগুলিও। যুগান্তরের মানুষ জানবে আত্রেয়ী তীরবাসী শ্যামাঙ্গ নামক এক মৃৎশিল্পীর হাতের কাজ ঐ সুষমাময়ী শবর কন্যা, ঐ প্রণয়দীপ্ত ব্যাধমিথুন, ঐ মমতাময়ী ধীবর জননী আর রামায়ণ কাহিনীর চিত্রময় ফলকমালা। জনক নন্দিনী যেন

বা গৃহেরই বনিতা, লক্ষণ যেন নিজেরই অনুজ, শ্রীরামচন্দ্র একান্তই আপন সুহৃদ। সে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছিলো। বসুদেব প্রথমে বাধা দেননি। শিষ্যের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিলো সম্ভবত। কিন্তু তারপর যেন কী হলো—শ্যামাঙ্গের কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রথম তিনি কিছুই বলেননি। তবে এও মনে হচ্ছিলো, শ্যামাঙ্গকে বোধ হয় আর তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেউ তাঁর কানে কোনো কথা তুলেছিলো কিনা বলা কঠিন। তবে শ্যামাঙ্গের কাজ দেখবার সময় তাঁর ভ্রূর কুঞ্চন রেখা সর্বদাই জাগরূক থেকেছে। অবশেষে এই ব্রাত্য প্রসঙ্গ নিয়ে ঘটনা।

শ্যামাঙ্গের এখন মনে হয়, যে ঘটনাকে আকস্মিক বলে মনে হচ্ছিলো প্রকৃতপক্ষে তা প্রায় অনিবার্যই ছিলো। প্রশ্নটা তো এসে যাচ্ছিলো দৃষ্টিভঙ্গির। মূর্তি নির্মাণ কেন? শিল্প কেন? এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিলো গুরুদেবকে এবং তার নিজেকেও। আর প্রশ্নগুলি এমনই যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে নীলাম্বরের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। নীলাম্বর প্রস্তর-শিল্পী, প্রচলিত প্রতিমালক্ষণশাস্ত্র তাঁর ভালোভাবে অধিগত। ছেদনী দিয়ে কঠিন প্রস্তরে সে অতি সূক্ষ্ম কাজটিও সম্পন্ন করতে পারে। বেশ কয়টি বিষ্ণুমূর্তি সে ইতোমধ্যে নির্মাণ করেছে। সে শ্যামাঙ্গের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। বলে, অহেতুক তুমি গোলযোগ সৃষ্টি করেছো। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো—শিল্প কি? অলঙ্করণ বই তো নয়—যার যা রুচি সেই প্রকারই তো অলঙ্করণ হবে। সেক্ষেত্রে তোমার নাসিকা অনুপ্রবেশ করবে কেন, বলো? গুরুদেব তো ঠিকই বলেছেন। সুধীমিত্র তাঁর মনোমতো বস্তুটিই গ্রহণ করবেন। মনোমতো না হলে সেটা তিনি কেন গ্রহণ করবেন? গুরুদেবকে নিয়োগ করেছেন, এই প্রকাণ্ড কর্মশালা নির্মিত হয়েছে, কত দূর দূর দেশ থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে উপাদান সামগ্রী নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রতিদিনই প্রায় বিপুল অর্থ ব্যয়—এ সবের উদ্দেশ্য তো ঐ একটিই—নির্মিত বস্তুটি যেন তাঁর মনোমতো হয়। তাঁর মনোতুষ্টি করা ছাড়া গুরুদেবের এক্ষেত্রে আর কী করণীয় থাকতে পারে, বলো?

শ্যামাঙ্গ বিরক্তি বোধ করেছে নীলাম্বরের কথায়। বলেছে, মিত্র নীলাম্বর, তুমি আমার কথা বুঝবে না। যদি বুঝতে, তাহলে মৃত্তিকা নিয়েই কাজ করতে।

নীলাম্বর ঐ কথার পর শ্যামাঙ্গকে পরিত্যাগ করেছে। ঐ ক'টি দিন ছিলো অশেষ যন্ত্রণার। একটি কথাই বারবার তার মনে আলোড়িত হচ্ছিলো। গুরু বসুদেব কেমন করে বললেন যে তিনি আদেশের দাস? তুমি বলতে কি তিনি তার মতো সকল শিল্পীকে বুঝিয়েছেন? শিল্পী কি ক্রীতদাস? রাজানুগ্রহ ব্যতিরেকে কি শিল্পীর অস্তিত্ব নেই? ধীমান বীটপাল কি রাজাদেশের দাস ছিলেন? প্রথা এবং অনুশাসন ছিন্ন করেন যে শিল্পী তিনি কি ক্রীতদাস হতে পারেন? বসুদেবই তো জানিয়েছেন যে, একদা বরেন্দ্রভূমির মৃৎশিল্পীরা মৃৎফলকে উৎকীর্ণ করেছেন জনজীবনের দৃশ্যমালা। যোগীভিক্ষু, মৃগয়া প্রত্যাগতা ব্যাধরমণী, শৃঙ্গার মগ্ন মানব-মানবী, ঢাল তরবারি হস্তে বীর ধটিকা পরিহিতা বীরাঙ্গনা—এসব দৃশ্যে

উৎকীর্ণ মৃৎফলক সোমপুরী মহাবিহারের প্রাচীর গাত্রে এখনও শোভা পাচ্ছে। ঐসব কাজ যে গৌরবের বস্তু—একথাও গুরু বসুদেবই জানিয়েছেন। তাহলে তিনি এখন এমন কথা কেন বলছেন?

সে জানে, বসুদেব যৌবনকালে দরিদ্র জীবনযাপন করতেন। রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা কখনই করেননি। কখনও তাঁর কেটেছে আত্রেয়ী তীরে, গ্রাম জনপদগুলিতে, কখনও গিয়েছেন রামাবতী পুন্ড্রনগরে, কখনও সোমপুরে। প্রতিমালক্ষণশাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের প্রতিমা নির্মাণকলা কেমন করে গৌড়ীয় রীতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে গেছে—সমস্ত কিছু জানেন তিনি। কী নিষ্ঠা তাঁর, কী সাধনা! চিন্তা করলে বিস্ময় লাগে। অথচ সেই বসুদেবই এখন কী হয়েছেন। তাঁর আচরণ হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য। মহাসামন্ত সুধীমিত্রের আদেশ কি এতোই দুর্লঙ্ঘ্য? তার মনে প্রশ্ন জাগে।

মনে অপরিসীম বেদনার ভার। কাজে মন বসে না। এমনকি সমাপ্তপ্রায় কাজগুলি সম্পন্ন করতেও সে উৎসাহ পাচ্ছিলো না। রৌদ্রশুষ্ক ফলকসমূহ যে অগ্নিদগ্ধ করবে, সে উদ্যমটুকুও তার ঐ সময় ছিলো না।

ঐ সময় একদিন বসুদেব স্বয়ং এলেন এবং কিছু ফলক বেছে বেছে একদিকে পৃথক করে রেখে অবশিষ্টগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, শ্যামাঙ্গ, এসব অপ্রয়োজনীয়—এসব ভেঙে ফেলে নতুন করে প্রস্তুত করো।

একেবারেই অবিশ্বাস্য! বসুদেবের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। তবু শ্যামাঙ্গ জানিয়েছিলো, গুরুদেব, মার্জনা করবেন—এগুলি আমার বহুবর্ষের সাধনার ফল—এগুলি বিনষ্ট করা যাবে না।

বসুদেব কঠিন স্বরে জানতে চেয়েছিলেন, কেন, অদগ্ধ মৃৎফলক বিনষ্ট করা তো কষ্টসাধ্য কাজ নয়।

তা নয়, কিন্তু এ সমস্তই শিল্পকর্ম।

শিল্পকর্ম? বসুদেবের ক্রুদ্ধস্বর চিৎকার হয়ে উঠেছিলো। বলেছিলেন, শিল্পকর্ম কাকে বলে তুমি জানো? এসব যা রচনা করেছো—শুধুই জঞ্জাল, বুঝেছো? এসব জঞ্জাল বিনষ্ট করতে কোনো কষ্টই হয় না।

দেখো, এইভাবে নষ্ট করা যায়, ভালো করে দেখে রাখো। দেখতে দেখতে ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত বসুদেব পদাঘাতে মৃৎফলকগুলি ভাঙতে আরম্ভ করে দেন। রক্তিম চক্ষু, উন্মাদ পদতাড়না, তীব্র চিৎকার—সব মিলিয়ে তখন তাঁকে অন্য এবং অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গ বিমূঢ় হয়ে দেখছিলো, কিছু বলতে পারেনি।

শ্যামাঙ্গ পারেনি, কিন্তু বসুদেব পেরেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে এখানে আর প্রয়োজন নেই—তুমি এবার যেতে পারো। আমি তোমার মঙ্গল চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার স্পর্ধা এবং দুর্বিনয় একেবারেই সীমাহীন—আর আমি তোমার মুখদর্শন করবো না।

কথা ক'টি বলেই কম্পিত পা দু'খানি নিয়ে বসুদেব বিচলিত পদক্ষেপে গৃহের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিলেন। শ্যামাঙ্গ ঐ মুহূর্তে শুধু হতচকিত নয়, নিদারুণ বিমূঢ় বোধ করছিলো। এ কী হলো! ক্ষুদ্র একটি ব্যাপার নিয়ে কথা আর তাতেই গুরু বসুদেব তাকে ত্যাগ করলেন?

তার অনুশোচনা আরম্ভ হয় ঐ সময়। মনে হয়, গুরুদেব ঠিকই বলেছেন—তার দুর্বিনয় এবং স্পর্ধা সত্যিই সীমাহীন। গুরুর আদেশ নির্বিচারে যদি পালন না করতে পারে, তাহলে সে কেমন শিষ্য? তার মনে পড়ে, এই গুরুদেবই তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন মূর্তি নির্মাণের কলাকৌশল—গ্রন্থের পর গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন মুদ্রা আর ভঙ্গি, ভাব আর বিভাব, রস আর অলঙ্কার। যে গুরু তাকে এতো কিছু শিখিয়েছেন, তাঁরই কাছে সে হয়েছে দুর্বিনীত? ছি ছি, যতো কিছুই হোক, গুরুর পদতলই তো শিষ্যের দেবপীঠ। সে এখানে কাজ করুক বা না করুক—কিন্তু গুরুদেব যেন তাকে পরিত্যাগ না করেন।

রাত্রির প্রায় দ্বিতীয় যামে সেদিন সে গুরুগৃহের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। বসুদেব শায়িত ছিলেন, কিন্তু তখনও নিদ্রাকর্ষণ হয়নি। চত্বরে ছায়া পড়েছিলো, ঐ ছায়া গুরুদেব দেখে থাকবেন। ডেকেছিলেন, কে ওখানে?

আমি গুরুদেব, শ্যামাঙ্গ দ্বারপ্রান্ত থেকে সাড়া দিয়েছিলো।

কী চাই? এই মধ্যরাত্রে এখানে কেন?

ভয়ানক রূঢ় স্বর বসুদেবের। কিন্তু শ্যামাঙ্গের উপায় নেই। সে বলেছিলো, আমি আপনাকে বারেক প্রণাম করতে চাই প্রভু।

কিসের প্রণাম! বসুদেব মূর্খ এবং দুর্বিনীত শিষ্যের দিকে দৃষ্টিপাতটুকুও যেন করতে চান না। বলেন, তুমি চলে যাও—এ স্থানে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রকোষ্ঠে তৈলদীপটি ঊর্ধ্বেও জ্বলছিলো। প্রদীপের ম্লান আলোকে শায়িত বৃদ্ধের শীর্ণ এবং দীর্ঘ দেহখানি অতিশয় করুণ লাগছিলো দেখতে। তাতে কষ্ট হচ্ছিলো শ্যামাঙ্গের নিদারুণ। কেবলই মনে হচ্ছিলো, পাপী আমি, নাহলে এই বৃদ্ধকে কেউ কষ্ট দেয়? অনুশোচনা আর ভক্তিতে তার মন এমনই আবেগমথিত হয় ঐ মুহূর্তে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ছুটে গিয়ে গুরু বসুদেবের পদযুগল দু'হাতে বক্ষে জড়িয়ে ধরে এবং জানায়, প্রভু আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন—আমি এ স্থানে আর আপনার বিরক্তি উৎপাদন করবো না। শুধু বলুন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেননি।

বাইরে তখন আকুল জ্যোৎস্নাধারা এবং একটি পিকপক্ষীর চক্ষু নষ্ট হবার যন্ত্রণাময় চিৎকার আর প্রকোষ্ঠের ভিতরে শ্যামাঙ্গের ঐ প্রকার ব্যাকুল মিনতি। বসুদেব উঠে বসেন। কী মনে হয় তাঁর তিনিই জানেন। নিজ পদযুগল সজোরে শিষ্যের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেন। কঠিন এবং দৃঢ় একটি ভাব তাঁর মুখে স্তব্ধীভূত। মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন তখনও। মৃদু আলোকেও দেখা যাচ্ছিলো তাঁর ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ—যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা আছে, কিছুতেই কথা বলবেন না।

শ্যামাঙ্গ শয্যাপার্শ্বের ভূমিতে তখনও নতজানু। ঐ অবস্থায় সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে। বলে, গুরুদেব, আপনি আমাকে চক্ষুষ্মান করেছেন, শিল্প নির্মাণের কলা-কৌশল যতটুকু জানি সমস্তই আপনার পদপ্রান্তে বসে শেখা, আমার শিল্পীজীবনের সবটুকুই আপনার নির্মাণ, আমাকে যদি পরিত্যাগ করেন, তাহলে তো আমার জীবনের কোনোই অর্থ আর থাকে না প্রভু, আমি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে মার্জনা করুন।

বসুদেব শয্যা ত্যাগ করে উঠেছিলেন অতঃপর, শ্যামাঙ্গ স্পষ্ট স্মরণ করতে পারে। উঠেছিলেন, কিন্তু তখনও মুখ ফেরাননি। উঠে দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছিলো, সত্যিই তিনি শ্যামাঙ্গের মুখ দর্শন করতে চান না। একেবারেই দ্বারপ্রান্তে যখন বসুদেবের পদস্থাপন হয়েছে, তখন আর নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হয়নি। ঐ মুহূর্তে যেন বিস্ফোরিত হয়েছিলো শ্যামাঙ্গ। তার স্বরে তখনও কান্না, তখনও আকুল প্রার্থনা—এবার সেই সঙ্গে যুক্ত হয় তীব্র অভিমান এবং তীব্রতর ক্ষোভ। সচিৎকারে সে বলে ওঠে, গুরুদেব, আপনি যদি সত্যি সত্যিই আমাকে পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলে শুনে রাখুন, আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করলাম—শুধু আপনাকে নয়, আপনার প্রদত্ত শিক্ষাকেও। আপনার চরণযুগল স্মরণ করেই প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন আমি মৃত্তিকাপট নির্মাণ করবো না—এখন থেকে ভূমিকর্ষণই হবে আমার জীবিকা।

ঐ কথায় কী যে হয়েছিলো বলা কঠিন। আবেগ বিহ্বল অবস্থায় শ্যামাঙ্গ বুঝতে পারেনি, কেন বসুদেব তার দিকে ছুটে আসছেন। কিছু বুঝবার পূর্বেই তিনি উপর্যুপরি চপেটাঘাত করেন শ্যামাঙ্গের গণ্ডদেশে ও ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, অরে কীট, এতো দুঃসাহস তোর যে তুই আমাকে অপমান করতে আসিস? নীচাশয় কুম্ভকার ব্যতীত আর কী তুই, বল? তুই কি শিল্পী হতে পেরেছিস যে শিল্প রচনা পরিত্যাগ করবি বলে ভয় দেখাস? দূর হ পামর, তুই দূর হ—তোর মুখদর্শন করতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

শ্যামাঙ্গের শরীরের উপর বৃদ্ধের শীতল শিথিল হাতের আঘাত এসে পড়ছিলো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলো না তার। প্রদীপের আলো স্বল্প হলেও গুরু বসুদেবের মুখে ঐ সময় সে ক্ষোভ এবং বেদনামিশ্রিত একটি বিচিত্র ভাব দেখতে পাচ্ছিলো। দেখে অবাক লাগছিলো তার—এ তো ক্রোধ নয়, শাসন নয়—এ যে একেবারেই ভিন্ন বস্তু।

যে শয্যা ত্যাগ করে অন্তঃপুরে চলে যাচ্ছিলেন, পুনরায় সেই শয্যাতেই উপবেশন করেন বসুদেব। নিদারুণ উত্তেজনায় তখনও থরথর কম্পিত হচ্ছেন। ক্রুদ্ধ ও রক্তিম চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করে শিষ্য শ্যামাঙ্গের মুখপানে চান এবং বলতে থাকেন, আমি কে? অরে মূর্খ, আমি কে দেখতে পাস না? আমি নির্বীর্য জরদ্গব এক বৃদ্ধ—কিন্তু তুই? তুই না যুবাপুরুষ? তোর শক্তি রয়েছে অসীম—তুই কেন কৃপা ভিক্ষা করতে চাস? শিল্প রচনা কি অপরের মুখাপেক্ষী থাকে? জানিস না, শিল্প রচনা কী বস্তু?

ঐ ধিক্কারবাণী শোনার পরও শ্যামাঙ্গের বিমূঢ় ভাব কাটছিলো না। গুরুদেবের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো যেন দুর্বোধ্য এক প্রহেলিকা। তার মুখে কথা সরেনি ঐ মুহূর্তে। হতবাক অবস্থায় সে শুধু দেখছিলো এবং শুনে যাচ্ছিলো।

এখানে তোমার স্থান হবে না শ্যামাঙ্গ, এক সময় শান্ত স্বরে জানিয়েছেন বসুদেব। বলেছেন, সুধীমিত্র তোমার সমস্ত মৃৎফলক অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন—আমি অনুরোধ করেছিলাম, কয়েকটি ফলক যেন গ্রহণ করেন, কিন্তু দেখলাম, কাজ হলো না—তুমি যাও।

শ্যামাঙ্গ কিছুই বলেনি অতঃপর। গুরু বসুদেবকে প্রণাম করে প্রায় রাত্রি শেষে বিল্বগ্রাম থেকে সে বিদায় নিয়েছে।

মৎস্য শিকারের কোলাহল তখনও সমানে হয়ে চলেছে। সূর্য নেমেছে আরও নিচুতে। শ্যামাঙ্গ বারংবার তার মৃৎফলকগুলির কথা ভাবছিলো। জীবন্ত এবং উজ্জ্বল যে চিত্রমালা এখন চোখের সম্মুখে দেখছে—তাই তো সে ধরে রেখেছিলো তার মৃৎফলকগুলির মধ্যে। কিন্তু বসুদেব বুঝলেন না। এখন একটি দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার মনে হচ্ছে গুরু বসুদেবের ঐ আচরণ প্রকৃতই নাটকীয়। ঐ আচরণে কোনো মহত্ত্ব আছে বলে তার মনে হচ্ছে না। চোখের সম্মুখে নতুন চিত্রমালার জীবন্ত বিষয়গুলি যতোই সে দেখছে, ততোই তার গুরুদেবের ওপর করুণা হচ্ছে। গুরু বসুদেব যদি প্রকৃতই শিল্পী হতেন, তাহলে তিনি সুধীমিত্রের নির্দেশ উপেক্ষা করতেন এবং যা তিনি শিষ্যদের বলেছেন তা-ই নিজের জীবনে পালন করতেন। তিনি সে চেষ্টা আদৌ কখনও করেছেন কি না তাই এখন সন্দেহের বিষয়। তিনি কি শিষ্যের পক্ষ নিয়ে সুধীমিত্রের বিরোধিতা করেছেন? করেননি। তাহলে তাঁর ঐ ক্ষিপ্ত উন্মাদ আচরণের কোনো তাৎপর্যই থাকে না। তুমি অন্তরে সৎ থাকবে, মহান থাকবে, কিন্তু বাইরে কিছুই বলবে না, এভাবে কি শিল্পী জীবনযাপন করতে পারে?

হঠাৎ সমস্বরে চিৎকার উঠতেই শ্যামাঙ্গ দৃষ্টি প্রসারিত করলো। দেখলো, একখানি চতুষ্কোণ জালে একটি মধ্যমাকার রোহিত মৎস্য লম্ফঝম্প করছে এবং দু'তিনটি কিশোর ছুটে যাচ্ছে ঐ জালের দিকে। কিন্তু লাভ হলো না। করায়ত্ত হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রোহিতটি সজোর লম্ফ দিলো। এবং সবাইকে হতাশ করে নিমেষে পতিত হলো জলে।

দৃশ্যটি শ্যামাঙ্গ উপভোগ করলো, এবং অপেক্ষা করতে লাগলো, দেখা যাক, ঐ জালধারীর ভাগ্য পরবর্তী প্রচেষ্টায় কী এনে দেয়।

আর ঠিক ঐ সময় তার কানে এলো হাস্যমুখরা দুই রমণী কণ্ঠের আলাপ। একজন বলছে, চুপ চুপ দগ্ধমুখি, তোর লজ্জা ভয় বলতে কি কিছুই নেই একেবারে?

কেন লো? আমি কি তোর মতো ভর্তাতাড়িতা যে আমার লজ্জা থাকবে?

বৃক্ষতলের বেদী যথেষ্ট উঁচু, সম্মুখের ভূমি নিম্নগামী এবং ঐ নিম্নভূমি থেকেই উঠে আসছিলো দুই সখী এবং তাদের আলাপ।

শ্যামাঙ্গ উঠে বসতেই মুখোমুখি হলো। দেখলো, দু'টি শ্যামবর্ণা যুবতী পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সম্মুখে হঠাৎ অপরিচিত যুবাপুরুষ দেখে ঈষৎ বা অপ্রতিভ।

লক্ষ্য করে শ্যামাঙ্গ, দু'জনেই ঈষৎমেদা এবং শ্রোণীভারানতা। তবে আবার দু'জনকেই ঈষৎ চঞ্চলও মনে হয়। হয়তো নবীন যৌবনের কারণে দু'জনেরই কৃষ্ণ অক্ষিপক্ষ্মে কৌতুক ও কৌতূহল। শ্যামাঙ্গ মৃদু হাস্যে বললো, আমি ভিন্নদেশী পথিক, এই গ্রামের নাম কি, বলবেন?

তরুণী দু'টি কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে। তারপর ধীরপদে কাছে আসে। জানায়, গ্রামের নাম উজুবট, গ্রামপতি বিপ্রদাস—এবং ঐ যে দেখা যায়—হাত তুলে দেখায় একজন, ঐখানে আমাদের গ্রাম। শ্যামাঙ্গ দেখে, দূরে আম্রবীথি এবং তার ওপারে একটি মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে। তরুণীটি জানায়, ঐ মন্দিরের কাছে গ্রামপতির গৃহ।

তরুণী দু'টি তৎক্ষণাৎ চলে গেলো না—একটি সহজ, কৌতূহলী এবং আগ্রহী ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্যামাঙ্গের মনে হলো, এ অঞ্চলের নারীরা সম্ভবত অধিকতর শিথিলশাসনা। সে কারণেই অহেতুক লজ্জা বা সংকোচ দেখছে না তরুণী দু'টির আচরণে। বরং সহজেই তারা কৌতূহল প্রকাশ করছে। দু'জনেই নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। যেমন, পথিক কি পূর্বে এদিকে আসেননি? আপনার নিবাস কোথায়? রজতপট গ্রাম শুনেছি অনেক দূর—আপনি কি পদব্রজে যাবেন? আচ্ছা, আত্রেয়ী নদী কি আরও প্রশস্তা?

প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিরই উত্তর দিতে হলো শ্যামাঙ্গকে। ইতোমধ্যে একটি বৃদ্ধা এসে উপস্থিত হয়েছে। সেও আলাপে যোগ দিলো। বৃদ্ধার রসনা প্রখর, তদুপরি সে সুরসিকা। ফলে তরুণী দু'টির স্বভাবত সংকোচও আর থাকলো না। যখন বৃদ্ধা জানতে চাইলো, পথিক এই নবীন যৌবনে বিবাগী কেন—এই বয়স তো প্রব্রজ্যার নয়? তখন সকৌতুকে শ্যামাঙ্গের মুখপানে দৃষ্টি রাখলো তরুণী দু'টি।

আর সে জন্যই বৃদ্ধার কথার উত্তর দেবার পূর্বে দু'মুহূর্ত ভাবতে হলো শ্যামাঙ্গকে। সে বুঝলো, বৃদ্ধা তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে রসিকতা করতে চাইছে। বললো, আয়ি, আপনার মতো কেউ যদি থাকতো, তাহলে কি এই অধম দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়ায়?

বৃদ্ধা হাসিতে ভেঙে পড়ে। মেয়ে দু'টিকে বলে, দেখ লো, পথিক কি চতুর—আমাকে সম্বোধন করলেও বক্তব্য কিন্তু তোদেরই শোনাচ্ছে। তোরা সাবধান হ।

বৃদ্ধার ঐ সরস কটাক্ষের উত্তরে, যে অধিকতর শ্যামা, সে বললো, আয়ি, আমাদের তো লোক আছে, তোমারই নেই—তুমি বরং ভেবে দেখতে পারো।

ঐ সময় নদীকূল থেকে একটি বালকের চিৎকার শোনা গেলো, তার মাছ কে একজন ছিনিয়ে নিচ্ছে। ঐ গোহারি শুনে বৃদ্ধা দাঁড়ালো না। যাবার সময় বলে গেলো, ওলো তোরা পথিককে ছাড়িস নে—আমি আসছি।

আয়ি সুরসিকা, শ্যামাঙ্গ মন্তব্য করে।

আমরাও দেখি, কি কি মাছ ধরা পড়লো।

শ্যামাঙ্গের মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে তরুণী দু'টি নদীতীর অভিমুখে অগ্রসর হলো। শ্যামাঙ্গ পেছন থেকে ডেকে বললো, বৃহৎ রোহিত ধরা পড়লে নিমন্ত্রণ যেন পাই, দেখবেন।

শ্যামাঙ্গের ঐ কথায় দু'জনই ঘুরে দাঁড়ায়। দু'জনেরই অক্ষিতারকা নৃত্যপর হয়, পথিক কি ব্রাহ্মণ?

কে ব্রাহ্মণ? আমি? শ্যামাঙ্গ অবাক হয়।

নাহলে রোহিত ভোজনের জন্য এরূপ উদগ্র বাসনা কেন?

শ্যামাঙ্গ প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেলো। শ্যামা তরুণীটি বড়ই বুদ্ধিমতী। সে সহজ স্বরে বললো, পথিকের আর দোষ কি বলুন, পুনর্ভবা তীরের রন্ধন নৈপুণ্যের খ্যাতি কে না জানে, তদুপরি নবাম্র আর সজিনাদণ্ডিকার ঋতু এখন—এ সময় ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকল রসনারই উদগ্র হওয়ার কথা, আশা করি আপনাদের অজানা নয় সে কথা।

তা নয়, উজ্জ্বলতরা তরুণীটি জানায়, কিন্তু এও মনে রাখবেন, এতদঞ্চলে ঝালের ব্যবহার বেশি। ঝালতপ্ত ব্যঞ্জন ভোজনের অভ্যাস কি আছে পথিকের?

শ্যামাঙ্গ হাসে। মনে মনে বলে, ঝালের কেমন ব্যবহার তা বাপু বিলক্ষণ অনুভব করছি। প্রকাশ্যে বলে, এ অধম ব্রাহ্মণও নয়, শিশুও নয়, যে ননীছানাভুক হবো, আপনারা নিমন্ত্রণ করে দেখুন একবার।

আচ্ছা সে দেখা যাবে, বলে মেয়ে দু'টি অতঃপর বিদায় নেয়।

শ্যামাঙ্গ এবার বেদী থেকে নেমে দাঁড়ায়। দেহের ক্লান্তি এবং অবসাদ সত্যিই এবার অনেকখানি দূর হয়েছে। সে দেখে, মৃত নদীর কর্দমাক্ত জলাশয় থেকে সিক্ত বস্ত্রে একে একে মৎস্য শিকারীরা উঠে আসছে। প্রত্যেকের কটিবন্ধনীতে মৎস্যমালা বিলগ্ন। বৃহদাকৃতির মৎস্য প্রায় কারও ভাগ্যেই জোটেনি।

তারা একে একে কৌতূহলভরে বৃক্ষতলে এসে দাঁড়ায়। কারও হাতে ক্ষুদ্রাকৃতি জালিকা। কারও হাতে লৌহাগ্র কোঞ্চ, কারও হাতে বংশখণ্ডিকা নির্মিত পলই। সকলেই শ্যামাঙ্গ সম্পর্কে জানতে চায়। ক্রমে তারা একযোগে ঘিরে দাঁড়ালো। আর তাতে অদ্ভুত একটি অনুভূতি হলো শ্যামাঙ্গের। জলের, মৃত্তিকার, আমিষের সম্মিলিত একটি গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে দিলো। একবার ক্ষণিকের জন্য মনে হলো, সে যেন অন্য মানুষ। সমাগত লোকেরা নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। কেউ কেউ নাম পরিচয় জানতে চায়। সে আত্রেয়ী তীরের মানুষ জানতে পেরে কয়েকজনের আগ্রহ কিঞ্চিৎ অধিক হলো। অত দূরের মানুষ এ অঞ্চলে অহরহ আসে না। যাদের আত্মীয়স্বজন ঐ দূরদেশে থাকে, তারা নানাবিধ কুশলাদি জানার প্রত্যাশী। যেমন, মহাশয় কি নীলাঞ্জন গ্রামের দিবোনাথকে চেনেন? আপনার গ্রাম থেকে মালঞ্চি গ্রাম কত দূর? আত্রেয়ী তীরের কুম্ভকারেরা কি আর মৃৎপাত্র নির্মাণ করে না? এই প্রকার একের পর এক প্রশ্ন। শ্যামাঙ্গ কোনো প্রশ্নের উত্তর

দিতে পারে, কোনোটির পারে না। ওরাই জানালো, আত্রেয়ী করতোয়া সংগম এখান থেকে বিশ ক্রোশাধিক পথ। এ গ্রামের হাটে কদাচিৎ আসে আত্রেয়ী তীরের মানুষ। আপনি বরং নবগ্রাম হাটে যান, একজন পরামর্শ দিলো, ওখানে প্রায় নিয়মিতই আত্রেয়ী তীরের বহু শকট আসে।

নবগ্রাম হাটের নাম শুনে শ্যামাঙ্গ আগ্রহী হয়। সুহৃদ নীলাম্বর নবগ্রাম হাটের কথা বারংবার বলে দিয়েছে। সে জানতে চাইলো, নবগ্রাম কি এ স্থান থেকে অধিক দূর?

না না, দূর কেন হবে? জলসিক্ত প্রৌঢ় লোকটি জানালো। বললো, এই ক্রোশ তিনেক পথ হবে।

ক্রোশ তিনেক। শ্যামাঙ্গ প্রমাদ গণে। তার অনুমান ছিলো, নবগ্রামে যদিবা সে নাও এসে থাকে তাহলে অন্তত পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামে এসেছে—উজুবট নবগ্রাম হাটেরই নিকটবর্তী কোনো স্থান হবে। কিন্তু এখন? সে পশ্চিমাকাশে চাইলো—সূর্যাস্তের আর দণ্ডাধিককাল দেরী—যদি যেতে হয়, তাহলে এখনই তার যাত্রারম্ভ করা উচিত। পথিমধ্যে হয়তো রাত্রি হবে—কিন্তু উপায় তো কিছু নেই, তিন ক্রোশ পথ সহজ ব্যাপার নয়।

সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাদুকা যুগল পরিধান করে, উত্তরীয় খানি স্কন্ধে রাখে এবং তার যথাসর্বস্ব পুটুলিটি হাতে তোলে।

তাকে ঐভাবে উদ্যোগী হতে দেখে প্রৌঢ়টি বললো, মহাশয় তিন ক্রোশ পথ কম নয়, আপনি অচেনা মানুষ, এই সন্ধ্যা সমাগমে যাত্রা না করলেই ভালো।

শ্যামাঙ্গ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়—হ্যাঁ, সন্ধ্যার আর সত্যিই দেরি নেই। কৌতূহলী গ্রামবাসীরা কৌতূহল নিবৃত্ত করে চলে যাচ্ছে। প্রৌঢ় লোকটিও চলে গেলো। আশ্চর্য ব্যাপার! তাকে সন্ধ্যা সমাগমে যাত্রা করতে নিষেধ করলো প্রৌঢ় লোকটি, অথচ তার রাত্রিযাপনের কি ব্যবস্থা হবে, সে সম্পর্কে কিছুই বললো না। তার অনুমান হয়, বোধ হয় তাকে আবার বিপদে পড়তে হবে।

ঐ সময় তার প্রৌঢ় পথিকের কথা মনে পড়ে। মনে মনে তুলনা করে, দণ্ড কয় আগে তার ভালো-মন্দ নিয়ে এক প্রৌঢ়ের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না—আর এখন অন্য এক প্রৌঢ় তার সমস্যার কথা জেনেও কিছু করার চেষ্টা করলো না। সে উঠে দাঁড়ায়, আপাতত যাত্রারম্ভ করাই বিধেয়। পথিমধ্যে যদি তেমন বোঝে, তাহলে পথিপার্শ্বেরই কোনো গ্রামে না হয় আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপণের মুহূর্তেই তাকে থামতে হলো। শুনলো, পথিক মনে হচ্ছে যাত্রারম্ভ করলেন?

তরুণী দুটি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেনি। সে ঘুরে দাঁড়ালো। এবং মৃদু হাস্যে বললো, হ্যাঁ ভাবছি, নবগ্রাম পর্যন্ত চলে যাই।

তার কথায় দু'জনের মুখেই ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া দেখা গেলো। একজন বললো, নবগ্রাম তো অতি নিকটে, তাই না?

হ্যাঁ, এক প্রৌঢ় তো তাই বললেন, মাত্রই তিন ক্রোশ।

হ্যাঁ, মাত্র তিন ক্রোশ, উজ্জ্বলতরা তরুণীটির চোখে মুখে কপট কৌতুক দেখা গেলো ঐ সময়। বললো, এই তিন ক্রোশ পথ সূর্যাস্তের মধ্যে অতিক্রম করতে আপনার অসুবিধা হবে না তাই না?

না, তা নয়, শ্যামাঙ্গ স্বীকার করে, পথিমধ্যে রাত্রি অবশ্যই হবে।

তাহলে? দু'জনের কণ্ঠ থেকে একসঙ্গে শব্দটি উচ্চারিত হয়।

তাহলে কী, শ্যামাঙ্গ জানতে চায়, পথ দুর্গম? পথিমধ্যে অরণ্য আছে? ব্যাঘ্র ভল্লুক আক্রমণ করে?

স্বল্প শ্যামা তরুণীটি জানায়, শুনুন মহাশয়, ও কাজও করবেন না। পথিমধ্যে অরণ্য আছে তা ঠিক এবং অরণ্যের ব্যাঘ্র ভল্লুকের আক্রমণের ভয়ও আছে। তবে সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ অরণ্য সংলগ্ন গ্রামগুলি—ঐ গ্রামগুলিতে দস্যু তস্করের বাস। যাত্রা করতে চাইলে ভেবে-চিন্তে তবে যাত্রা করুন।

শ্যামাঙ্গকে এবার ভাবতে হয়। তার কটিদেশে গ্রন্থিবদ্ধ স্থলীতে যা আছে তার মূল্য খুব বেশি না হলেও একেবারে তুচ্ছ নয়। উপরন্তু প্রৌঢ় পথিক আবার কিছু মুদ্রা তাকে দান করেছেন। এ তো মহাবিপদ। সে মনে মনে কিছুটা আতঙ্ক বোধই করে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে হাসে, বলে, কিন্তু আমার যাত্রা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন? এখানে আমাকে কে থাকতে দেবে?

ঐ কথায় দুই তরুণীই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বোঝা যায় তারা দারুণ বিব্রত বোধ করছে। উত্তরে তারা কিছুই বলে না এবং এমন ভাব করে, যেন তাদের ব্যস্ততা আছে এবং অচিরাৎ তাদের গৃহে ফেরা প্রয়োজন।

আচ্ছা, এখানে কোনো মন্দির নেই? শ্যামাঙ্গ জানতে চায়।

হ্যাঁ আছে, কেন থাকবে না, একজন হাত তুলে দেখায়, ঐ যে দেখুন, মন্দিরের ধ্বজা উড়ছে।

শ্যামাঙ্গ সেদিকে লক্ষ্য করেনি তা নয়। সে পূর্বেই দেখেছে চক্রলাঞ্ছিত গৈরিক ধ্বজা চৈত্রের বাতাসে সতেজে উড্ডীন। সে বলে, কিন্তু ও তো বিষ্ণুমন্দির, সম্ভবত ব্রাহ্মণদের নিবাস ওখানে, নিকটে কোনো শিবমন্দির নেই?

পথিক কি শিবভক্ত? আবার কৌতুক ফোটে শ্যামাঙ্গী তরুণীটির স্বরে।

না, শ্যামাঙ্গ জানায়।

তাহলে কী?

এবার উজ্জ্বলবর্ণা মেয়েটির চোখে হাসি দেখা গেলো। বললো, ব্রাহ্মণ নয়, শিবভক্ত নয়, তাহলে কী?

কেন ব্রাহ্মণ ও শিবভক্ত ব্যতীত কি অন্য কিছু হওয়া যায় না?

যাবে না কেন? শ্যামাঙ্গী মেয়েটি উত্তর দিলো। বললো, শিবভক্ত না হয়ে যখন কোনো অপরিচিত আগন্তুক শিব মন্দিরের আশ্রয় সন্ধান করে, তখন তার পরিচয় জানতে চাওয়া গ্রামবাসীর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

শ্যামাঙ্গ ততক্ষণে বুঝে নিয়েছে, এই তরুণীটির বুদ্ধি যেমন প্রখর বাকপটুতাও তেমনই অসাধারণ। তার বাক্যালাপ সে উপভোগ করতে লাগলো। বললো, জানা ছিলো না যে, পুরুষ নয়, নারীরাই পুনর্ভবা তীরে কোট্টপালের দায়িত্ব পালন করে।

তরুণীটি অপ্রতিভ হয় না। বলে, যদি তাই-ই হয়, তাহলে কি দোষ আছে কিছু?

না, না, দোষ কেন থাকবে? শ্যামাঙ্গ জানায়, আমার এখন মনে হচ্ছে, নবগ্রাম যাত্রা করাই বোধ হয় উত্তম ছিলো।

কেন? হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন? মেয়ে দুটি হতচকিত বোধ করে।

মনে হচ্ছে এজন্য যে শুনেছি, কামরূপ প্রভৃতি পূর্বদেশে রমণীরাই সমাজে সর্বেসর্বা— সেখানে পুরুষেরা কেউ বলীবর্দ, কেউ ছাগ, কেউবা কুক্কুর—এখন চিন্তা হচ্ছে, পুনর্ভবা তীরেও সেই রীতির প্রচলন হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে, তাহলে কি এই দীন অভাজন পুনরায় গৃহের মুখ দেখতে পাবে?

শ্যামাঙ্গের ঐ কথায় দুই তরুণীই হেসে উঠলো।

ললিত প্রেক্ষণা রমণীর আননে সকৌতুক হাস্য পরিহাস যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে তা শ্যামাঙ্গের অজানা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সম্মুখের তরুণী দুটির হাস্যাননে কোনো প্রকার ইন্দ্রজালই সে সৃষ্টি হতে দেখলো না। যা দেখলো তা নিতান্তই সহজ কৌতুক—এবং তাতে তার মন হয়ে উঠলো ভারমুক্ত। কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা বা মানসিক পীড়ন ঐ সময় তার অনুভূতিতে আর রইলো না।

শ্যামাঙ্গ নগরবাসী রাজপাদোপজীবী অথবা সামন্তপ্রভু গৃহের যুবকপুত্রদের মতো লীলারঙ্গে কুশলী নয়। হলে সে এই কৌতুকহাস্যকে দীর্ঘায়ত করতে সচেষ্ট হতো। এবং হাস্যালাপের সূত্র ধরে প্রণয়াসক্তি প্রকাশের চেষ্টা করতো। তাই কৌতুকের ভাবটি সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। কারণ ওদিকে দিবা অবসান প্রায়—এবং তরুণী দুটি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। তদুপরি তার নিজেরও একটি রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সে কখনও বামে কখনও দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো। যদি কোনো বয়স্ক পুরুষ গোচরে আসে।

শ্যামাননা তরুণীটি তা লক্ষ্য করে থাকবে। বললো, পথিক কি কাউকে সন্ধান করছেন?

হ্যাঁ, আপনাদের গ্রামে দেখছি পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প।

কেন, তাতে কি ভয় হচ্ছে? মেয়েটির স্বরে কৌতুক ঘোচে না। কপট আশ্বাস দেয় সে। বলে, আপনার ভয়ের কারণ নেই, বলীবর্দ, ছাগ অথবা কুক্কুর কোনোটারই আমাদের প্রয়োজন নেই।

আহা যদি হতো! শ্যামাঙ্গ যেন দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

হলে কি ভাল হতো? মেয়েটির চোখে ঈষৎ বিস্ময় ফোটে, এই না বললেন যে আপনার ভয় হচ্ছে—আবার এখনই হায়-হুতাশ কেন?

শ্যামাঙ্গ আক্ষেপ করে বলে, হায় যদি আপনাদের প্রয়োজন হতো, তাহলে বলীবর্দরূপে হোক, কি ছাগরূপে,—রাত্রিযাপনের একটা ভালো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমার জন্য করতেন আপনারা।

তরুণী দুটি আবার বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করে। তাদের মুখ দেখে শ্যামাঙ্গ বোঝে, পথিককে তারা যে গৃহে আমন্ত্রণ জানাতে পারছে না, এই জন্যই তাদের মুখে ঐ বিব্রত ভাব। সে তখন জানতে চাইলো, আচ্ছা, আমি যদি ঐ মন্দিরে গিয়ে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাহলে কেমন হয়?

না, স্বল্প-শ্যামা উত্তরে জানায়, আপনি বরং আমাদের গ্রামে যান—আমার পিতা শুকদেব, মাতুল দীনদাস। গ্রামে গিয়ে এঁদের সন্ধান করবেন এবং নিজ পরিচয় দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন।

ক্ষণেক চিন্তা করে হঠাৎ মেয়েটি জানতে চাইলো, আম্রপট্টলী গ্রাম কি চেনেন আপনি? আত্রেয়ী তীরের আম্রপট্টলী?

কেন, ঐ গ্রামে কে আছে আপনার? শ্যামাঙ্গ কৌতূহলী হয়। আম্রপট্টলী গ্রাম সে বিলক্ষণ চেনে—সেখানে তার মাতুলালয়। বললো, আমার গ্রাম রজতপট, আম্রপট্টলী থেকে দূরত্ব পাঁচ ক্রোশের মতো।

শ্যামাঙ্গের কথায় যেন উৎসাহ বোধ করে মেয়েটি। বললো, আম্রপট্টলীতে আমার ননদের শ্বশুরালয়। আমার পিতাকে বলবেন যে অনন্তদাসকে আপনি চেনেন। আমার ননদের নাম ব্রজতারা, মোহনদাস তার স্বামী, অনন্তদাসের পুত্র। আমার নাম মায়া, মায়াবতী—বলবেন যে আমার নাম আপনি জানেন।

ব্যাপারটি বেশ জটিল। মায়াবতীর ননদ ব্রজতারা, তার স্বামী মোহনদাস, মোহনদাসের পিতার নাম আবার অনন্তদাস—নিবাস আম্রপট্টলী গ্রাম—অতি দীর্ঘ একটি তালিকা। শুধু এইটুকুই নয়—একটি সম্পূর্ণ কাহিনী নির্মাণ করতে হবে তাকে এখন এবং সর্বক্ষণ সেটি মনে রাখতে হবে। তারপরও রয়েছে মায়াবতীর স্বামীর নাম, শ্বশুরের নাম, তাদের গ্রামের নাম—সম্পূর্ণ ব্যাপারটি আয়ত্তে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। মায়াবতীর পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না তার কাছে। বললো, আতিথ্য লাভের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? এই কি নিয়ম নাকি এদেশে?

ঐ প্রশ্নে মায়াবতী গম্ভীর হয়ে উঠলো। বোধ হয় কিঞ্চিৎ আহত হলো সে। তার সঙ্গিনীও যে খুব প্রসন্ন হয়েছে এমন মনে হলো না। মায়াবতী সঙ্গিনীকে ডেকে বললো, আয় লীলা, আমরা যাই, বেলা গেলো।

তাহলে এ হলো মায়া, শুকদেবের কন্যা, আর ঐটি হলো লীলা, সম্ভবত লীলাময়ী অথবা লীলাবতী। শ্যামাঙ্গের নাম দুটি মধুর বোধ হলো। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, মায়াবতীদের গৃহেই সে আতিথ্য প্রার্থনা করবে।

অদূরে মেয়ে দু'টি উচ্চ আলপথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লীলাবতীর কেশভার বিপুল। নদীতীরের বাতাসে তার শিথিল কবরী বিস্রস্ত হওয়ায় বারবার তাকে দু'হাত

তুলে কবরী বন্ধন করতে হচ্ছিলো। আর ঐ সময়ই শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করে লীলাবতীর দেহসৌষ্ঠব অনিন্দ্য। সে একটি অপরূপ যক্ষিণী মূর্তি দেখেছিলো সোমপুর মহাবিহারে। লীলাকে দেখে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত পীবরস্তনী, বিপুলজঘনা, সুকেশী যক্ষিণী মূর্তিটি বারবার তার মানস চক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এবং নিজ বক্ষের অনেক গোপনে কোথায় যেন সে বারবার শিহরিত হতে লাগলো।

মায়াবতী পিত্রালয়ে থাকে এবং সে যে বিবাহিতা তা বোঝা গেলো। কিন্তু লীলাবতী? তার সংবাদ তো জানা গেলো না কিছুই, সে কি সত্যিই স্বামী পরিত্যক্তা?

বরেন্দ্রভূমির এ অঞ্চলটি বৎসরে একবার মাত্র শস্যময় হয়ে ওঠে। ধান্যক্ষেত্রগুলিতে হল স্পর্শ এখনও ঘটেনি। খরায় বরেন্দ্রের মৃত্তিকা লৌহপ্রায়, তৃণখণ্ডও গোচরে আসে না। চারণভূমি সম্ভবত দূরে কোথাও। সন্ধ্যাগমে তখন গৃহপালিত গবাদি সদলে গৃহে ফিরছে, তাদের খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি পশ্চিমাকাশে একটি ধূসর গৈরিক আবরণ বিস্তৃত করে দিয়েছে। ঐ সময় আবার খেয়ালী একটি রাখাল বালক বংশীতে শেষবারের মতো তার সুরটি বাজিয়ে নিচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গের মন ঐ সুর শুনে উদাস হয়ে উঠলো।

দূরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গ বুঝলো, যেদিকে মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে সম্ভবত সেদিকে ব্রাহ্মণদের বাস। গবাদি পশুর দল ঐ দিকেই চলেছে। শ্যামাঙ্গ বাম দিকের পথ ধরলো। পথ সংকীর্ণ, কখনও আম্রকাননের মধ্য দিয়ে, কখনও বা বেনুবীথিকার মধ্য দিয়ে। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দেখলো কয়েকটি কুটির, ভয়ানক জীর্ণ দশা কুটিরগুলির। শ্যামাঙ্গ অনুমান করে, সম্ভবত এখানে ডোম শ্রেণীর বাস। এক প্রৌঢ়াকে দেখা গেলো সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও চাঙাড়ি নির্মাণে ব্যস্ত। নিকটেই কর্দমাক্ত নালিকায় শূকর পাল। একটি উলঙ্গ বালক কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে মা মা ডাকে কেঁদে যাচ্ছে। শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করলো, বালকটির পঞ্জরাস্থিগুলি ভারী প্রকট। নিকটে গেলে নির্ভুলভাবে গণনা করা যাবে।

অধিক দূর যেতে হলো না। ডোমপল্লী অতিক্রম করে সামান্য অগ্রসর হয়েছে—ঐ সময় দেখলো একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষের নিচে দুই প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গেলে তাঁরাই জানতে চাইলেন, মহাশয়ের নিবাস কি আত্রেয়ী তীরে?

শ্যামাঙ্গ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাক, আপাতত দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া গেলো। সে বুঝলো, মায়াবতী যথার্থই মায়াবতী। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রৌঢ়টি বললেন, আমার কন্যা মায়াবতী

আপনার আগমনের কথা আমাকে জানিয়েছে। আপনি নাকি মন্দিরে আর গ্রামপতির গৃহে আশ্রয় সন্ধান করছিলেন?

শ্যামাঙ্গ শুকদেবকে আভূমি বিনত হয়ে প্রণাম জানায়। সৌম্যকান্তি এই বৃদ্ধটিকে দেখে তার খুব ভালো লাগছে। দৃষ্টিমাত্র মনোহরণ করতে পারে এমন লোক শুকদেব। পার্শ্ববর্তী প্রৌঢ়টিকে দেখিয়ে বললেন, ইনি আমার পরমাত্মীয়, মায়াবতীর মাতুল দীনদাস—নিবাস নিকটবর্তী গ্রাম উদয়পুর—বর্তমানে আমার গৃহে কিছুদিন অবস্থান করছেন।

বিনয়ে বিগলিত হওয়ার অবস্থা শ্যামাঙ্গের। কিছুক্ষণ পূর্বে সে পুনর্ভবা তীরবাসীর শীতল নিস্পৃহতা দেখে মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলো, এখন সে মনে মনে লজ্জিত হলো। পথিককে যে এমন সম্মান দেখানো যেতে পারে, তার জানা ছিলো না।

পথক্রমণে আলাপ হচ্ছিলো। পিতৃপরিচয়, কি হেতু এই দূর-যাত্রা, পরিবারে কে কে বর্তমান, এইসব প্রসঙ্গ এবং সেই সঙ্গে আত্রেয়ী তীরের শস্য পরিস্থিতি, বস্ত্র-তৈজসাদির মূল্য, রাজপাদোপজীবীদের আচরণ—এই সকল বিষয়েও তাঁরা নানান কথা জানতে চাইলেন।

সাংসারিক বিষয়াদি শ্যামাঙ্গের সম্যক জানা নেই। তবে যা যা সে জ্ঞাত ছিলো, জানালো। যেমন, তণ্ডুল বর্তমানে অধিক সুলভ নয়, গোধূম কদাচিৎ পাওয়া যায়—বস্ত্রাদি ক্রমেই মহার্ঘ হয়ে উঠছে, তৈজসাদির জন্য দক্ষিণাপথের নৌযানগুলি আর আত্রেয়ী করতোয়া সঙ্গম পর্যন্ত আসছে না, রাজপুরুষদের হাতে প্রায়ই মানুষ অহেতুক লাঞ্ছিত হয়—এই সকল সংবাদ সে প্রৌঢ় দুটিকে জানাতে পারলো।

জলযোগ আগমন মাত্রই হয়েছে—সুতরাং তার ক্ষুধা ছিলো না। এবং ক্লান্তিও না। প্রায় সমগ্র অর্ধদিবস সে তো বিশ্রাম করেই কাটিয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে ছিলো। তাঁদের সান্নিধ্য শ্যামাঙ্গের ভালো লাগছিলো না। সে মনে মনে এমন সমবয়সী যুবাপুরুষ খুঁজছিলো, যাদের সান্নিধ্যে সে সহজ হাসি এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে পারে। সে ভাবছিলো, কখন গৃহের বাইরে যাবে, সে ঘুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করছিলো, নিকটে শিবমন্দির আছে কি না, ধর্মক্রিয়াদি তাহলে কোথায় সম্পন্ন হয়? ব্রাহ্মণপল্লীতে কি নাটমন্দির আছে? কায়স্থপল্লী কতদূর? এ স্থানের কায়স্থরা কি যথার্থই কায়স্থ, নাকি ভূম্যধিকারী মাত্র?

তার প্রশ্নের উত্তর কেউ কেউ দিচ্ছিলো। সমবেত লোকদের মধ্যে তরুণ বয়স্ক কয়েকজন ছিলো, তবে তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতির কারণে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছিলো না। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা স্থানটিকে মুখরিত করে রেখেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে যত না শুনছিলেন তদপেক্ষা বলছিলেন বেশি। একজন তাঁর ভাগিনেয়ীর কথা বললে অন্যজন তাঁর পাটল রঙের গাভীটির কথা আরম্ভ করে দেন। ওদিকে একজন আবার তাঁর দৌহিত্রটি কেমন চতুর হয়ে উঠেছে সেই সংবাদ জানাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

দু'জন একজন করে আরও প্রতিবেশীর আগমন ঘটেছে ততক্ষণে। দূরদেশী পথিকের সাক্ষাৎ অহরহ ঘটে না। তদুপরি শোনা গেছে যে পথিক যেমন প্রাজ্ঞ তেমনি সুরসিক।

ফলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ হয়ে গেলো এক সময়। যেমন, পথিক যে গ্রাম থেকে আসছেন, সে গ্রামে দ্রব্যসামগ্রী সুলভ, না মহার্ঘ? রাজপুরুষের ব্যবহার কেমন? পথিক কি লক্ষণাবতীর সংবাদ জানেন? মহাসামন্ত হরি সেনের অনুচরেরা নাকি হাটের বিপণীকারদের কাছ থেকে কর আদায় করছে? মহাসামন্ত যজ্ঞদত্ত কি সত্যই বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী?

এসব প্রশ্নের উত্তর শ্যামাঙ্গ কেমন করে দেবে? সে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলো। তার সৌভাগ্য যে বৃদ্ধেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই ঐ প্রশ্নগুলির সূত্রে নানান প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফেললেন। ফল হলো এই যে শ্যামাঙ্গকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলো না।

শ্যামাঙ্গ কতক শুনছিলো, কতক শুনছিলো না। কিন্তু এক সময় তাকে মনোযোগী হতে হলো। আলোচনা হচ্ছিলো সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের সম্পর্কে। সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের নাকি অধিক সংখ্যায় আগমন ঘটছে এ অঞ্চলে। দীনদাস তার কাছে জানতে চাইলেন, আপনাদের অঞ্চলেও কি ভিক্ষুদের আগমন ঘটেছে?

অবাক হয় শ্যামাঙ্গ। বলে, কেন এ অঞ্চলে কি ভিক্ষু নেই?

আছে, দীনদাস জানান, তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য ছিলো, দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। ছিলো দু'জন, এখন তারা সংখ্যায় পাঁচজন।

শ্যামাঙ্গ ঠিক বুঝতে পারে না। বিশ ক্রোশ কি দুরতিক্রম্য দূরত্ব? না হলে এখানে এমন ভিন্ন পরিস্থিতি কেন? নিজ গ্রাম রজতপাটে কোনো মন্দির নেই, কিন্তু ভিক্ষুরা তো ঠিকই আছে—ক্রমে হয়তো সংখ্যা বৃদ্ধিও হয়েছে তাদের। আম্রপট্টলীর সংবাদও তার জানা আছে—সেখানেও ভিক্ষুদের সংখ্যা কম নয়—বিল্বমূল গ্রামেও তো সে দেখে এলো ভিক্ষুদের। ভিক্ষুরা এমন কি গুরুত্ব ধারণ করে যে তাদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি আলোচনার বস্তু হয়ে উঠবে?

সে বললো, আমাদের অঞ্চলে সর্বত্রই ভিক্ষুরা আছে, বহুকাল ধরেই আছে, তাদের সংখ্যা নিয়ে কখনও কোনো সমস্যা হয়েছে এমন শুনিনি।

দীনদাস হাসেন। বলেন, তাহলে বলতে হবে, আপনাদের অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি কুলীনের সংখ্যা কম, নাকি রাজপাদোপজীবীরা যথেষ্ট শক্তিমান নয়?

শ্যামাঙ্গ প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝলো। আত্রেয়ী তীরে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি কুলীনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—এবং রাজপাদোপজীবীরাও বিলক্ষণ সেখানে উপস্থিত। তবে ভিক্ষু, শ্রমণ বা যোগীদের ব্যাপারে তাদের মারমুখী হতে কখনও দেখা যায় না। কে জানে, এ অঞ্চলে হয়তো এখনও প্রাচীনকালের বিধি-বিধানই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মাতামহের কাছে সে শুনেছিলো, এক সময় নাকি ভিক্ষুদের গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো, কোনো গৃহস্থ-দ্বারে এলে তাদের দূর দূর করে তাড়না করা হতো।

সে জানায়, আজ্ঞে না, আপনার অনুমান ঠিক নয়। আত্রেয়ী তীরেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছে এবং রাজপুরুষেরাও আছে। মনে হয়, ভিক্ষু নিগ্রহে তারা আর যথেষ্ট উৎসাহী নয়। হলে, আমি সে সংবাদ পেতাম।

মুহূর্তেক পর সে আবার বললো, এ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আপনাদের এ অঞ্চলে ভিক্ষুর সংখ্যা মাত্রই পাঁচজন।

অহেতুক তোমরা ভিক্ষুদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অস্থির হচ্ছো, মায়াবতীর পিতা শুকদেব বলেন, ভিক্ষুরা তো এদেশী, তোমরা কি পশ্চিম দেশাগত যবন জাতীয়দের কেউ দেখেছো?

ঐ কথায় সকলে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পথিক কি দেখেছেন? পথিক নিশ্চয়ই যবন জাতীয়দের কথা জানেন, উনি নিশ্চয়ই কিছু বলবেন—এই প্রকার গুঞ্জন উঠলো। শ্যামাঙ্গ শুনেছে যে পশ্চিম দেশ থেকে যবন জাতীয় অশ্ব ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে এসে থাকে। কিন্তু সে কখনও তাদের দেখেনি। সে বললো, আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না, আমি তাদের দেখিনি।

তার কথায় সকলেই হতাশ হয়। তবে দীনদাস হলেন না। তিনি একটি যুবাপুরুষের দিকে ইঙ্গিত করলেন, গৌরদাস, তুমি তো যবনদের দেখেছো, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গোকুল হাটে তারা এসেছিলো। অধিকক্ষণ থাকেনি, অপরাহ্নে এসে সন্ধ্যা সমাগমে তারা আবার চলে গিয়েছিলো, বড় অদ্ভুত জাতি।

গোকুল হাট উজুবট থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী। সাধারণত গো-মহিষাদি পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সেখানে বহু দূরাগত ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম হয়। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো গৌরদাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনার জন্য।

কিন্তু শোনা হলো না। তার পূর্বেই অন্তঃপুরের আহ্বান এসে গেলো। একটি বালক এসে জানালো, আহারের আসন দেওয়া হয়েছে, রাত্রি কম হয়নি, মাতামহী পথিককে নিয়ে অন্তঃপুরে যেতে বলেছেন।

সবাইকে উঠতে হলো। প্রতিবেশীরা বিদায় নিলো একে একে। শ্যামাঙ্গের মনে কিন্তু ভিক্ষুদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্নটি তখনও রয়েই গেছে। কেন এরা ভিক্ষুদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে এতো চিন্তিত? এই সংখ্যাবৃদ্ধির কি কোনো তাৎপর্য আছে? না হলে দীনদাস কেন ঐ প্রসঙ্গ তুললেন? আর যবন জাতি? এরাই বা কেন এদেশে আসছে? তার মনে একের পর এক প্রশ্নগুলি আসতে লাগলো।

আহারে মনোনিবেশ করতে পারলো না। অথচ আয়োজন ছিলো ভালো। মৎস্যের ব্যঞ্জনই তিন প্রকার, ভর্জিত ইল্লিশখণ্ড, সন্তলিত চিতলপেটিকা এবং নবাম্রসহযোগে মৌরলা। অলাবুসহ মুগও ছিলো সঙ্গে। দেখা গেলো, একটি মাত্র পাত্রে মাংস-ব্যঞ্জন। তবে তার প্রায়-রক্তিম তৈলাক্ত রূপ রসনাকে ব্যাকুল করার জন্য যথেষ্ট। এতদতিরিক্ত দধি খণ্ড-মিষ্টান্ন ইত্যাদি তো ছিলোই।

দ্বারান্তরাল থেকে গৃহিণী অবলোকন করছিলেন। তরুণ পথিকটিকে দর্শনমাত্রই তাঁর পুত্রশোক উদ্বেল হয়ে উঠেছে। গত বৎসর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি দস্যুহস্তে নিহত হয়েছে। তার সঙ্গে পথিকের মুখাবয়বে অদ্ভুত সাদৃশ্য। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়নজল মুছেছেন বার দুই। শ্যামাঙ্গকে অমনোযোগী দেখে মায়াবতীকে ইঙ্গিত করলেন। সে বলে উঠলো, ভ্রাতঃ কিছুই যে নিচ্ছেন না, গৃহের জন্য কি চিন্তা হচ্ছে?

ঐ কথার পর আহারে মনোযোগী হতে হলো। তবে প্রশ্নটি না তুলে পারলো না শ্যামাঙ্গ। দীনদাসের মুখপানে দৃষ্টি রেখে জানতে চাইলো, ভিক্ষুদের সংখ্যা বৃদ্ধির কি কোনো তাৎপর্য আছে বলে বোধ হয় আপনার?

দীনদাস তখন মুখ গহ্বরে মৎস্যপেটিকার তৈলাক্ত অংশটি নিয়ে ওষ্ঠদ্বয় সংবদ্ধ করে দক্ষিণ হস্তে কন্টক গুচ্ছ টানতে ব্যস্ত। তিনি ঐ অবস্থাতেই মস্তক হেলন করলেন। তবে ঐ পর্যন্তই, তাঁকে আর বলতে হলো না। শুকদেব জানালেন, নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না—তবে বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, কাষায় বস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক ঐ ভিক্ষুরা নানাবিধ দুষ্কর্মের আকর। তারা এক সময় রাজদ্রোহী ছিলো, এ কারণে গৌড়াধিপতি ও তাঁর অনুচর রাজপুরুষেরা তাদের সমূলে উৎপাটিত করেন—তাদের মন্দিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এবং ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুরোহিতদের নিক্ষেপ করা হয়। এতোকাল পরে যখন আবার তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, তখন সেটি একেবারেই তাৎপর্যবিহীন হতে পারে, বলুন?

বৌদ্ধ প্রসঙ্গটি শ্যামাঙ্গেরও কিঞ্চিৎ জানা আছে। সে জানে, সমগ্র গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ নিগ্রহের ঘটনাটি ঘটে, কিন্তু সে তো প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বের কথা। দুর্বল, বিতাড়িত এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষুদের এখন এমন কি শক্তি সঞ্চয় হয়েছে যে তারা মাণ্ডলিক ও সামন্ত মহাসামন্তদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে? সে বুঝে উঠতে পারে না।

দীনদাস, তুমি কি পশ্চিম দেশাগত যবনদের দেখোনি? হঠাৎ শুকদেব শ্যালককে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ, দেখেছি, অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছি—সে বড় আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আপনি দেখেছেন ধর্ম প্রচারকদের, কিন্তু আমি দেখেছি বণিকদের। আচ্ছা, আপনি কি ওদের উপাসনা করতে দেখেছেন? দীনদাস জানতে চান।

না তো? শুকদেব কৌতূহলী হলেন। বললেন, তুমি কোথায় দেখলে, বলোনি তো?

গোকুল হাটেই আমি দেখেছি—আমার সঙ্গে গৌরদাস ছিলো। বলতে বলতে দীনদাস দধি ভাণ্ডটি কাছে টেনে নিলেন। অতঃপর পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন, সে এক বিরল অভিজ্ঞতা, এবং অভিনব দৃশ্য। গোকুল হাটে ওরা সেদিন তিনটি অশ্ব নিয়ে আসে—অশ্বারোহণেই তারা এসেছিলো। তাদের অশ্বগুলি দেখবার মতো। আহা! যেমন তাদের উচ্চতা, তেমনি তাদের দেহসৌষ্ঠব, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় একেবারে।

বণিক দলটি ছিল ক্ষুদ্র, সংখ্যায় তারা মাত্রই চারিজন। দ্বিপ্রহরের পরে তারা হাটে উপনীত হয়। বলাই বাহুল্য, তাদের অশ্ব ক্রয় করার মতো লোক গোকুল হাটে ছিলো না। সম্ভবত ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিলো তারা। তাই অপরাহ্ণের শেষে তারা বিশ্রাম এবং আহারের আয়োজন করে। একজন প্রথমে একখানি বস্ত্র বিস্তৃত করে। তার মধ্যস্থলে রাখা হয় খাদ্যবস্তুগুলি, খণ্ড-মিষ্টান্ন এবং কদলী। অতঃপর একে একে তারা হস্তমুখ প্রক্ষালন সম্পন্ন করে। ঐ প্রক্ষালন ক্রিয়াও সম্ভবত তাদের উপাসনার অঙ্গ। কারণ হস্তমুখ প্রক্ষালনের সময় তারা মন্ত্রপাঠ করছিলো, নিঃশব্দে।

শ্যামাঙ্গের দক্ষিণ হস্ত তৎপর ছিলো, এবার শ্রবণও তৎপর হয়ে উঠলো।

হস্তপদ প্রক্ষালন শেষে হলে তারা খাদ্যবস্তুগুলির চারিদিকে বৃত্তাকারে উপবেশন করলো। দিবাবসানের মুহূর্তটিতে একজন দাঁড়িয়ে দুই কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে উচ্চ স্বরে আরম্ভ করলো মন্ত্রপাঠ—ভাষা বড় দুর্বোধ্য, তবে মনে হচ্ছিলো, কাউকে যেন আহ্বান করা হচ্ছে।

মন্ত্রপাঠ শেষ হলে তারা একত্রে বসে আহার্য গ্রহণ করলো। এ এক অদ্ভুত জাতি, প্রভু ভৃত্য একত্রে বসে এবং একত্রে বসে আহার্যও গ্রহণ করে। আহার শেষ হলে সারিবদ্ধভাবে সকলে দাঁড়ালো। অগ্রভাগে দাঁড়ালো যে লোকটি, সে প্রায় বৃদ্ধ এবং দীর্ঘ-শ্মশ্রুমণ্ডিত, সে-ই ছিলো ওদের পুরোহিত। এবং এ-ও এক আশ্চর্য কাণ্ড, ওরা সমবেতভাবে উপাসনা করে, পুরোহিত নেতৃত্বে থাকে, আর সকলে তাকে অনুসরণ করে। দেখলাম, বৃদ্ধটি প্রথমে কর্ণমূলে দুই হাত স্পর্শ করে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলো—অতঃপর নাভীমূলে হাত দুখানি একত্রে মুষ্টিবদ্ধ করে আবার চললো কিছুক্ষণ মন্ত্রপাঠ। ওদের মন্ত্রোচ্চারণ সুললিত ও সঙ্গীতময়। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলে দু'হাত হাঁটুতে সংবদ্ধ করে শরীরের উচ্চাংশ বিনত করে রাখলো কয়েকমুহূর্ত, অতঃপর পুনরায় দেহ ঋজু করে মুহূর্তেক দাঁড়িয়েই নতজানু হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলো। একইভাবে দুবার প্রণাম করে পুনর্বার উঠে দাঁড়ালো। প্রণাম যে কাকে করলো বলা কঠিন। পশ্চাদ্বর্তীরা না হয় পুরোহিতকে করলো—কিন্তু পুরোহিত কাকে করলো? কোনো দেবমূর্তি সম্মুখে ছিলো না, দীনদাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও করছিলেন। তাতে বর্ণনাটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বললেন, ভেবে দেখুন, উপাসনার স্থল উন্মুক্ত প্রান্তর, কোনো দেবালয় নয়, সম্মুখে কোনো বিগ্রহ নেই, পূজার নৈবেদ্য নেই, উৎসর্গ নেই—অথচ উপাসনা হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কয়েকবার উত্থান, মন্ত্রপাঠ এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার পর সর্বশেষে একবার দক্ষিণে একবার বামে দুটি শ্লোক উচ্চারণ করে তারা উপাসনা শেষ করলো।

শ্যামাঙ্গ হতবাক হয়ে শুনছিলো। এই নাকি যবন জাতির উপাসনা! কার উপাসক তারা? বিষ্ণুর, নাকি, শিবের? নাকি ভিন্ন কোনো দেবতার? তার মনে কৌতূহল হলো তীব্রতর। ওদিকে শুকদেব বলে উঠলেন, এই যবন জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র, মগধ দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রায় সকল রাজ্যই এখন তাদের পদানত।

কিন্তু আমার তো মনে হলো না যে তারা হিংস্র, দীনদাস জানালেন। বললেন, বরং মধুর-স্বভাব এবং প্রীতিপ্রার্থী বলেই আমার ধারণা হলো। ওরা দেশীয় ভাষায় আলাপের চেষ্টা করে কয়েকবার। দেখলাম, আলাপ করতে গেলে একেবারে আলিঙ্গন করতে চায়।

দীনদাস, ওতে কিছুই প্রমাণিত হয় না—শুকদেব বললেন, যে লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো, সে ছিলো ধর্মপুরোহিত, এতো সুমধুর ব্যবহার কখনও এতদ্দেশীয় কোনো পুরোহিতের হতে পারে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এমন বিনয়ী, এমন সৌম্য ও পবিত্রদর্শন যে কি বলবো তোমাকে। ওদের মধুর ব্যবহার যেমন সত্য, তেমনি

সত্য হত্যা এবং লুণ্ঠনও। সন্ধান নিয়ে দেখো, মগধ দেশের জনপদগুলির কি অবস্থা হয়েছে। সহস্র লোকের প্রাণ গেছে এই যবনদের অসির আঘাতে। এদেরই আরেক রূপ যে যমদূতাকৃতি সে কথা ভুললে কিন্তু অপরাধ হবে।

আহার শেষে শুকদেব আচমনের জন্য উঠে গেলেন। শ্যামাঙ্গ তাঁকে অনুসরণ করলো। যবন জাতির কথা তার শোনা ছিলো, কিন্তু তাদের আচরণাদি সম্পর্কে এতো বিস্তারিত সে জানতো না। তার অনুমান হলো, যবন বণিকেরা সম্ভবত এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় আগমন করছে আজকাল। আচমন শেষে সে জানতে চাইলো, আপনি কি যবনদের আগমনেরও কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন?

দীনদাস প্রশ্ন শুনে হাসলেন। বললেন, বৎস, জগতে কি কার্যকারণ সম্বন্ধবিহীন কোনো ঘটনা ঘটে? এই যে তুমি এই গৃহে অতিথি, তোমার আগমন কি এই গৃহে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি? যবন বলো, বৌদ্ধভিক্ষু বলো, যোগীদের কথা বলো—এদের প্রত্যেকের অধিক সংখ্যায় আগমন নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, ভালো হোক, মন্দ হোক, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারে না।

রাত্রি অধিক হয়নি। কিন্তু শ্রান্তক্লান্ত বিবেচনা করে দীনদাস ও শুকদেব উভয়েই পথিককে শয্যায় শায়িত রেখে অতিথিগৃহের দ্বার বন্ধ করে চলে গেলেন।

কিন্তু শ্যামাঙ্গের ঘুম আসছিলো না। দিন তার কেমন চমকপ্রদ কাটছে ভেবে নিজেরই অবাক লাগছিলো। বিল্বমূল গ্রামে গুরু বসুদেবের সঙ্গে গতকাল রাত্রেই তার বাদানুবাদ হয়েছে। আর আজ দ্বিপ্রহরে পথিকদল তাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় প্রান্তর ভূমি থেকে উদ্ধার করে। অতঃপর মায়াবতী লীলাবতী নামক দুই তরুণীর সঙ্গে আলাপ এবং এই উজুবট গ্রামে আতিথ্য গ্রহণ। এরপর আরও কিছু ঘটবে কি না ঈশ্বর জানেন।

সে নিজেকে ডেকে বললো, শ্যামাঙ্গ, জীবন প্রকৃতই বিচিত্র, সমগ্র জীবন ব্যয় করে দিলেও তুমি এই বিপুল অনিশ্চিত এবং আকস্মিক বৈচিত্র্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না।

বাইরে পশ্চিমা বায়ু বিরতিবিহীন প্রবাহিত হচ্ছে। বায়ু-তাড়িত ছিন্নভিন্ন কদলীপত্রের শব্দ কানে আসছিলো। গবাক্ষ পথে দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করলো সে। জ্যোৎস্নায় অকর্ষিত ক্ষেত্রসমূহ দেখা যায়, দূরে দূরে আম্রকাননের অন্ধকার। সেই দিকে দেখতে দেখতে দীনদাস এবং শুকদেবের কথাগুলি তার পুনরায় স্মরণ হলো। বৌদ্ধ ভিক্ষুদলের আগমনের পশ্চাতে কি সত্যিই কোনো উদ্দেশ্য আছে? আর বহির্দেশীয় যবন দল? এদের আগমনও কি তাৎপর্যময়? যদি তা-ই হয়, তাহলে সেই তাৎপর্যের ব্যাখ্যা কী?

ঐ সময় গুরু বসুদেবের একটি কথা তার মনে পড়ে। একদা তিনি বলেছিলেন, মিথ্যাচার, পাপাচার অন্য কাউকে ধ্বংস করুক না করুক, নিজ অবলম্বনটিকে প্রথমে ধ্বংস করে। প্রতিমা নির্মাণে গৌড়ীয় রীতির অবলুপ্তি প্রসঙ্গে হঠাৎ কথাটি বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন, তিনিই জানেন। আজ একাকী শয্যায়, বিনিদ্র প্রহরে কথাটি বারবার স্মরণ হলো শ্যামাঙ্গের।

হঠাৎ মনে হয়, গৃহদ্বারে কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে। সে উৎকর্ণ হলো। কটিবন্ধে হস্তস্পর্শ করলো, চোর দস্যু নয় তো?

কিন্তু ক্ষণকাল পরই তার মনে হলো কেউ যেন তাকে ডাকছে। শুনতে পেলো, ভ্রাতঃ আপনি কি নিদ্রাগত?

স্পষ্ট এবং পরিচিত নারী কণ্ঠস্বর। মায়াবতীর কথা স্মরণ হয়। এবং স্মরণ মাত্রই তার মনে এবং দেহে বিচিত্র একটি ভাবের জাগরণ ঘটে। ভাবে, তবে কি পুনর্ভবা তীরের রমণীরা সত্যিই শিথিলশাসনা? এবং স্বাধীন ভর্তৃকা?

সে দ্বার অর্গলমোচন করে দাঁড়ায়—আর মুহূর্তের মধ্যে দু'টি রমণীর ছায়ামূর্তি অন্ধকার কুটিরে প্রবেশ করে।

এ ঘটনায় উল্লসিত না হয়ে ঈষৎ শঙ্কিত হয় সে। এই দূর ভিন্ন দেশে অপরিচিতা নারী কি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে কে জানে। সে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আর তাতেই যেন অস্ফুট অথচ ক্ষুব্ধ স্বর শোনা গেলো। একজন বলছে, চল এখন যাই, উনি হয়তো বিরক্তি বোধ করছেন।

তার কথার উত্তরে মৃদু ভর্ৎসনা উচ্চারিত হয়। মায়াবতী বলে, আহ্ চুপ কর তো তুই—আমার ভ্রাতাকে যদি আমি কিছু বলতে চাই, তাতে তিনি বিরক্ত কেন হতে যাবেন—এতোদূর এসে ফিরে যাবো?

দুই সখীর মধ্যে ঐ প্রকার বাদানুবাদ আরম্ভ হলে শ্যামাঙ্গ আশ্বস্ত বোধ করে। তার স্বরে কৌতুকস্পর্শ পাওয়া যায়। সে বললো, কি সংবাদ মায়াবতী, রাত্রির এই মাধ্যমে হঠাৎ কি প্রয়োজন?

মায়াবতী বারেক ইতস্তত বোধ করে। তারপর বলে, ভ্রাতঃ আমাদের কিছু কথা আছে, সেই কারণে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি—অপরাধ নেবেন না—আপনি তো প্রভাতেই স্বগ্রামাভিমুখে যাত্রা করবেন—সময় হবে না বলেই রাতের এই মধ্যযামে আসতে হলো।

মায়াবতী ক্রমে সহজ হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে, আপনার যাত্রাপথেই আম্রপট্টলী গ্রাম পড়বে। আপনি যদি সেখানে দণ্ড পরিমাণ কাল অবস্থান করে ললিতদাসের পুত্র অভিমন্যু দাসের সংবাদ নেন তো বড় উপকার হয়। বৎসরাধিক কাল হয় সে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে—কিন্তু তারপর আর কোনো সংবাদের আদান-প্রদান নেই। বললেন, তার স্ত্রী লীলাবতী ভারি উদ্বিগ্না। সে যেন সত্বর একবার উজুবটে আসে।

শ্যামাঙ্গ লীলাবতীর ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে নেয় এবং কৌতুক বোধ করে। বলে, এই প্রকার কাজে আমার দক্ষতা কিরূপ তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তবে একটা কথা—

কি কথা? লীলাবতীর আগ্রহী স্বর শোনা যায়।

আপনি বলুন, যদি সুসংবাদ প্রেরণ করতে পারি, তাহলে আমার জন্য কী পুরস্কার আছে?

না, কৌতুক নয় ভ্রাতঃ, মায়াবতী জানায়। বলে, সখী লীলাবতী সত্যিই উদ্বিগ্না। তার পিতা দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়ী।

মায়াবতীর স্বরে বিলক্ষণ আকুলতা ছিলো। শ্যামাঙ্গ সেটা উপলব্ধি করে বলে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, অভিমন্যু দাসের সন্ধান আমি অবশ্যই করবো।

ক্ষণেক পরে সে পুনরায় জানতে চাইলো, তার পূর্বে আমার জানা প্রয়োজন, অভিমন্যু দাস স্বগ্রামে অবস্থান করছেন কিনা। তিনি অন্য কোথাও চলে গেলে তাঁর সন্ধান করা কঠিন হবে।

না, সে সংবাদ এখানে আমরা পাইনি, মায়াবতী জানায়, অতঃপর বলে, তবু আপনি সন্ধান করে দেখবেন—যদি কোথাও গমন করে থাকেন, তাহলে সে সংবাদটিও তো আমাদের জানা প্রয়োজন।

অবশ্যই, শ্যামাঙ্গকে স্বীকার করতে হয়। বলে, আম্রপট্টলীতে নিজের প্রয়োজনেই আমাকে যেতে হবে, যদি অভিমন্যু দাসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁকে আমি উজুবটে নিয়ে আসতে পারবো বলে আশা করি—কারণ আমার মাতুলালয় ঐ গ্রামেই।

ঐ আলাপের ক্ষণকাল পরই মায়াবতী এবং তার সখী চলে গেলো, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো, তেমনি নিঃশব্দেই।

আরও কি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে? শ্যামাঙ্গ নিজের কাছে প্রশ্ন ক'রে কিছুক্ষণ শয্যায় বসে রইলো। বাইরে কদলীপত্রে বায়ু তাড়নার শব্দ তখনও হয়ে চলেছে—এবং দীর্ঘক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন আর কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো না, তখন, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শ্যামাঙ্গ দাস শয্যায় শয়ান হলো। এবার সে নিদ্রা যাবে।

যোগমায়ার শোক আজ পুনরায় জেগে উঠেছিলো। পথিকের মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত করেই তাঁর বক্ষে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। মানুষে মানুষে কি এমনই সাদৃশ্য থাকে?

সেই থেকে যে কতোবার গোপনে অশ্রু মোচন করেছেন গণনা করা যাবে না। আজ চন্দ্রদাস জীবিত থাকলে কি সংসার তাঁর এমন হতশ্রী হয়? একটি পুত্রবধূ গৃহে আনতেন তিনি। মনোহরদাসের কন্যাটির কথা স্মরণ হলে প্রাণ তাঁর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হায় ভগবান, কি কুক্ষণেই না চন্দ্রদাসকে তিনি মেলায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাত্রার

প্রাক্কালে বারে বারেই সে বলছিলো, মা, চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুই পক্ষকাল এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। আমি বস্ত্রগুলি বিক্রয় করে মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করবো, লক্ষণাবতী পর্যন্ত যদি যাই, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা, পক্ষকালের অধিক বিলম্ব হতে পারে।

কী মায়াময় কথা তার! বলেছিলো, মা তোমার বড় পরিশ্রম হয়—আমি ফিরে এলে তোমরা পুত্রবধূ ঘরে এনো। আহা! ঐ কথা ক'টি বলবার সময় ঈষৎ লজ্জা হয়েছিলো বাছার। তারপর বলেছিলো,—পিতাকে ব'লো, চৈত্রের পূর্বেই যেন গৃহ সংস্কারের কার্যাদি সম্পন্ন করে ফেলেন। আর শোনো, কৃষ্ণা গাভীটি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে, যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে ভালো একটি দুগ্ধদা গাভী ক্রয় ক'রো। পিতাকে ব'লো, তিনি যেন কায়স্থ পল্লীর লোকদের সঙ্গে বিবাদে না যান। পথিমধ্যে আমি মাতুলালয়ে যাবো, মাতুলকে বলবো, তিনি যেন এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন।

নানান প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা বলছিলো সে। বড় দায়িত্ববান পুরুষ হয়ে উঠেছিলো বাছা—অথচ কি বা বয়স তার! তবু দেহটি হয়ে উঠেছিলো বলিষ্ঠ এবং মনটি মায়াময়। গৃহাঙ্গন ত্যাগের মুহূর্তে ভগিনীর অশ্রু ভারাক্রান্ত মুখ দেখে তার বেণীটি মুষ্টিবদ্ধ করে বলেছিলো, অরে বান্দরি, তুইও কাঁদছিস? এ যাত্রা আমার শ্মশান যাত্রা নাকি?

হায়, কে জানতো ঐ যাত্রাই তার শ্মশান যাত্রা হয়ে উঠবে!

প্রতিটি কথা তাঁর স্মরণ হচ্ছিলো। শয্যাগ্রহণের পরও তাঁর চক্ষে ঘুম আসেনি। নীরবে অশ্রু মোচন করছিলেন। মায়াবতী পাশে নিদ্রামগ্না। হতভাগিনীর কথা ভেবেও তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। দীর্ঘদিন জামাতা বসন্তদাস এখানে আসে না, কোথায় যে গেছে, কেউ জানে না। শুধু জানা গেছে যে, সে নাকি বাণিজ্যে গেছে। এ দিকে মায়াবতী যেমন চঞ্চলা, কী হয় বলা যায় না।

অকস্মাৎ তাঁর সম্বিৎ হলো যে শয্যায় মায়াবতী নেই। তাঁর মনে কোথায় যেন শঙ্কা দুলে ওঠে—এতো রাতে মায়াবতী শয্যায় নেই কেন? তিনি উঠলেন। কাউকে না ডেকে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরে এলেন। অঙ্গন অতিক্রম করে বহির্বাটির দিকে শ্রবণ পাতলেন। এবং যা আশঙ্কা করছিলেন, অস্পষ্টভাবে, তা-ই ঘটেছে বলে তাঁর সন্দেহ হলো। পথিককে দেখে মায়াবতীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। এখন বুঝলেন, কেন ঐরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো কন্যাটি। মায়াবতীর স্বামী সন্দর্শন মাত্র একবারই হয়েছে। আজ সপ্তম মাস অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে, কিন্তু বসন্তদাসের কোনো সন্ধান নেই। এদিকে পথিক যুবাপুরুষ, তায় সুন্দরকান্তি। না জানি কী আছে তার মনে। নিজের কন্যাটিকে তো চেনেন—এমন চঞ্চল স্বভাব কেন যে ওর হলো, ভেবে পান না। তার পিতাই অত্যধিক স্নেহ দিয়ে কন্যার মস্তকটি চর্বণ করেছেন। অবশেষে তিনি পুনরায় কান পাতলেন। শুনতে পেলেন সত্যিই বহির্বাটির কক্ষ থেকে মায়াবতীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ক্রোধ হলো তাঁর। মায়াবতী আর কিশোরী বালিকাটি নেই। কৈশোরে সে বড় জ্বালাতন করেছে। আহীর পল্লীর তরুণটিকে নিয়ে সে যা আরম্ভ করেছিলো তাতে কলঙ্ক

রটতে বিলম্ব হতো না। সৌভাগ্য যে ভ্রাতা দীনদাস ঐ সময়ই বিবাহের সম্বন্ধটি এনেছিলেন। দূরের সম্বন্ধ, কিন্তু তখন আর বিলম্ব করতে সাহস হয়নি। সানন্দেই বিবাহে সম্মতি দান করেছেন।

আর জামাতাটিও যে কী, যোগমায়া বুঝতে পারেন না। নবীন যুবক—এই সময়ে তার স্ত্রী সান্নিধ্যের আকর্ষণটিই প্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু দেখো, মূর্খ দেশে দেশে বাণিজ্য করে বেড়াচ্ছে। এদিকে বিবাহের পর মায়াবতীর চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, মুখরা হয়েছে আরও অধিক। কিছু বলেন না তিনি। কিন্তু তাই বলে এতো দূর! রাত্রির মধ্যযামে অপরিচিত যুবাপুরুষের কক্ষে প্রবেশ করবে!

যোগমায়া কন্যার আচরণে ক্রুদ্ধা যেমন হলেন, তেমনি আবার ব্যথিতও হলেন।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু করতে গেলেন না। ত্বরিত কিছু করেন না তিনি—সে স্বভাবই তাঁর নয়। বরং অপেক্ষা করলেন। অনতিবিলম্বে লীলাবতীসহ কন্যাকে পথিকের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলেন। লীলাবতীকে দেখে তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস নির্গত হলো। যাক, মেয়ে তাহলে অঘটন কিছু ঘটায়নি।

তখনও কিন্তু মৃদুস্বরে উভয় সখীর মধ্যে বাদানুবাদ চলেছে। মায়াবতী বারবার বলছিলো, অন্যায় তো কিছু করিনি। একজনকে একটি সংবাদ নিতে বলার মধ্যে অন্যায়টা কোথায় হলো? মানুষের সংবাদ মানুষের নেওয়া কর্তব্য।

তুই যেভাবে দেখিস, অন্যে তো বিষয়টা সেভাবে না-ও দেখতে পারে। আমি স্বামী পরিত্যক্তা বলে যদি তাঁর করুণা হয়, তাহলে সেটা কি আমার জন্য লজ্জার বিষয় নয়? বল তুই?

রাখ তোর লজ্জা, ওটা শতবার ধৌত করে জলপান কর গিয়ে। যে লোকের সঙ্গে তোর জীবনে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই, তার কাছে আবার লজ্জা কি রে কুক্কুরি?

না সখী, এ তোর অন্যায় হয়েছে, লীলাবতী বুঝতে চায় না। বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐকথা তোর বলতে যাওয়া উচিত হয়নি।

ঐকথা না বলতে যাবো তো আর কোন কথা বলতে যাবো? মায়াবতী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলে, অরে পামরি, তুই কি ভেবেছিলি আমি তোকে নিয়ে পথিকের সঙ্গে মিলনের জন্য অভিসারে যাবো? আর পথিকের সান্নিধ্যে গেলে প্রণয়লীলা অনুষ্ঠিত হবে?

না, তা নয়, লীলাবতীর স্বর তখনও আহত। বলে, সে কথা ভাবিনি, দূর দেশের পথিক, তার কতো অভিজ্ঞতা, কতো কাহিনী, ঐ সবই কিছু শুনবো বলে আশা করেছিলাম—

এই পর্যন্ত উভয়ের কথা হয়েছে, ঐ সময় যোগমায়া ডাকলেন, মায়াবতী, এদিকে আয়।

দু'জনই চমকিত হলো, কিঞ্চিৎ ভীতও। কিন্তু যোগমায়া কিছু বললেন না। শুধু আদেশ করলেন, লীলাবতী গৃহে যাও, রাত্রি গভীর হয়েছে।

লীলাবতী চলে গেলে কন্যার কাছে জানতে চাইলেন, পথিক কি অভিমন্যু দাসের পরিচিত?

না, কিন্তু আম্রপট্টলীতে তাঁর মাতুলালয়।

যোগমায়া আরও কিছু বলতেন, কিন্তু কে জানে কেন, ঐ প্রসঙ্গে আর গেলেন না। শুধু বললেন, ঐ কথা বলবার জন্য পথিকের কক্ষে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। তোমার মাতুলকে বললেই পারতে, তিনিই বলতেন।

পরদিবস প্রত্যূষে শ্যামাঙ্গ প্রস্তুত, যাত্রা করবে। জলযোগ ইতোমধ্যে সমাপন হয়েছে। আহার্যাদি প্রস্তুত করেছেন মায়াবতীর মাতা অন্ধকার থাকতেই। গতরাতে সঙ্কোচবশ অতিথির সম্মুখবর্তী হননি, আজ হলেন। বললেন, বৎস, তোমার সমাদর হলো না, দু'দিন থেকে গেলে পারতে।

ঐ কথা ক'টি শ্রবণমাত্র কী যেন ঘটে যায় শ্যামাঙ্গের মনে। মহিলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অজানা এক চাঞ্চল্য অনুভব করে সে। কেমন মনে হয়, ঐ চক্ষু দু'টি কোথায় যেন সে দেখেছে—ঐ কণ্ঠস্বরটিও তার চেনা, যেন বহুকাল পর সে ঐ স্বর শুনতে পাচ্ছে। সে কিছু বলতে পারে না। মায়াবতী মায়ের পাশে ছিলো। সেও বললো, দু'দিন থেকে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে আপনার?

ঐ কথার পরও শ্যামাঙ্গের মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না। সে জানে, তার জানানো উচিত, গৃহে প্রত্যাবর্তন তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—নতুবা মাতৃস্নেহধারায় অভিষিক্ত হওয়ার এই অমূল্য সুযোগ সে ছাড়তো না, অল্প সময়ে সে যা পেয়েছে তা তার চিরদিন মনে থাকবে। এ পথে সে যতোবার আসবে, ততোবারই ও মাতৃপদে প্রণামের সুযোগ সে গ্রহণ করবে—এই সব বাক্য তার মনে আসছিলো। তবে এও আবার উপলব্ধি হচ্ছিলো যে ঐ প্রকার বাক্য শোনাবে নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং কৃত্রিম। তাই সে নীরবে কালক্ষেপণ করে। কোন কথাটি যে বলবে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

একেবারে শেষ মুহূর্তটিতেও তার মুখে কথা আসে না। কেবলই মনে হয়, মায়ের কাছে সন্তানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি সাজে? সে আভূমি নত হয়ে যায় এবং যোগমায়ার পদধূলি গ্রহণ করে।

আর ঐ পবিত্র মুহূর্তটিতেই ঈষৎ কম্পিত মাতৃস্নেহের পুণ্য স্পর্শ অনুভব করে সে তার শিরোদেশে। উদ্গত অশ্রুরোধ চেষ্টায় কাতর মায়ের মুখভাবটি দেখবার মতো যথেষ্ট সাহসী সে হতে পারে না। তার কেবলি মনে হতে থাকে যে, আর যদি সে বিলম্ব করে তাহলে সে ভেঙে পড়বে এবং ঐ মাতৃপদকমল দু'টি জড়িয়ে ধরে সমস্ত জীবনকালের মাতৃস্নেহের তৃষ্ণা সে মিটিয়ে নেবে। তাই সে অত্যন্ত দ্রুত, প্রায় সজোরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মতই, গৃহদ্বার থেকে ছুটে পথে বেরিয়ে আসে এবং যথাসম্ভব দ্রুত পদচালনা করতে থাকে। না, বড় মায়া পশ্চাতে। পুনর্ভবা তীরের মাতৃময়ী নারীর স্নেহ স্পর্শ তাকে যেন উদ্বাহু হয়ে ডাকছে। বাল্যকালে সে মাকে হারিয়েছে, সেই অবিকল মাকে সে আবার দেখতে পাবে—এ যে কল্পনাও করা যায় না। অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পর সে

পশ্চাতে মুখ ফেরালো। এবং তখনও দেখতে পেলো, তারই গমন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে অনিমেষ নয়নে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুই নারী। একজন মাতা, অন্যজন ভগিনী। দু'জনার স্নেহোদ্বেল চোখে মঙ্গল কামনার উদ্ভাস। শ্যামাঙ্গকে মুহূর্তেক দাঁড়াতে হলো— আর তাতে চিত্রটি তার অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেলো। দূরযাত্রায় নিষ্ক্রান্ত ভ্রাতা ও পুত্রকে এইভাবেই চিরকাল মাতা ও ভগিনীরা বিদায় জানিয়েছে। তার মনে পড়লো, ঠিক এই চিত্রটিই সে সোমপুর বিহারে প্রাচীর গাত্রের মৃৎফলকে উৎকীর্ণ দেখেছে। দ্বারদেশে দুই নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে, দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। সে তখন বোঝেনি, শিল্পী কোন বিষয় ঐ ফলকে উৎকীর্ণ করেছেন—এখন বুঝলো, মনে মনে সেই প্রাচীন শিল্পীকে সে প্রণাম জানালো।

গ্রাম এখনও কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠেনি। সূর্যোদয়ের এখনও কিছু দেরি, বাতাসে ঈষৎ শৈত্যভাব। কোথাও কোথাও গবাদি পশু গোশালা থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে পেছনে কিশোর রক্ষপাল।

পথের দু'ধারে আম্রবৃক্ষ, নবাম্রভারে কোনো কোনো শাখা আভূমি বিনত। পনসবৃক্ষের কাণ্ডগুলি ফলপিণ্ডে আকীর্ণ। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে গ্রাম সংলগ্ন কাননে প্রবেশ করলো। মনে হলো, কুসুমিত মধুক বৃক্ষবীথির সুগন্ধ তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মধুপ গুঞ্জরণের ধ্বনিও শ্রবণে এলো। একটি কুক্কুরকে ভূমিলগ্ন মস্তকে ইতস্তত ভ্রমণ করতে দেখে সে অবাক হয়। কুক্কুরও কি মধুক পুষ্প ভক্ষণ করে? কিন্তু অচিরেই সন্দেহ নিরসন হয়। ওটি কুক্কুর নয়—নিতান্তই শৃগাল। সে ভূমি থেকে লোষ্ট্রখণ্ড হাতে নিয়ে শৃগাল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে।

আর তখনই একটি হাসির শব্দ তাকে সচকিত করে দেয়। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতেই দেখে, লীলাবতী অঞ্চল মুখলগ্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। সে বিব্রত বোধ করে—লোষ্ট্র নিক্ষেপের ঐ বালসুলভ কাণ্ডটি না করলেও পারতো। লীলাবতী নিশ্চয়ই তাকে বালকের মতো চপল-স্বভাব বলে ধারণা করছে। চোখে চোখ পড়লে তাকে হাসতে হলো। বললো, এতো প্রত্যূষে এখানে আপনি?

আমার মেষ শাবকটির সন্ধানে এসেছি, লীলাবতী জানায়। বলে, আর বলবেন না, এই মাতৃহীন শাবকটি বড় জ্বালাতন করে—তা আপনি কি যাত্রা করলেন?

হ্যাঁ, আজ বহুদিন আমি গৃহত্যাগী, গৃহে প্রয়োজনীয় কর্মাদি রয়েছে।

বিগত রাত্রির কথা স্মরণ হওয়ায় শ্যামাঙ্গ পুনরায় বলে, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আম্রপট্টলীতে নিশ্চয়ই যাবো।

তার ঐ কথায় কী ছিলো ঈশ্বর জানেন, লীলাবতীর হাস্যালোকিত আননে যেন ছায়া পড়ে একটি—কুঞ্চিত হতে দেখা গেলো তার ভ্রূযুগল। মুখের ঐ ভাব গোপন না করেই সে বললো, গত রাত্রির কথা স্মরণ রেখেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু একটা কথা জানবেন, গত রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহাতিশয্য ছিলো মায়াবতীর, আমার নয়, যা শুনেছেন, ঐসব কথাও আমার নয়।

আপনার নয়? শ্যামাঙ্গ হতচকিত বোধ করে—এ কী কথা শুনছে সে পুনর্ভবা তীরের প্রোষিতভর্তৃকা এই যুবতীর মুখে?

আমাকে দেখলে কি মনে হয় আমি বিরহ কাতরা?

শ্যামাঙ্গ প্রমাদ গণনা করে, সত্যিই তো, প্রোষিতভর্তৃকা বিরহ কাতরা রমণীর বেশবাস ও আচরণ কি এই প্রকার হয় কখনও?

সে প্রশ্ন না করে পারে না। বলে, আপনার স্বামীকে কিছুই জানাবার নেই আপনার?

না, আমার নিজের কিছুই জানাবার নেই। লীলাবতী বলে, শুধু জানাবেন, আমার পিতা রুগ্ন হয়ে পড়েছেন, তিনি জামাতাকে একবার দেখতে চান।

শ্যামাঙ্গের প্রত্যয় হয় না। লীলাবতীর কথার অর্থ সম্যক বোঝা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে ভালো করে দেখে, সোমপুরের মঞ্জুশ্রী মন্দিরে দেখা পীবরস্তনী যক্ষিণী মূর্তিটি যেন সে দেখতে পাচ্ছে চোখের সম্মুখে। হ্যাঁ, ঐ প্রস্তর মূর্তিটির মতোই ঋজু শান্ত এবং কঠিন। সে মুখপানে চেয়ে বিভ্রান্ত বোধ করে। কিছু বলতে পারে না। যত্নে আঁকা, সীমান্তের ঐ উজ্জ্বল সিন্দুর রেখাটি তাহলে কেন? যদি সে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্না না হবে?

লীলাবতী অপ্রতিভ হয় না। পথিকের ঐ প্রকার বিমুগ্ধ দৃষ্টি তাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে না। সে স্থির দৃষ্টিতে শ্যামাঙ্গের মুখপানে চেয়ে থাকে। শ্যামাঙ্গকে তখন বলতে হয়, আমি পথিক মাত্র, পারিবারিক জটিল বিষয়াদি আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু তবু বলছি, কোনো বার্তা থাকলে আপনি অসংকোচে আমাকে বলতে পারেন, আমি যথাস্থানে তা পৌঁছে দেবো।

লীলাবতীর ভাবান্তর হয় না ঐ কথার পরও। তখন শ্যামাঙ্গ আবার বলে, আপনার সংকোচের কোনো কারণ নেই, এ আমার নিজের দায়—যে গ্রামে রাত্রিযাপন করেছি, অন্ন গ্রহণ করেছি, সেই গ্রামের লোকের সামান্যতম উপকারে আসতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

শ্যামাঙ্গের কথায় অকৃত্রিমতা ছিলো। আর সেই জন্যই সম্ভবত লীলাবতীর দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে হাসির রেখা খেলে গেলো। বললো, অহেতুক এতো কথা বলছেন, এই মূর্খা গ্রাম্য রমণী আপনার ভাষা কিছুই বুঝছে না, আপনি নির্দ্বিধায় যাত্রা করুন—প্রেরণ করার মতো সত্যিই আমার নিজের কোনো বার্তা নেই।

শ্যামাঙ্গকে সপ্রতিভ হতে হয়। বলে, আপনার রোষ দেখছি গভীর—বোঝা যাচ্ছে, হতভাগ্য অভিমন্যু দাসের জন্য ভবিষ্যতে মহাদুর্বিপাক অপেক্ষা করছে।

কেন, এমন কথা কেন বলছেন?

কুপিতা স্ত্রী ভয়ঙ্কর বস্তু, শ্যামাঙ্গ জানায়।

ও, তাহলে ঐ কারণেই আপনি গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অস্থির? লীলাবতীর স্বরে পুনরায় কৌতুক ধ্বনিত হয়।

আমি কোন ছার, দেবাদিদেব মহাদেব পর্যন্ত তটস্থ থাকেন।

শিব ঠাকুরের ঐ ভয় কিন্তু কপট ভয়, লীলাবতী স্মরণ করিয়ে দেয়।

কপট ভয়? শ্যামাঙ্গ বলে, সম্মার্জনী হস্তে দেবীর চামুণ্ডা মূর্তি কল্পনা করুন তো!

দেবীর মূর্তি যাই হোক, শিব তো জানেন, মানভঞ্জনের কলাকৌশল কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়। শিবের পথ অনুসরণ করুন—গৃহলক্ষ্মীর পদসেবা কেমন করে করতে হয় জানেন তো?

না, তা তো অধমের জানা নেই, মুখে নির্বোধের ভাব আনে শ্যামাঙ্গ।

তাহলে তো দেখছি, আপনার ললাটে সম্মার্জনী প্রায় অবধারিত।

উপায় কি! শ্যামাঙ্গ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, অনুশীলনীর জন্যও তো পদযুগল প্রয়োজন—তা কোথায় পাবো?

কেন, গৃহলক্ষ্মী কি গৃহে নেই আপনার? লীলাবতী বিস্ময় মানে।

যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতাই হলেন না গৃহে, তাঁকে গৃহলক্ষ্মী কেমন করে বলি।

লীলাবতীর কৌতুক অন্তর্হিত হয়। সে ভেবে পায় না, এই সুপুরুষ কান্তিমান যুবক কেন এখনও অবিবাহিত। সে অধিকতর কৌতূহলী হলো, বললো, আত্রেয়ী তীরের গ্রামগুলিতে রমণী যথার্থই কি মহার্ঘ?

শ্যামাঙ্গ দেখছিলো, সূর্যোদয় হয়েছে—তার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। মনে হলো, এই বাক্য ব্যয় অহেতুক। প্রত্যূষের এই বিজন কানন পথে লীলাবতীর মতো যুবতী রমণী যতোই আকর্ষণীয়া হোক, চৈত্র দ্বিপ্রহরের মার্তণ্ড প্রতাপ তার চেয়েও অধিক সর্বগ্রাসী। সে বললো, ভদ্রে, অনুমতি করুন, যাত্রারম্ভ করি—বিলম্ব হলে পথে কষ্ট হবে, আমি আবার আসবো, তখন কথা হবে।

লীলাবতী গম্ভীর হয়। কিন্তু সরে যায় না। শুধু বলে, বিদায়কালে মিথ্যা ভাষণ করতে নেই।

মিথ্যা ভাষণ? শ্যামাঙ্গের এবার বিলক্ষণ উষ্মা হয়। বলে, কোথায় দেখলেন যে আমি মিথ্যা ভাষণ করেছি?

মিথ্যা নয়? বলুন, কোন প্রয়োজনে আবার আপনি এ পথে আসবেন?

লীলাবতীর দু'চোখে এবং কণ্ঠস্বরে বিচিত্র একটি ভাব তখন জেগে উঠেছে। দেখে শ্যামাঙ্গের মনে হলো, সম্মুখের এই যুবতী রমণী অহেতুক তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে নেই। যদি আরও বিলম্ব করে, তাহলে অন্য কিছু একটা ঘটে যাবে।

সে বললো, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চান না, কিন্তু আমার কথা শুনে রাখুন, যাত্রাকালে আমি মিথ্যা ভাষণ করবো না। আমার গুরু বসুদেব বিল্বমূল গ্রামে রয়েছেন—তাঁর সঙ্গে আমার বাদানুবাদ হলেও তাঁর কাছে আমাকে যেতেই হবে—আর দ্বিতীয় কথাটি এই যে, আমি বাল্যকাল থেকে মাতৃহীন, আপনাদের গ্রামে আমার মা'কে খুঁজে পেয়েছি, কথাটা মায়াবতী জানে না, তার জননীও জানেন না। ওই মাতৃমুখ দর্শনের জন্য আপনাদের গ্রামে সত্যিই আমি আবার আসবো।

লীলাবতীর মুখের কুঞ্চিত ভ্রূ সরল হয়, ওষ্ঠের কোণে হাসির রেখাটি দেখা যায়। বলে, চপল স্বভাব বালিকার মতো অনেক কথা বলে ফেলেছি, মনে কিছু নেবেন না—তবে যদি

কখনও এ পথে আসেন, তাহলে সেই ভবিষ্যতের জন্য উজুবট গ্রাম পূর্বাহ্ণেই আপনাকে স্বাগত জানিয়ে রাখলো, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।

লীলাবতী চলে গেলে, পথ অতিক্রম করতে করতে শ্যামাঙ্গের মনে নানান চিন্তার উদয় হয়। সমস্তই লীলাবতী প্রসঙ্গ। বারবার মনে হলো, ঐ যুবতী দুর্বোধ্য বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি। বারবার তার ঐ শ্লোকটির কথা মনে হলো, যাতে বলা হয়েছে যে, দেবতারাও স্ত্রী চরিত্র বিষয়ে অজ্ঞ। তার অনুমান হলো সম্ভবত লীলাবতীর মতো নারীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো বলেই শ্লোককার শ্লোকটি রচনা করেছেন।

লীলাবতী গৃহে প্রত্যাগমনকালে নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছিলো। বলছিলো, ছি ছি দগ্ধমুখি, তোর লজ্জা হলো না, এতো কথা বলতে গেলি কেন? তুই না গতকালের ধারণা নিরসন করতে এসেছিলি? এ যে গতকালের চাইতেও অধিক হয়ে গেলো—তোর যে অনেক কিছু জেনে গেলো লোকটা। ছি ছি—

তার মেষ শাবকটিকে ঐ সময় সে দেখলো, দূরে একটি গোধুম ক্ষেত্রে বিচরণে ব্যস্ত। তার ইচ্ছে হলো না যে, শাবকটিকে গিয়ে ধরে। বরং তার মনে হলো, পিতা হয়তো এতোক্ষণে জেগে উঠে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন। সে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখী হলো। পথিমধ্যে হঠাৎ এক কোকিল চিৎকার করে উঠলে সে গালি দিলো, দগ্ধমুখ, তোর মরণ হয় না! মধুক বৃক্ষ তলে দেখলো, একটি প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে এসে তার উচ্চ করবীতে বসতে চাইছে—সে ছি ছি করে উঠলো পুনরায়—ধিক তোকে, আমার কাছে কেন, চক্ষুর মস্তকটি কি ভক্ষণ করে বসে আছিস? অন্ধ কোথাকার, যে লোকটি আত্রেয়ী তীরাভিমুখে চলেছে, তাকে দেখিতে পাসনি?

গৃহে উপনীত হয়ে দেখে, পিতা সত্যিই জাগরিত হয়েছেন, তবে চিৎকার করছেন না। সে অবাক হলো। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে দেখে, একটি লোক পিতার শয্যাপার্শ্বে বসে আছেন এবং পিতা তাঁকে নিজ দুর্দশার কথা বলে যাচ্ছেন।

সে বাধা দিলো না, এটা আজকাল অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অপরিচয়-পরিচয় নির্বিশেষে পিতা এই কাজটি আজকাল করেন।

আগন্তুক শ্মশ্রুধারী, প্রৌঢ়। তাঁর হাতের যষ্টিটি বঙ্কিম, সম্ভবত হেমতালের। গ্রীবায় প্রস্তরখণ্ডাবলীর মালা, পরিধেয় অত্যন্ত অপরিষ্কার, কাছে গেলে এক প্রকার দুর্গন্ধ ঘ্রাণে আসে। লীলাবতী ভাবছিলো, লোকটিকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু হঠাৎ শুনলো, লোকটি ডাকছে, মা লীলা, এদিকে এসো।

নিকটে গেলে পিতা বললেন, ইনি তোমার মাতুল, যোগব্রত নিয়েছেন—সংসারে থাকেন না, এঁকে প্রণাম করো।

লীলা প্রণাম করলে বললেন, ভ্রাতঃ, একে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দাও—অনেক দিন তো রইলো তোমার কাছে। হরকান্ত পরমকুটুম্বের পরামর্শ শুনে কিছু বললেন না। লীলা গৃহকর্ম দেখবার জন্য বাইরে গেলো।

যোগী সিদ্ধপা এক সময় পুনরায় বললেন, ভ্রাতঃ, দিনকাল ভালো নয়—যুবতী মেয়েরা ক্রমেই অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ছে—তোমার সৌভাগ্য যে রাজপুরুষদের দৃষ্টি তোমার কন্যাটির উপর পড়েনি।

আগন্তুক হরকান্তকে পূর্বদেশের, পশ্চিমদেশের, দক্ষিণদেশের নানান কথা জানালেন। যেমন পূর্বদেশে পুনরায় সদ্ধর্মীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে—পশ্চিমে রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত, ভয়ানক যবন জাতি শনৈঃ শনৈঃ পূর্বে অগ্রসর হচ্ছে—কখন কী হয়, বলা যায় না। এমত শোনা যায় যে, এই যবন রাজ মূর্তিমান যম একেবারে। খর্বদেহ, কিন্তু বাহু দু'টি যেন ভূমিস্পর্শ করে। শ্মশ্রুকেশ উভয়ই ঘন, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ—এবং যখন নিজ ভাষায় 'ইয়া আলী' বলে হুঙ্কার দেয়, তখন মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হাতের অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সৈনিক পুরুষেরা উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে।

যোগী সিদ্ধপা দক্ষিণদেশের কথা বিশেষ বলতে চাইলেন না। শুধু বললেন, ভ্রাতা হরকান্ত—তোমাকে কি বলবো—মাতা বসুমতী পাপের ভার দীর্ঘকাল বহন করতে পারেন না। যা অবশ্যম্ভাবী, তাই হবে। পরম ভট্টারক মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের মুষ্টির বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি—কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। তাঁর পতন কেবল সময়ের প্রশ্ন।

হরকান্ত যোগী সিদ্ধপাকে দেখছিলেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব হলেও চক্ষু দুটি স্মরণ করতে পারেন। একদা ক্ষেত্রজীবী গৃহস্থ ছিলো এই যোগী পুরুষ। একমাত্র সন্তান পুত্রটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। পুত্রটি কায়স্থ পল্লীতে খেলতে যেতো—এবং ঐ সময়ই কায়স্থ পল্লীর বালকেরা তাকে বর্ষায় স্ফীত পুনর্ভবার প্রবল স্রোতে নিক্ষেপ করে।

ঐ ঘটনায় দীননাথ উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়, স্ত্রী কমলা উন্মাদিনী হয়ে পুনর্ভবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—নাহ, সেই ঘটনা স্মরণ করতেও প্রাণ শিহরিত হয়। হরকান্তের রুগ্ন দেহে সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি এতোকাল পর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তাঁর অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলো। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট আরম্ভ হলো।

সিদ্ধপা নিজ ভগিনীপতিটির অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। বড় অসহায় অবস্থা এখন হরকান্তের। যদি তার মতো মুক্ত পুরুষ হতে পারতো তাহলে বেঁচে যেতো। কিন্তু তার যে আবার একটি কন্যা রয়েছে। সংসার তাকে ছাড়ে না, সে বেচারার উপায় কি? যদি সমস্ত কিছু ত্যাগ করে একবার বেরিয়ে আসতে পারতো হরকান্ত, তাহলে আর রোগ শোকে সে এমন বিকল হতো না।

সিদ্ধপা এক দিবস অবস্থান করলেন হরকান্তের গৃহে। এখান থেকে তিনি প্রথমে দক্ষিণে তারপর পূর্বে যাবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি আম্রপট্টলী গ্রামে যাবেন এবং জামাতার সন্ধান করবেন—তবে একটা কথা—সিদ্ধপা ভগিনীপতিকে পরামর্শ দেন, যদি সংবাদ পাওয়া যায় যে অভিমন্যু দাস স্বগ্রামেই অবস্থান করছে, তাহলে আর অপেক্ষায় না থেকে লীলাবতীকে সেখানে প্রেরণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

লীলা দ্বারান্তরাল থেকে মাতুলের উপদেশ শুনে মন্তব্য করলো, হুঃ মাতুল বললেই হলো, আসুক দেখি, কে আসছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য?

তার সেই অপমান কেমন করে ভুলবে! কুসুম শয্যার রাত্রে লোকটা তার মুখ দু'হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে কেবলি বলছিলো, আমার বিশ্বাস হয় না—আমার বিশ্বাস হয় না।

অতি মৃদুস্বরে সে জানতে চেয়েছিলো, কি বিশ্বাস হয় না আপনার?

উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়েছিলো অভিমন্যু—আর বলেছিলো, বিবাহে বিশ্বাস হয় না, নারীতে বিশ্বাস হয় না, তোমাকে বিশ্বাস হয় না।

নববধূ স্বামীর মুখপানে চেয়ে ওষ্ঠদংশন করে মাত্র—অবগুণ্ঠন যেমন ছিলো তেমনি থেকে যায়। তার কিছুই করার থাকে না। ঐ লোকটি, যাকে সে মাত্রই এক দিবসকাল পূর্ব থেকে জেনেছে স্বামী ব'লে, সে তার মুখপানে কী দেখে ঈশ্বর জানেন। অভিমন্যু কি উন্মাদ? লীলাবতীর সন্দেহ হয়। বাইরে তখনও সম্পর্কিতা আত্মীয়া রমণী ও বালিকারা কলহাস্যে মত্ত, আকাশে হেমন্তের জ্যোৎস্না। লীলাবতীর দুই চক্ষু অশ্রুময় হতে আরম্ভ করে। অভিমন্যু যখন তার কঞ্চুলিকার গ্রন্থিমোচন করতে যায় তখন সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকিত হয়ে বলে—না। যখন অভিমন্যু আলিঙ্গনের জন্য ব্যগ্র দু'বাহু প্রসারিত করতে চায়, তখনও সে না বলে। এবং শেষে যখন নীবিবন্ধ স্পর্শ করে অভিমন্যু, তখন লীলাবতী চিৎকার করে ওঠে।

কেন, কেন? বিভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টি এবং স্খলিত কণ্ঠস্বর অভিমন্যুর। সে তখনও জানতে চায়, তাহলে আমার অনুমান সত্য—বলো? প্রথমে সেই ব্রাহ্মণ কিশোরটি, তাই না? সেই উপবীতধারী তরুণ গৌরোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ বালক তাই না? অতঃপর পিতার প্রভুপুত্রটি তাই না? নাকি প্রতিবেশী কেউ?

লীলার আর সন্দেহ থাকে না। বদ্ধ এক উন্মাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাকে তার পিতা। এর চেয়ে যে মরণ ছিলো ভালো। সে স্বামীর প্রলাপ শুনছিলো এবং প্রতি প্রশ্নের উত্তরে বলছিলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যতোবার প্রশ্ন ততোবার হ্যাঁ। অভিমন্যু দাস হা-হতোস্মি, আমার ভাগ্যে এই ছিলো, ব'লে শয্যায় পতিত হয়। ঐভাবেই তার অতিক্রান্ত হয়ে যায় কুসুম শয্যার রাত্রিটি।

লীলা আবিষ্কার করেছে, পরে। অদ্ভুত এক জটিল মানসিক অবস্থা অভিমন্যু দাসের। তার একটি কিশোরী ভগিনী ছিলো। সেই ভগিনীটি ছিলো এক ব্রাহ্মণ কিশোরের খেলার সঙ্গী—তাকে একদিন এক কায়স্থ যুবক অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে সে ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনও করে। এক প্রৌঢ়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী হয়ে সে ভগিনীটি এখন তিন সন্তানের জননী।

কারও কোনো ক্ষতি হয়নি, শুধু অভিমন্যুর এই মানসিক জটিলতাটুকু ছাড়া।

তুমি গবাক্ষ পাশে কেন দাঁড়িয়েছিলে, বলো, কি দেখছিলে? পুষ্পবতীর স্বামী ভীমনাথকে? তোমার তাকে ভালো লাগে? তার সান্নিধ্যে যেতে চাও? সত্যি করে বলো, তুমি যা চাও, তাই হবে।

লীলাবতী দ্বার রুদ্ধ করে, গবাক্ষ রুদ্ধ করে, নিজেকে অন্ধকারে গোপন রাখে—তবু উন্মাদের সন্দেহ। একেকদিন শরীর নিরাভরণ করে কখনও স্তনে অঙ্গুলি নির্দেশ করতো, এটি কে প্রথম মর্দন করেছে বলো, সেই ব্রাহ্মণ কিশোর, নাকি কোনো কায়স্থ লম্পট, নাকি তোমার প্রতিবেশীদের কেউ? কখনও আবার উরুদেশে হাত রেখে জানতে চাইতো, লীলা, এখানে কেন নখরাঘাতের চিহ্ন নেই? সেই ব্রাহ্মণ কিশোর কি নখর রাখতো না?

অবশেষে লীলাবতী পিতৃগৃহে এলো। এবং সেই যে এলো তারপর বৎসরাধিককাল হতে চললো। অভিমন্যুর কোনো সংবাদ নেই।

লীলাবতী মাতুলের সব কথাই শুনেছে। রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পর্কে তার ধারণা নেই, যুদ্ধ কাকে বলে তাও সে কল্পনা করতে পারে না। তবে আসন্ন কোনো বিপদের আশঙ্কা যে তার মাতুল করছে, সেটা সে বুঝতে পারে এবং সে জন্য তার যে স্বামীগৃহে অবস্থান করা উচিত, সেটা বুঝতেও তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু এইখানেই তার বিদ্রোহ। প্রলয় যখন হবে তখন কে বাঁচবে, কে মরবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। বাঁচবো বলে কৌশল অবলম্বন করলেই যে বাঁচা যাবে, তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং ও চেষ্টা কেন? সে স্থির করে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করে সে কোথাও যাবে না।

শ্যামাঙ্গ নবগ্রাম হাটে যখন উপনীত হলো তখন চৈত্রের প্রখর পশ্চিমা বাতাস এবং রৌদ্রতাপ তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। হাটের মধ্যস্থলে প্রাচীন একটি বটবৃক্ষ এবং বৃক্ষতলে বিপণী। সে ছায়াতলে ক্ষণেক বসলো। অদূরে দীর্ঘিকা—কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল তাকে স্নিগ্ধ আহ্বান করতে থাকলে সে তীরে নেমে যেতে বাধ্য হলো।

জল অতিশয় শীতল, হস্তমুখ প্রক্ষালন শেষে আকণ্ঠ জলপান ক'রে সে বৃক্ষতলে আবার এসে বসলো। অবাক লাগছিলো তার, হাট এমন পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে কেন? নাকি আজ হাটবার নয়? সে বামে দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করে। জনসমাগম নেই, গো-মহিষের শকটাদি থাকার কথা—একখানি শকটও তার দৃষ্টিপথে আসে না।

ঐ সময় বৃক্ষতলের বিপণীকার, ব্যবসায়ের আশায়, নাকি নিতান্তই সৌজন্যবশে, বলা কঠিন, অতীব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কাছে এসে বসলো এবং জানতে চাইলো, মহাশয় কি দূরে যাবেন?

শ্যামাঙ্গ প্রীত বোধ করে বিপণীকারের ঐ স্নিগ্ধ সম্বোধনে। সে তার গন্তব্যের কথা জানায়। তারপর জানতে চায়, বিপণীতে আহার্য বস্তু কী আছে। শ্যামাঙ্গের ক্লান্ত মুখ দেখে বিপণীকার দ্রুত হস্তে একটি পদ্মপত্র এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বসুন, আমি ফলাহারের ব্যবস্থা করছি।

ফলাহারটি সত্যিই উপাদেয়। সুগন্ধী এবং কোমল চিপিটক, প্রগাঢ় দধি, তৎসহ খণ্ড-মিষ্টান্ন এবং স্ফীতাঙ্গ, প্রায় বর্তুলাকার, হরিদ্রাভ কদলী। পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার সমাপ্ত করে আচমন শেষে যখন বিপণীকারের কুশাসনটি বিস্তৃত করেছে, বাসনা, ক্ষণকালের জন্য লম্বমান হবে—ঐ সময়ই বিপণীকার বিশ্রম্ভালাপের জন্য কাছে এসে বসলো। হাতে করে নিয়ে এসেছে পর্ণ ও গুবাক।

শয়ন আর হলো না। শ্যামাঙ্গ উঠে বসলো। বুঝলো, লোকটি আলাপপ্রিয়। বিপণীকার জানতে চাইলো, নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, বিল্বমূল গ্রাম থেকে আসছি, বিল্বমূল গ্রাম কি এই স্থান থেকে অধিক দূর?

বিপণীকার হাসে, মহাশয়ের দূরত্ব জ্ঞান দেখছি প্রবল।

কেন? শ্যামাঙ্গ ঈষৎ বিব্রত বোধ করে।

বিল্বমূল কি এখানে? বিপণীকার জানায় এই নবগ্রাম হাটে বিল্বমূল গ্রামের বণিকেরা আসে—ওখানে নাকি একটি মন্দির নির্মিত হচ্ছে—ঐ বণিকেরাই বলে, শকট বাহনে গেলে বিল্বমূল এক দিন এক রাত্রির পথ।

আচ্ছা, হঠাৎ বিপণীকারের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়। নিম্নস্বরে, প্রায় অস্ফুটে, বলে, আপনি পিপ্পলী হাটের সংবাদ কিছু জানেন? কিছু শুনেছেন?

না তো, শ্যামাঙ্গ মস্তক হেলন করে। বলে, না, তেমন কোনো সংবাদ আমার কাছে আসেনি। আমি কোনো সংবাদ জানি না—আপনি কিছু শুনেছেন?

না, আমিও কিছু শুনিনি, বিপণীকার জানায়, তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে ওখানে কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। উঠুন, একটি দৃশ্য দেখাবো আপনাকে—এই ব'লে সে শ্যামাঙ্গের হাত ধ'রে তার বিপণীর পশ্চাতে নিয়ে গেলো এবং বটমূলের অন্তরাল থেকে দেখালো, ঐ দেখুন।

শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করে। দেখবার মতোই একখানি দৃশ্য বটে। অদূরেই অতিথিশালা এবং কূপ, কয়েকটি আম্রবৃক্ষও রয়েছে ইতস্তত। সমস্ত স্থানব্যাপী বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম—কেউ ব'সে, কেউ অর্ধ-শয়ান, কেউ, কৌতুক-ক্রীড়ায় রত। কয়েকজন শস্ত্রধারী পুরুষকে দেখে মনে হয় তারা প্রহরায় রয়েছে। প্রায় সকলের পরিধানেই বীরধটিকা, হস্তে শূল, কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি। অল্প কিছু দূরে নবীন একটি অশ্বত্থতলে আরও একটি দল। বোঝা যায় তারা ধানুকী। ধনুকগুলি বৃক্ষকাণ্ডে একত্রে রক্ষিত, ক্ষুদ্র শরাসন ও তূণীরগুলি বৃক্ষ শাখায় লগ্ন অবস্থায় দুলছে।

দৃশ্যটি দেখে শ্যামাঙ্গ মন্তব্য করে, কোনো সামন্তপতি নিশ্চয়ই।

না, তবে মনে হয়, প্রকৃত রাজপাদোপজীবী কেউ—নতুবা এমন কেন হবে বলুন? ঐ যে, ধ্বজা আর পতাকা, দেখতে পাচ্ছেন?

কিন্তু এখন কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে এমন তো শুনিনি, শ্যামাঙ্গ মন্তব্য করে। বলে, তবে কি দস্যু দমনের জন্য এই অভিযান?

হ্যাঁ, কী যে বলেন, বিপণীকারের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়। বলে, এরা করবে দস্যুদমন! কাক কি স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করে? বলুন?

ক্ষণকাল পরে বিপণীকার নিম্নস্বরে জানায়, একজন বলছিলো এরা নাকি পিপ্পলী হাটে যাচ্ছে—সেখানে নাকি চণ্ডালেরা দ্রোহ উত্থাপন করেছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি, তাই আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আপনি কিছু জানেন কিনা। অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে সংবাদটা, কেন জানেন? দ্রোহকারী নাকি পুরুষ নয়, চণ্ডালদের রমণীরা এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে—এ কি বিশ্বাস করা যায়? আপনিই বলুন?

শ্যামাঙ্গের মস্তিষ্কে উত্তেজনাকর সংবাদ প্রবেশ করতে চায় না। সে বুঝতে পারছে—সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণেই এখানে হাট বসেনি। সেই কারণেই গো-মহিষের শকটাদিও আসেনি। এখন সে কীভাবে স্বগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করবে, সেটাই সমস্যা। সে বললো, হাটে কি কেউ আসেনি? দূরের বণিকেরা?

বিপণীকার হাসে, মহাশয় অবোধের মতো প্রশ্ন করছেন। এরা গতকাল কয়েকটি শকটের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করেছে—তারপর আর কে আসবে হাটে, বলুন? সবাই প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছে। আপনাকে পদব্রজেই যেতে হবে—তবে বিল্বমূলেই প্রত্যাগমন করা বোধ হয় আপনার জন্য মঙ্গল। শোনা যাচ্ছে, এদের পশ্চাতে আরও একটি বাহিনী আসছে, পথিমধ্যে আপনি তাদেরও সাক্ষাৎ পেয়ে যেতে পারেন। এরা তো মানুষ নয়, কখন কি করে কিছুই স্থির নয়।

বিপণীকারের ভ্রূতে কুঞ্চনরেখা। সেখানে কখনও বিরক্তি প্রতিফলিত হচ্ছে, কখনও ঘৃণা। বললো, এদের আসবপানের আগ্রহ দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। মনে হবে না যে এরা জলপান করতে জানে। ডোমপল্লীর কাছাকাছি প্রয়োজনেও কেউ যেতে পারছে না। বৃদ্ধ, যুবক এবং শিশুরা নিকটস্থ বনে আশ্রয় নিয়েছে। ঐ অতিথিশালার নিকটে গেলে আর চক্ষু মেলে রাখতে পারবেন না। শূকরপুত্রদের ঐ সমস্ত আচরণ চক্ষু মেলে দেখা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। দলপতিটি সর্বক্ষণ রক্তনেত্র। গতকাল থেকে দুটি যুবতী ডোমনী নির্বস্ত্র হয়ে তার অঙ্গ সংবাহন করে চলেছে—আর গবাক্ষ পথে সাধারণ সৈন্যরা ঐ দৃশ্য উল্লাস ভরে চেয়ে চেয়ে দেখছে, একেবারেই নরকের কীট!

বিপণীকার উত্তেজিত হয়ে উঠলো বর্ণনা করতে করতে। ক্ষুব্ধস্বরে এক সময় বললো, এই পাপাচার কি সহ্য করা যায়, বলুন? আপনি কি কদাচ শুনেছেন যে রাজপুরুষেরা এইরূপ কদাচারে নিমজ্জিত থাকে?

শ্যামাঙ্গ উত্তেজিত হয় না। শুধু সে কেন, অনেকেই শুনেছে, রাজপুরুষদের বিলাসী আচরণের নানান কাহিনী। রাজপুরুষ কিংবা তাদের অনুচরদের এইরূপই তো এখন আচরণ। তার মনে পড়ে, লক্ষ্মণাবতীর এক শিল্পী রাজপুরুষদের বহু প্রকার কাহিনী বর্ণনা

করেছিলো। সামন্ত ও মহাসামন্তেরা নাকি রাজকার্য ব্যপদেশে রাজধানীতে গমন করলে নগর নটিনীর গৃহে অষ্টপ্রহর যাপন করে এবং কদাচ জলপান করে না।

শ্যামাঙ্গের ঐ সময় বৎস রাজা উদয়নের কাহিনীটি স্মরণ হয়। রমণী সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে বলে প্রজাদের রাজদর্শনের সুযোগটুকু পর্যন্ত তিনি দিতেন না। গবাক্ষপথে একটি পদাঙ্গুলি শুধু উত্তোলন করতেন আর তাই দর্শন করে প্রজাদের তুষ্ট থাকতে হতো। শ্যামাঙ্গ বিপণীকারের কাছে কাহিনীটি বললো না। শুধু ক্ষুদ্র মন্তব্য করলো, পিপ্পলী গ্রামের অধিবাসীদের দেখছি ঘোর বিপদ সমাসন্ন। ক্ষণকাল পর সে আবার বললো, আপনারাও যে নিরাপদ, এমন কথা কিন্তু চিন্তা করবেন না।

মহাশয় কি আমাকে নির্বোধ ভাবছেন? বিপণীকার বললো, আমি দুইবার এ স্থান ত্যাগের চেষ্টা করেছি, কিন্তু শূকরপুত্ররা দুইবারই পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখলেই বলে, তোমার ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে থাকো। কিন্তু আমি জানি, ডোমপল্লীর রমণী এবং মধুকাসবের আকর্ষণ কিঞ্চিৎ শিথিল হলেই তারা গৃহস্থ পল্লীতে প্রবেশ করবে এবং তখনই হবে আমার বিপদ।

শ্যামাঙ্গ নিজেও বুঝছিলো যথাশীঘ্র তার নবগ্রাম ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কোন পথে যাবে তাই সে স্থির করতে পারছিলো না। বললো, আমি কোন পথে যাবো, বলতে পারেন?

এই পর্যন্ত বলতে পারলো সে। ঠিক ঐ সময় দু'জন সৈনিক পুরুষ নিকটে এসে দাঁড়ালো।

একজন কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব কিন্তু স্থূলকায়। অন্যজন গৌর, দীর্ঘ এবং কিঞ্চিৎ বয়স্ক।

ওহে, একজন বিপণীকারকে সম্বোধন করে বলে, লোকটিকে নতুন দেখছি যেন?

বিপণীকার শঙ্কিত দৃষ্টিতে বারেক শ্যামাঙ্গের দিকে তাকায়। তারপর বলে, মহাশয়, প্রভু, ইনি পথিক, আত্রেয়ী তীরের অধিবাসী।

দীর্ঘদেহ সৈনিক পুরুষ শ্যামাঙ্গের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কি হে, কি পরিচয় তোমার?

মহাশয়, শ্যামাঙ্গ সবিনয়ে জানায়, অধমের নাম শ্যামাঙ্গ, হেমাঙ্গদাস আমার পিতা, আমরা মৃৎশিল্পী, আত্রেয়ী তীরের রজতপীঠ গ্রামে আমার নিবাস।

অ, তুমি তাহলে কুম্ভকার পুত্র, বেশ ভালো কথা—খর্বকায় সৈনিক পুরুষটির কৌতুক প্রকাশ পায়। বলে, তা কুম্ভকার পুত্রের হঠাৎ পরদেশ গমন কেন?

শ্যামাঙ্গকে তখন কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়। তার কথা শুনে দু'জনের মুখেই অবিশ্বাসের হাসি দেখা যায়। একজন কপট কৌতুকে বলে উঠে, ভালো ভালো—অতি চমৎকার তোমার উদ্ভাবন, বসুদেব তাহলে মূর্তি নির্মাণ পরিত্যাগ করে কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। অতি উত্তম কল্পনা তোমার। এখন সুবোধ বালকের মতো চলো। দেখি, আমরা তোমার প্রকৃত পরিচয়টি উদ্ধার করতে পারি কি না।

এ প্রায় অবিশ্বাস্য কাণ্ড। শ্যামাঙ্গ হতচকিত হয়ে যায়। সে কি চোর না দস্যু? এভাবে বন্দী করবে? সে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে। বলে, মহাশয়রা বিশ্বাস করুন, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই।

হ্যাঁ, বৎস, আমরা বালক নই—সবই বুঝতে পারি। শুধু বুঝতে পারি না, কিছু কিছু কাজও করতে পারি—পিতৃনাম বিস্মরণ মানুষের কি প্রকারে হয় জানো?

বিদ্রূপটি স্থূল এবং অপমানজনক। কিন্তু শ্যামাঙ্গ উত্তেজিত হয় না, নিজ মস্তিষ্ক শান্ত রাখে। সে বুঝতে পারছিলো, এ সব সাধারণ সৈনিকের কাছে ক্রোধ প্রকাশ করা প্রকাণ্ড মূর্খতা। সে ভাবছিলো, বরং দলপতির কাছে নিয়ে যাক আমাকে, ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষেরা নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝবেন। সে জানতে চাইলো, মহাশয়রা কি আমাকে বন্দীশালায় নিয়ে যাচ্ছেন?

না বৎস, একজন হাসলো। বললো, শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। কথাটি বলে দারুণ হাসিতে ফেটে পড়লো দু'জনে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড এই যে, তারা অতিথিশালার দিকে, যেখানে সৈন্যদলটি বিশ্রামরত ছিলো, সেদিকে নিয়ে গেলো না। হাটের আরেক প্রান্তে একটি বটবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়ালো। তারপর অকস্মাৎ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললো, অরে সদ্ধর্মী কীট, তোর গুপ্তচর বৃত্তির কি পরিণতি হয় এখনই দেখতে পাবি। এখনও সময় আছে, বল, কি হেতু তোর এই হাটে আগমন? পিপ্পলী হাটে তোরাই কি মহাসামন্ত হরিসেনের পরিজনদের উপর আক্রমণ করিসনি? তোরাই কি যুদ্ধ দ্রোহকারী নোস?

শ্যামাঙ্গ এবার অনুমান করতে পারে যে পিপ্পলী হাটে কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সৈনিক পুরুষ দু'টির অভিযোগের উত্তরে কী বলবে, সে ভেবে উঠতে পারে না। অসহায়ভাবে একবার বামে একবার দক্ষিণে তাকায়। এবং ঐ তাকাবার সময় দূর থেকে বিপণীকারকে দেখতে পায়। দেখে, বিপণীকার বারবার নিজ কটিদেশ স্পর্শ করে একটি মুদ্রা দেখিয়ে ইঙ্গিত করছে। সে বুঝে নিলো, কিছু উৎকোচ দিলে হয়তো সে নিষ্কৃতি পেতে পারে। চকিতে তার মস্তিষ্কে নতুন বুদ্ধি খেললো। খুবই কাতর স্বরে সে জানালো, মহাশয়রা, বিশ্বাস করুন, আমি বৌদ্ধ নই, আমার চতুর্দশ পুরুষ কেউ সদ্ধর্মী ছিলো না। আমার প্রকৃত পরিচয় আপনাদের কাছে বলছি—কিছুই গোপন করবো না। তার আগে অনুমতি দিন, ঐ বিপণীকারের কাছে আমার কিছু অর্থ গচ্ছিত আছে, সে অর্থ নিয়ে আসি।

ঐ কথায় কাজ হয়। দু'জনেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। একজন বলে, নিজ অর্থ অন্যের কাছে কেউ রাখে? তুই দেখছি, একটি উৎকৃষ্ট গর্দভ। যা, তোর কি গচ্ছিত আছে, নিয়ে আয়।

শ্যামাঙ্গ দ্রুত বিপণীর অভ্যন্তরে ছুটে গেলো। এবং অন্তরালে অবস্থান করে ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ কটিবদ্ধ স্থলী থেকে অর্ধাংশ ভূমিতে রেখে অন্য অর্ধাংশ স্থলীসুদ্ধ হাতে নিয়ে সৈনিক পুরুষদের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, এবার চলুন মহাশয়রা।

কয়েকপদ অগ্রসর হতে না হতেই একজন জানতে চাইলো, তোমার স্থলীতে কি পরিমাণ অর্থ হে?

অতীব সামান্য মহাশয়।

কত?

তা দুই কুড়ি মুদ্রা হতে পারে।

শ্যামাঙ্গের উত্তরে কিছু বুঝলো কিনা বোঝা গেলো না। তবে কয়েকপদ অগ্রসর হয়েই তারা আবার দাঁড়ালো। একজন এবার বললো, তোমার কিন্তু প্রাণসংশয় হতে পারে, আমাদের প্রভুর ক্রোধ চণ্ডালের মতো।

শ্যামাঙ্গ এবার আরও বিনয় প্রদর্শন করে। বলে, মহাশয় আমি আপনাদের দাস বই অন্য কিছু নই—আপনারা রাজপাদোপজীবী—আপনাদের অসীম ক্ষমতার বলে আমার মতো দীনহীন দাসের জীবন রক্ষা পাবে। আপনারা দয়া করুন, প্রভু!

তাহলে আমরা যে প্রভু তা তোরা স্বীকার করিস?

হ্যাঁ মহাশয়। শুধু আমি কেন, আমার চতুর্দশ পুরুষ স্বীকার করে।

প্রমাণ? প্রমাণ দেখাও—

প্রভু এই যে আমি মস্তক নত করে বলছি, এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

না, দক্ষিণা কোথায়? জানিস না, প্রভুকে প্রণামের সঙ্গে দক্ষিণা দিতে হয়?

স্পষ্ট কথা। শ্যামাঙ্গ ঐ কথার পর ভূমিতে উপবেশন করে। তারপর স্থলীর মুদ্রাগুলি ভূমিতে রেখে দুই ভাগ করে। শেষে এক ভাগ একজনের হস্তে তুলে দিয়ে বলে, মহাশয়, আমার যা ছিলো, তার অধিকাংশই আমি দক্ষিণা স্বরূপ দিচ্ছি, আপনারা দয়া করে গ্রহণ করুন।

আর ঐ অর্ধাংশ? খর্বকায় সৈনিক পুরুষের কণ্ঠস্বরে নিদারুণ অসন্তোষ।

মহাশয়, শ্যামাঙ্গ মিনতি জানায়, এ সামান্য অর্থের বড়ই প্রয়োজন, আমার গৃহে পুত্রকন্যা রয়েছে।

আর মূর্খ, একজন প্রবল উষ্মাভরে বলে, স্বয়ং জীবিত থাকলে তবে না পিতৃনাম!

অন্য সৈনিকটির রসবোধ প্রচুর। সে বলে, জালিকের গল্পটি জানা আছে তোর?

শ্যামাঙ্গ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালে সৈনিকটি বলে, তবে শোন—একদা এক জালিক মৎস্য শিকারে নির্গত হয়ে রাত্রির প্রথম যামেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এদিকে তার প্রত্যাবর্তনের কথা পরদিবস দ্বিপ্রহরে। জালিক পত্নী কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় যে অন্যের জলাশয়ে মৎস্য শিকার করার অপরাধে তাকে অর্থদণ্ড দিয়ে চলে আসতে হয়েছে। এ দুঃসংবাদ শুনে জালিক গৃহিণী অতিশয় কুপিতা হয়ে বলে, অর্থ দিয়েছো ভালো—কিন্তু দণ্ডটি দিতে গেলে কেন?

গল্পটি অতিশয় অশ্লীল। শ্যামাঙ্গ বুঝেও না বোঝার ভান করলে সৈনিক পুরুষটি আবার ব্যাখ্যা ক'রে বলে, গৃহিণীকে এই জালিকের গল্পটি বুঝিয়ে বলিস এবং জানাস যে অর্থ গিয়েছে, কিন্তু দণ্ডটি তোর অক্ষতই আছে, তাহলেই দেখবি গৃহিণীর আর কোনো ক্ষোভ নেই।

ঐ কথার পর সৈনিক পুরুষ দু'জন শ্যামাঙ্গের হাতের স্থলীটি নিয়ে চলে গেলো। আর তৎক্ষণাৎ শ্যামাঙ্গ বিপণীকারের নিকট প্রত্যাগত হয়ে সেখানে রেখে যাওয়া মুদ্রা ক'টি নিয়ে অতিদ্রুত নবগ্রাম হাট ত্যাগ করলো। তার তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। যে পথে এসেছিলো সেই পথেই সে ফিরে চললো। সে জানে না, গৃহে প্রত্যাগমন তার আশু সম্ভব হবে কি না।

পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার উভয় তীরের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের জনপদগুলির তখন প্রায় এরূপই অবস্থা। গৌড়বঙ্গের রাজধানী লক্ষণাবতীতে মহামহিম পরম ভট্টারক শ্রী লক্ষণ সেন দেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজসভায় উমাপতি, ধোয়ী এবং জয়দেবের কাব্যগীতির সুললিত মূর্চ্ছনায় সভাস্থল বিমুগ্ধ। জয়দেবের কৃষ্ণলীলার বর্ণনা শ্রবণে সভাসদবর্গ তুরীয়ানন্দে বিহ্বল, ধোয়ীর পবনদূতের বর্ণনায় কামকলানিপুণা রমণীকুলের উল্লেখে শ্রোতৃবর্গ অহো অহো উল্লসিত স্বর উচ্চারণ করে উঠছেন। স্মার্ত পণ্ডিতের ভাগবত বিশ্লেষণে মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সাধু সাধু রব। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সন্দেহ করা হচ্ছে, যবন কেন্দ্রগুলিতে কেন তাদের যাতায়াত, গূঢ় পুরুষেরা বিচিত্র সংবাদ আনছে। তথাপি প্রজাকুল সুখী। ব্রাহ্মণ সুখী, কায়স্থ সুখী, বৈশ্য সুখী। কেবল ব্রাত্য শূদ্রদের গৃহে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, মস্তকোপরি গৃহের আচ্ছাদন থাকে না। আজ যদি গ্রামপতি বসবাসের স্থান দিলেন, তো কালই বললেন, দূর হ, দূর হ, পামরের দল।

তা সকলের সুখ সম্পাদন কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? ভগবান যাকে শূদ্র জন্ম দিয়েছেন পূর্ব জন্মের পাপের নিমিত্ত, সেখানে মানুষ কী করতে পারে? ভবিতব্য খণ্ডাবে মানুষের কি এতোই সাধ্য?

উজুবট গ্রামে ঐ সময়ে একদা মায়াবতীর স্বামী বসন্তদাসের আগমন ঘটলো। শোনা যায়, সে পূর্বদেশ অঞ্চলে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়েছিলো। তবে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন না ক'রে, কেন শ্বশুরালয়ে তার আগমন ঘটলো সেই রহস্য উদ্ধার করা গেলো না। বিশেষত দীনদাস ঘটনাটি সহজভাবে মানতে পারলেন না।

মায়াবতী অতিশয় উৎফুল্লা, যোগমায়াও জামাতার শ্রীমুখদর্শনে তুষ্টা। শুকদেব জামাতাকে আপ্যায়নের জন্য এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে তাঁর মনে ভিন্ন প্রশ্নের উদয় আর হলো না। কিন্তু দীনদাসের মনে চিন্তাটি থেকেই গেলো। তিনি স্বল্প বিচলিতও বোধ

করলেন, যখন একদা দেখলেন যে, চারজন সদ্ধর্মী ভিক্ষু জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলো। ভিক্ষুরা অবশ্য বিলম্ব করেনি, সামান্য কিছুক্ষণ অবস্থান করেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তবু দীনদাস উদ্বিগ্ন রইলেন।

একাকী শুধু দীনদাস নয়। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ আরও দু'একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভিক্ষুদের সংবাদ নিতে আসেন। কেউ কেউ অনুসন্ধান পর্যন্ত ক'রে যান, সত্যি সত্যি ভিক্ষুরা বিদায় নিয়েছে কিনা। ইতোমধ্যে শোনা যায়, দূরস্থিত জনপদগুলিতে পর্যন্ত মানুষকে নাকি সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত দিনযাপন করতে হচ্ছে। এখন সদ্ধর্মী ভিক্ষু দেখলেই মানুষ প্রমাদ গণনা করে।

ঘটনাটি এইরূপঃ

সামন্ত হরিসেন তাঁর অঞ্চলের হাটগুলিতে কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎই ছিলো—একটি মন্দির নির্মাণের বাসনা তাঁর। প্রথমতঃ বৃহৎ বণিকদের উপরই এই কর আরোপিত হয়। কিন্তু সামন্ত প্রভুর দাস এবং কৃপাভোগীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে ক্ষুদ্র বণিকদেরও আর নিষ্কৃতি রইলো না। তারা ক্ষুদ্রবিত্ত বণিকদের নিকট থেকেও কর গ্রহণ করতে লাগলো। কর অনাদায়ে সমূল পণ্য আত্মসাৎ, অহেতুক শাস্তি প্রদান, সামান্য কারণে লাঞ্ছনা গঞ্জনা—এই সকল ঘটতে আরম্ভ করলো। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষেই সৃষ্টি হলো ত্রাহি ত্রাহি অবস্থার।

ঐ সময়ই অকস্মাৎ ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনা সামান্য, কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনাই একটি প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর এবং ব্যাপক বিপর্যয় ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। সমিধ প্রস্তুত থাকলে ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গই যে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

হাটের একপ্রান্তে কর্মকারদের বিপণী। কর্মশালার অদূরে ডোম ও চণ্ডাল শ্রেণীর রমণীরা তাদের হস্তনির্মিত পণ্যাদি—যেমন চাঙাড়ি, খুচি ডুলা, টুকরি এইসব বিক্রয় করে। কয়েকটি ডোমনী যুবতী পিপ্পলী হাট অঞ্চলে বিশেষ আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছিলো। এতে উগ্র-ক্ষত্রিয় হরিসেনের প্রধান অনুচর বজ্রসেনের ডোমনীদের উপর বিশেষ ক্রোধ ছিলো। ঐ দিন বজ্রসেন তার সহচরদ্বয় সমভিব্যহারে হাটে সদম্ভে বিচরণ করছিলো। ঐ প্রকার বিচরণকালে হঠাৎ তারা লক্ষ্য করে যে দু'জন সদ্ধর্মী ভিক্ষু ডোম যুবতীদের সঙ্গে হাস্যালাপে রত। দু'টি যুবতী, বিশেষ ক'রে কলহাস্যে এমনই বেপথু হচ্ছিলো যে তাদের উর্ধাঙ্গের বসন বারবার বিস্রস্ত হয়ে পড়ছিলো। সে দৃশ্যে বজ্রসেন কি দেখেছিলো ঈশ্বর জানেন, সে হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হয় এবং ডোমনীদের কাছে গিয়ে তাদের পণ্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ডোমনীদের তখনও উল্লাসঘোর কাটেনি, অঙ্গে হাস্য তখনও তরঙ্গায়িত হচ্ছে এবং কোনোদিকেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সম্ভবত বজ্রসেনের কথা তারা শুনতেও পায়নি। ঐ সময় ক্ষুব্ধ বজ্রসেন চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠে, ওরে পামরি, হট্টকর দিয়েছিস?

অধিক আর কি! ডোমনীটি যুবতী, তায় রূপসী এবং সর্ববিষয়ে পারঙ্গমা। উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্রাঞ্চল কটিলগ্ন ও দু'হাতের পিত্তল বলয় চমকিত করে ব'লে ওঠে, কিসের কর, আমরা কেন হট্টকর দিতে যাবো?

তুই কেন শূকরপুত্রী, তোর পিতা দেবে।

অ-অ, বজ্রসেনের দিকে ঐ সময় অন্য ডোমনীরা কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চল বন্ধন করে এগিয়ে আসে। একজন ডেকে বলে, হ্যাঁ লো কুসুম, কি বলে ঐ দগ্ধমুখ মর্কট!

কুসুম তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলে ওঠে, অরে ছিনাল পুত্র, আমরা যে তোর পিতার কর্মস্থলের দ্বারদেশ থেকে তোকে টেনে এনে জগৎ দেখাবার সময় কর দিয়ে এসেছি, সে সংবাদ কি তোর মা তোকে জানায়নি?

বজ্রসেনের ব্রহ্মতালু পূর্ব থেকেই দাহ্য হয়ে উঠেছিলো, ডোমনীর ঐ কথায় সেখানে যেন অগ্নিসংযোগ হলো। সে এক লম্ফে 'কি বললি, কি বললি' এই কথা উচ্চারণ করে এবং সজোর মুষ্টিতে কেশ আকর্ষণ ক'রে কুসুম ডোমনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে।

অন্য ডোমনী ও ডোমেরাও ঘটনাস্থলে ইতোমধ্যে এগিয়ে আসে। কর্মকার বিপণীগুলিতে ঠকঠক ঠনঠন শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। সকলেই বিস্ফারিত নয়নে দেখতে থাকে, অতঃপর কী ঘটে। ভিক্ষু চেতনানন্দ ঐ সময় নিকটস্থ হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। আবেদন জানান, মহাশয়, স্ত্রীদেহে ক্ষত্রিয়ের আঘাত শোভা পায় না, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। ভিক্ষুর ঐ কথায় হিতে বিপরীত হয়। বজ্রসেন তার কোষবদ্ধ অসি নিষ্কোষিত করে ভিক্ষু চেতনানন্দের স্কন্ধে আঘাত করে বসে। তাতে আহত চেতনানন্দ আর্তনাদ করে ভূমিতে পপাত হন। ঐ দৃশ্য সমবেত জনতাকে স্তব্ধ করে দেয় মুহূর্তের জন্য। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, তারপরই কে একজন চিৎকার করে ওঠে, ধর শ্যালককে—

অতঃপর যা ঘটতে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। ভয়ানক উত্তেজিত এবং উৎক্ষিপ্ত মানুষ মার মার ধর ধর রব করতে থাকে। অচিরাৎ বজ্রসেনের দেহ ডোমনীরা ছিন্নভিন্ন করে দেয়—কেননা ধারালো অস্ত্র তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিলো—ঐ অস্ত্রই তাদের পণ্য উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন। বজ্রসেনের সহচরদ্বয় পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—সমবেত জনতার মুষ্টি, পদ এবং কর্মকারদের হস্তলীর আঘাতে দু'জনেরই দেহ কিমাকার মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পিপ্পলী হাটে সংঘটিত ঐ ঘটনার সময় হরিসেন গৃহে ছিলেন না। বয়স্য ও সুহৃদ দুই গ্রামপতিকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। মৃগয়াক্ষেত্রেই তিনি সংবাদটি পান। তারপর আর বিলম্ব করেননি, যথাসম্ভব দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে গ্রামপতি ও সামন্তদের যাকে পেয়েছেন তাকেই সঙ্গে নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো দেববারে—তিনি পিপ্পলী হাটে তাঁর বাহিনী নিয়ে উপনীত হলেন বুধবারে। দু'দিন বিলম্ব হয় তাঁর লোক সংগ্রহের কারণে। প্রায় দ্বিশতাধিক শস্ত্রধারী যোদ্ধার দল যখন হাটে উপস্থিত হলো—তখন নিকটের গ্রামগুলি হয়ে গেলো জনশূন্য!

হরিসেন প্রথমেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সন্ধান করেন। ভিক্ষু চেতনানন্দ তখন মৃতপ্রায়—সহচর শুদ্ধানন্দ তাঁর শুশ্রূষা করছেন। অন্য ভিক্ষুরা কোথায়, কেউ জানে না। যুবক ডোমেরা পূর্বেই গভীর বনভূমিতে পলায়ন করেছে। ডোম পল্লীতে কেবল বৃদ্ধ, শিশু এবং রমণী। কিন্তু হরিসেন তখন দারুণ ক্রোধে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি যা করলেন, তার তুলনা হয় না। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো মানুষের পক্ষে ঐ কাজের কল্পনা করাও অসম্ভব।

কুসুম ডোমনীকে ধরে এনে সর্বসমক্ষে দাঁড় করানো হলো এবং ঘোষণা করা হলো—এই স্বৈরিণী সকল বিরোধের মূল, দেহের যে অংশের কারণে এই স্বৈরিণী পুরুষ সমাজে বিরোধ এবং লোভের বীজ বপন করে, শরীরের যে অংশ যথার্থই নরকের দ্বার, সেই অংশটি আমরা প্রজ্বলিত করে দেবো।

ঘোষণাটি সামন্ত হরিসেনের। ঘোষক কেবল বাক্যগুলি সচিৎকার উচ্চারণ ক'রে গেলো। এবং তারপর সর্বসমক্ষে কুসুমকে নির্বস্ত্রা করে তার যোনিদেশে একটি উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। মৃত্যুর পূর্বেকার চিৎকার, বাঁচবার জন্য আকুলি বিকুলি, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ—সবই কুসুম করছিলো। কিন্তু সবই তখন দেখাচ্ছিলো জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন পুত্তলীর হস্তপদ সঞ্চালনের মতো। শস্ত্রধারী সৈনিকদের দৃষ্টি হয়ে উঠেছিলো ভারী নিস্পৃহ। একজন অন্যজনের কানে এমনও মন্তব্য করেছে যে, দেখেছো, স্ত্রীলোকটির দেহে এখনও কিরূপ শক্তি?

ঐ সময় ধূম উদগীরিত হচ্ছিলো প্রবল। বাতাসে ছিলো দগ্ধ মাংস ও ভস্মীভূত কেশের গন্ধ। সূর্য ঐ সময় আবার পূর্বাকাশে একখানি পাটলবর্ণের মেঘে তার সিন্দুর বর্ণটি লেপে দেয়। হরিসেনের জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করে তার পদলেহী অনুচরেরা।

হরিসেন দেখছি প্রকৃতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন!

এ মন্তব্যটি অন্য এক শস্ত্রধারী পুরুষের। ওদিকে নতুন ঘোষণা হচ্ছিলো তখন। কুসুম ডোমনীর গর্ভজাত শিশুপত্র দু'টি জারজ—পাপের সন্তান, অতএব তাদের বিনষ্ট করা হবে।

পরের দৃশ্যটিও সমবেত শস্ত্রধারী সৈনিকেরা অবলোকন করে। প্রায় প্রত্যেকের চক্ষুই রক্তবর্ণ, অত্যধিক মাদক সেবনের কারণেই সম্ভবত পদক্ষেপও অসংবৃত। তারা যা দেখছিলো তা যে মানব সম্পর্কিত কিছু—এই বোধ তখন অনেকেরই ছিলো না।

কিন্তু তথাপি কোথায় কী যেন ঘটে। ঐ জনসমষ্টির মধ্যভাগে, হয়তো গভীর কোনো তলদেশ থেকে, যেখানে দৃষ্টি চলে না সেইরূপ কোনো স্থান থেকে কেউ কেউ নয়ন মেলে দেখে দৃশ্যটি। আর খড়গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত শিশুর রক্তাক্ত শব, কুণ্ডলীকৃত ধূম, অগ্নির লেলিহান শিখা এবং আকাশের পাটল মেঘে ডগডগে সিন্দুর বর্ণটি, সমস্ত একত্রিত হয়ে অদৃশ্য কোনো বন্ধন যেন ছিন্ন করে দেয়। আর তাতেই রুদ্ধবাক জনতা যেন অস্পষ্ট ভাষা পায়। একজন আর একজনকে প্রশ্ন করে, কেন? কেন? কেন?

কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তরদাতা কেউ ছিলো না সেখানে।

ইতোমধ্যে মুমূর্ষু ভিক্ষু চেতনানন্দকে টেনে আনা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ঘোষক জানিয়েছেন—ধর্মবিরোধী অনাচারী এই পামরদের একটিই শাস্তি যা আমাদের পিতৃপুরুষদের কাল থেকে দেওয়া হচ্ছে। দেখো, তোমরা গ্রামবাসি!

গ্রামবাসীরা তখন দূরে। বনের বৃক্ষান্তরাল থেকে ঐ জনসমাগমটি দেখছিলো কেউ কেউ, কিন্তু প্রকৃত কী ঘটছে, তা বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সুতরাং তারা দেখতে পায়নি যে ভিক্ষু চেতনানন্দকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

নরমাংস দগ্ধ হলে তার গন্ধ অসহ্য বোধ হয়। শস্ত্রধারী সৈন্য দলটি স্থান ত্যাগ ক'রে একে একে দূরে গিয়ে দাঁড়াতে আরম্ভ করে। 'কেন, কেন', প্রশ্ন তখনও ছিলো। বিষ্ণুদাস মিত্র হরিসেনের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। তার দৃষ্টিতে সৈন্যদলের চঞ্চল আচরণ বিসদৃশ মনে হয়। সে হরিসেনের কাছে তার সন্দেহের কথাটি ব্যক্ত করে। ওদিকে তখন শুদ্ধানন্দকে সভামঞ্চে আনয়ন করা হয়েছে। ঘোষক ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এই পামর যদি সমবেত সামন্তদের পাদুকা লেহন করে, তবে একে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে।

ঐ কথার যে কী অর্থ, শুদ্ধানন্দের চেতনায় তার কোনো ছায়াপাতই ঘটছিলো না। সে বিমূঢ় পশুর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার আচরণ হাস্যকর মনে হচ্ছিলো। ঐ সময় কে যে চিৎকার করে ওঠে বোঝা যায় না। শুধু চিৎকারটি শোনা যায়—ওর কি দোষ? ওর কি অপরাধ? এবং তাতেই সভামঞ্চের লোকেরা পরস্পরের মুখপানে চায়। এই মুহূর্তে কে একজন ভিক্ষু শুদ্ধানন্দের পশ্চাদ্দেশে সজোরে পদাঘাত করে। শুদ্ধানন্দ পতিত হন জনসমষ্টির মধ্যে। এমন মনে হচ্ছিলো যে লোকটিকে ক্ষিপ্ত জনতা ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু তা হয় না। বরং দু'জন লোক শুদ্ধানন্দকে তুলে দাঁড় করায়। একজন বলে, যা, শীঘ্র পলায়ন কর।

ঐ সময় সভামঞ্চ থেকে দু'জন ঘাতক নেমে আসে, কিন্তু শুদ্ধানন্দকে আর নাগালে পাওয়া যায় না।

শুদ্ধানন্দকে দু'টি শস্ত্রধারী তরুণ টানতে টানতে পথে এনে দাঁড় করায়। তারপর বলে, এ পথে আর কখনও আসবেন না—এবার যান, পলায়ন করুন।

ঘটনাটির সমাপ্তি কেন ঐভাবে হয়েছিলো সে রহস্য ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। সম্ভবত তার প্রয়োজন ছিলো না। যাদের প্রয়োজন ছিলো, তারা পূর্বে অথবা পরে ঐ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রহস্যটি কি? না সমবেত জনতা এবং দলপতির ইচ্ছার পার্থক্য। দলপতি যা চায়, জনতা তা চায় না। সেনাপতি যা চায়, সৈন্যদল তা চায় না, গ্রামপতি যা চায়, গ্রামবাসী তা চায় না—ব্যাপারটি এইমত। এবং ঐ কারণেই ভিক্ষু শুদ্ধানন্দের প্রাণ রক্ষা পায়।

তবে প্রাণরক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাণনাশের ঘটনাটিই প্রধান হয়ে উঠেছিলো। এবং সেও হয়েছিলো সামন্ত হরিসেনের পরিকল্পনা মতোই। তিনিও চেয়েছিলেন, এমন শাস্তি দেবেন ব্রাত্য চণ্ডাল-ডোমদের, যেন তারা কোনোদিন সামন্ত প্রভুর বিরোধিতা করার কথা স্বপ্নেও চিন্তা না করতে পারে।

বলা কঠিন, শুদ্ধানন্দ ঘটনাটির কী বর্ণনা দিয়েছিলেন, কিংবা আদৌ কোনো বর্ণনা দিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু লোকমুখে ঘটনাটির নানা প্রকার বর্ণনা প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। এবং ঐ সকল বর্ণনায় ত্রাস, উল্লাস, হতাশা, বিভীষিকা, সমবেদনা ইত্যাদি নানা প্রকার মানবিক প্রতিক্রিয়া মিশ্রিত হয়ে যায়। গ্রামপতি সামন্তপতি, এবং হরিসেনের অনুচরবর্গ ব্যাপারটির যথার্থ নিষ্পত্তি হয়েছে মনে করলেও সাধারণ গ্রামবাসী যারা, ক্ষেত্রকর, কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায়, অর্থাৎ প্রাকৃতজন, তাদের মনে স্বস্তির সঞ্চার হয় না। প্রত্যেকেই আশঙ্কা করতে থাকে—এই বুঝি ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। রাজপুরুষ দর্শনমাত্র তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলো। অবস্থা এমন হলো যে, ভিক্ষু যোগীদের সঙ্গে তারা বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ রাখে। ডোম-চণ্ডালদের তারা গৃহকাজে আর ডাকে না। দিবারাত্র সন্ত্রাস, অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তা পিপ্পলী হাটের নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে করে রাখলো নীরব, নিষ্ক্রিয় এবং অন্ধকার।

উজুবট দূরের গ্রাম। কিন্তু পিপ্পলী হাটের ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনাটির বিবরণ এই গ্রামেও এসে পৌঁছেছিলো। ব্রাহ্মণ সোমজিৎ উপাধ্যায় যদিও বোঝাচ্ছিলেন যে কাহিনীটি অলীক, যা শোনা গেছে তা দুষ্টজনের প্রচার মাত্র, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তাঁর ক্ষেত্রকর ভূমি কর্ষণে যায় না, গাভীগুলির যত্ন করে না রক্ষপাল কিশোর দু'টি, গৃহদাসী বালিকা দু'টি সেই যে গিয়েছে, আগমনের কোনো লক্ষণ নেই।

সোমজিৎকে অগত্যা আসতে হলো ক্ষেত্রকর পল্লীতে, শুকদেবের কাছে। বললেন, তোমরা অকারণ ভীত হয়েছো, পিপ্পলী হাটের ঘটনাটি অলীক-হরিসেন কিঞ্চিৎ উগ্র হলেও তিনি প্রাণনাশের কাজ কদাপি করবেন না।

কিন্তু গ্রামের লোক উপাধ্যায় মহাশয়কে বলে, প্রভু, হরিসেনকে বলুন, তিনি যেন আমাদের উপর নিপীড়ন না করেন।

সোমাজিৎ ঐ প্রার্থনা শ্রবণ করেন শুধু। করণীয় কিছু আছে ব'লে তাঁর মনে হয় না। তিনি বোঝেন, তাঁর কথা কেউ শুনবে না, তবু তিনি চেষ্টা ত্যাগ করলেন না।

হরিসেনের কাছে গেলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে উপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ শুনলে তাঁকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বললেন, ওদের অনাহারে রাখুন, দেখবেন, ওরা বিনয়ী এবং শ্রমশীল দুই-ই হয়েছে, সুতরাং ওদের অনাহারে রাখুন।

কিন্তু ওরাও তো মানুষ!

হরিসেন হা হা স্বরে হেসে ওঠেন। বলেন, উপাধ্যায় মহাশয়, আপনি ওসব বুঝবেন না।

ওরা যদি কর্ম সম্পাদন না করতে চায়, তাহলে উপায় কি হবে, চিন্তা করেছেন? সোমজিৎ প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ, করেছি, কিছুই হবে না, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না—এক সময় বাধ্য হয়ে ওরা আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু ওদের যদি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে? ওরাও তো মানুষ!

পুনরায় উচ্চরোলে হাস্য করেন সামন্ত হরিসেন। বলেন, কী যে বলেন উপাধ্যায় মহাশয়—ওরা মানুষ হলেও আপনার আমার মতো নয়। ভগবান ওদের জন্য কর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ভাগবতের কর্মযোগ ও কর্মফলের ব্যাপারটি তো আপনি ভালো জানেন। এই মানবজন্মে ওরা শূদ্র—ঐ কাজ করার মধ্যেই ওদের মানবজন্মের সার্থকতা। কাজ না করা ওদের জন্য বিপথগামিতা এবং ধর্মবিরুদ্ধ—আপনি তা সমর্থন করবেন?

সোমজিৎ উপাধ্যায় হরিসেনের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর আশঙ্কা হতে লাগলো একটি অশুভ পরিণাম ঘনিয়ে আসছে। রাজপুরুষেরা কিছু করছে কিনা তিনি জানেন না, সামন্তপতি ও গ্রামপতিরা একেবারেই উদাসীন। কর্মজীবী মানুষেরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে না পারলে যে সকলেরই সমূহ ক্ষতি সেটা কেউই বুঝতে চাইছে না। এই প্রকার অবস্থা যদি চলতেই থাকে, তাহলে সামাজিক উপপ্লব অবশ্যম্ভাবী—মাৎস্যন্যায় কেউ রোধ করতে পারবে না। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

বসন্তদাসের আগমন হয় পিপ্পলী হাটের ঘটনাটির অব্যবহিত পরে। জামাতার আগমনে শুকদেবের পারিবারিক জীবন আনন্দে উৎফুল্ল হলো বটে কিন্তু তাঁর মনের নিগূঢ়ে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা কাটলো না—বরং প্রবলতর হলো। বিশেষত দীনদাস, মায়াবতীর মাতুল, বসন্তদাসের মুখভাব ফিরে ফিরে লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটি দুশ্চিন্তা তাঁর মনে শলাকার মতো বিদ্ধ হয়ে রইলো। সেটি হলো, জামাতা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি বাক্যও কখনও উচ্চারণ করছে না। তিনি বুঝতে পারেন না, তবে কি বসন্তদাস কোন গূঢ়কর্মের সঙ্গে যুক্ত? আর তাই সে জানতে দিতে চায় না বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে তার কি প্রকার সম্পর্ক হয়েছে?

দিন দুই পরে যখন সন্ধ্যাকালে দেখলেন বসন্তদাস নদীতীরে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন তখন আর নীরব থাকতে পারলেন না। ঘটনাটি শুকদেবের গোচরে আনলেন। শুকদেব শুনলেন। শুনে মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না। দীনদাস ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আপনি ব্যাপারটি সহজ বলে মনে করছেন—কিন্তু আমার সন্দেহ, ব্যাপারটি সহজ নয়। জামাতা যদি বিপদে পড়ে, তাহলে কী হবে চিন্তা করেছেন?

শুকদেব তখন শ্যালকের মুখপানে দৃষ্টি রেখে একটি ক্ষুদ্র শ্বাস মোচন ক'রে বলেন, আমি ভবিতব্য মানি দীনদাস—যদি ভাগ্যে তোমার অশুভ কিছু লিপিবদ্ধ থাকে, তাহলে কি তুমি তা পরিহার করতে পারবে? পারবে না, সুতরাং দুশ্চিন্তা করে কি হবে! রাজার পাপে রাজ্য নাশ—এ প্রবাদটি তো জানো। রাজার পাপ রাজা একাকী বহন করেন না—তাঁর পাপ প্রজাপুঞ্জেও বর্তায়। যদি ঐ পাপের দায় তোমার বিধিলিপি হয়ে থাকে, তাহলে কি তুমি তা খণ্ডন করতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। আমাদের জামাতাটি তো আর বালক নয়—মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান তার নিশ্চয়ই হয়েছে। তুমি অথবা আমি কিছু বললেও সে শুনবে না।

না ভ্রাতঃ, এভাবে নির্বিকার থাকা সমীচীন নয়—দীনদাস তাঁর উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করেন। বলেন, জলধর দত্ত এবং কায়স্থ পল্লীর লোকেরা যেখানে আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সেখানে আপনার নিস্পৃহ এবং নীরব থাকা উচিত নয়। জামাতাকে বলবেন, যেন সে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যোগীদের সঙ্গ পরিহার করে।

উত্তম, বলবো, শুকদেব পুনরায় একটি শ্বাস মোচন করে জানালেন।

প্রথম রাত্রে মায়াবতীর লজ্জা হচ্ছিলো।

বিবাহের পর মাসাধিককাল তার স্বামীগৃহে অতিবাহিত করেছে। স্বামীসঙ্গে প্রথম ক'দিন তার ভয় হতো—বিশেষত দেহ মিলনের ব্যাপারটা তাকে রীতিমতো পীড়িত করতো। পুরুষ মানুষ যে ঐ একটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছু চায় না, এটা বুঝতে পেরে সে তখন মনে মনে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু আর ক'দিন পরই সে অনুভব করে যে স্বামী তার কাছে আরও কিছু চায়। কিন্তু সেটা যে কি বস্তু তা সে বুঝে উঠতে পারে না, ঐ সময় সে কখনই পারেনি। তারপর বসন্তদাস হঠাৎ বাণিজ্য যাত্রা করে। শুরু হয় তার বিরহযাপন। স্বামীসঙ্গহীনা না হলে স্বামী যে কি বস্তু তা কোনো নারীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সে নিজেও প্রথমদিকে বোঝেনি। বুঝলো গত সাত/আট মাসে। সাত/আট মাস পর আবার তার স্বামীসঙ্গ।

তবু প্রথমদিন তার লজ্জা কাটছিলো না। শুধু লজ্জা নয়, সেই সঙ্গে সে আবার প্রবল আকর্ষণও অনুভব করছিলো। তদুপরি ছিলো একটি দুর্বহ কষ্ট, প্রণয়ভারের কষ্ট।

সুতরাং ঐ প্রকার নানাভাবে মিশ্রিত বিচিত্র একটি মানসিক অবস্থা নিয়ে সে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলো।

প্রকোষ্ঠে ধূপ জ্বলছিলো—দীপাধারে প্রদীপ শিখাটি ছিলো উজ্জ্বল—শয্যা কোমল এবং দুগ্ধফেননিভ। উপাধান স্ফীতোদর—তাতে আবার সুচারু সূচিকর্ম—একটি লতিকা, দু'টি পত্র, একটি কলিকা—এইরূপ চিত্রণ। ওদিকে বক্ষের কঞ্চুলি স্বেদসিক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। একেকবার মনে হচ্ছিলো, গবাক্ষ উন্মুক্ত করে।

কিন্তু রাত্রি তখনও গভীর হয়নি একথা স্মরণ হওয়ায় তাকে বিরত থাকতে হয়েছে। সে জানে, কৌতূহলী রমণীরা বাইরে অপেক্ষা করে আছে। গবাক্ষ অর্গলমুক্ত করলেই তারা একত্রে হেসে উঠবে।

ঐভাবে স্বেদাপ্লুত হতে থাকলে কুঙ্কুমবিন্দু এবং চন্দনতিলকের কি দশা দাঁড়াবে ভেবে তার কান্না পাচ্ছিলো। কেন যে দগ্ধাননা লীলাবতী তাকে এমন করে সাজিয়ে দিলো? তাম্বুল রাগে ওষ্ঠ রঞ্জিত করবার জন্য তাকে দু'তিনবার তাম্বুল চর্বণ করতে হয়েছে। শেষ তাম্বুলটিতে আবার মৃগনাভিচূর্ণ প্রযুক্ত ছিলো। সে বুঝছিলো, অতিমাত্রায় স্বেদাক্ত হওয়ার কারণ ঐটিই। বারেক সে মনে মনে প্রগলভা হচ্ছিলো, বারেক আবার লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিলো।

তার মনে হচ্ছিলো, প্রকোষ্ঠের বাইরে যায়। কেননা এমন রীতির কথা তো সে কখনও শোনেনি। পিতৃগৃহে কন্যা শয়নগৃহে অপেক্ষা করবে স্বামীর জন্য, এমন কি হয়? লোকটা মায়াবতীকে জানিয়ে গেলো, আমি এখনই আসছি—কিন্তু তার সেই এখন কি এতোক্ষণেও হয়নি?

বসন্তদাস শয়নগৃহে বেশ বিলম্বে আসে। কক্ষে প্রবেশ করেই স্ত্রীকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও তার পশ্চাতে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে কৌতুকে ঈষৎ হাসে। তারপর মায়াবতীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করে ডাকে, হলুদ পক্ষিটি আমার!

মায়াবতী অপ্রস্তুত, এ কী সম্ভাষণ—ছি! পূর্বদেশ অঞ্চল থেকে কি এই আচরণ শিক্ষা করে এসেছে? ক্ষণকাল পরে কানের কাছে উষ্ণ শ্বাস পড়ে এবং শোনে, হলা পিয় সহি!

মায়াবতী ওষ্ঠ দংশন করে, না, এই নির্বোধের সম্ভাষণে সে সাড়া দেবে না।

কিন্তু নির্বোধ নিরস্ত হয় না। সে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে চায়। তখন তার অক্ষিপক্ষ্ম আপনা থেকেই নিমীলিত হয়ে এসেছে—আর ঐ মুহূর্তটিতে বসন্তদাস গভীর স্বরে ডাকে, মায়া, আমার মায়াময়ী!

ঐ ডাকে মায়াবতীর অন্তরাত্মা আমূল কম্পিত হয়। শরীরের ভার যেন পদযুগল আর ধারণ করতে পারে না। তার চক্ষুরুন্মীলন হয়, কিন্তু দৃষ্টি বিনতই থেকে যায়।

আমার মুখপানে চাও মায়াবতী!

প্রণয়ীর প্রার্থনা যেন। অনুশীলনসিদ্ধ একেবারে কুশলী প্রণয়ী! না জানি কতো রমণীর মানভঞ্জনে এই একই বাক্য প্রয়োগ করে এসেছে। মায়াবতী মনের ভেতরে কোথায় যেন ক্ষীণ একটি কণ্টক দংশন অনুভব করে। স্বেদ তখন আর বিন্দুতে থেমে নেই, একেবারে স্রোতধারা হয়ে নেমে আসছে। সে পুনরায় মুখ নত করে।

এই যদি তোমার আচরণ হবে, তাহলে কি কারণে এই কবরী-বন্ধন, বলো? কেন এই কুরুবক আর শিরিষ, কেন এই পট্টবস্ত্র? কি প্রয়োজনে কণ্ঠে এই স্বর্ণমালা, সুদৃশ্য এই কঞ্চুলিই বা কেন? কুঙ্কুম চন্দন এবং অলক্তক কোন কাজে লাগবে, বলো?

অতিশয় নীচ! মায়াবতী তখন মনে মনে বলছে, অতিশয় নীচ এই ব্যক্তি যে প্রণয়-সম্ভাষণকালেও কলহ করতে চায়।

স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখে বসন্তদাস তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে। বলে, জানো আমি কি করবো এই কবরীবন্ধনের?

ছি ছি—এ কি নারী পীড়ক! একেবারে অকৃত্রিম দস্যু হয়ে এসেছে পূর্বদেশে বাণিজ্য করে সে বারেক ভাবে, বাহুপাশ ছিন্ন করে ছুটে পলায়ন করে।

জানো, এই কুঙ্কুম চন্দনের কি হবে?

মা গো! এ বড়ই দুঃশীল—এই নাগরস্বভাব কিভাবে হলো এর—এ তো এমন ছিলো না। তবে কি অন্য কোনো ব্যক্তির বাহুপাশে আবদ্ধা সে? মায়াবতী এবার প্রাণপণে দেহ সঞ্চালিত করে, যদি পাশমুক্ত হওয়া যায়।

আর এই সুদৃশ্য কঞ্চুলিটির কি দশা হবে, ভেবেছো একবার?

মরণ দশা! ছি ছি, এমন ওষ্ঠকর্তিতও হয় মানুষ! সে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে স্বামীর দিকে।

বসন্তদাসের কিন্তু বিকার নেই। সে তখনও হাসছে। বললো, কুপিতা রমণী কিন্তু অধিকতর রমণীয়া—সে কথা জানো তো? কথাটি বলে সে তাম্বুল পাত্র থেকে দু'টি গ্রন্থিবদ্ধ তাম্বুল একত্রে হাতে নিয়ে বললো, শ্বশুরালয়ে আসব পানের ব্যবস্থা থাকে না কেন বলতে পারো? অতো মধুক বৃক্ষ দিয়ে তোমরা কি করো?

এবার আর সহ্য হলো না। মায়াবতী ঈষদুচ্চকণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে উত্তর করলো, আসব পানের যদি এতোই আগ্রহ, তাহলে নটিগৃহে গেলেই হতো, এখানে আগমনের তো প্রয়োজন ছিলো না।

বসন্তদাস তখনও হাসে। ততক্ষণে সে তাম্বুল চর্বণ করেছে এবং চর্বণজনিত কারণে স্বেদাক্ত হতে আরম্ভ করেছে। ঐ অবস্থাতেই সে বলে, হ্যাঁ, সে স্থানে গেলেও হতো, কিন্তু সেখানে কি মায়াবতী পাওয়া যায়, এমন মায়াবতী কি আর কোথাও আছে, বলো?

অতঃপর বসন্তদাস যা আরম্ভ করলো সে বর্ণনা বাৎসায়ন বিস্তৃত এবং অনুপুঙ্খ দিয়েছেন। তার পুনর্বর্ণনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

মৃগনাভিচূর্ণ রাগোত্তেজনা প্রগাঢ়তর করতে পারে এবং শোনা যায়, ক্ষেত্র বিশেষে রাগমোচন বিলম্বিতও করে থাকে। কিন্তু তারও শেষ আছে। এক সময় ক্লান্ত দুই শরীরের স্বেদে শয্যা যখন সিক্তপ্রায়, তখন মায়াবতীর শরীরে যেন তার সমস্ত বিরহকালের ঘুম এসে নামলো, তারপর আর কিছু সে জানে না।

রাত্রির শেষ যামে যখন জাগলো, তখন দেখে, দ্বার অর্গলমুক্ত এবং বসন্তদাস শয্যায় নেই। বাইরে তখনও ঘোর অন্ধকার। বন্য কুক্কুট সবে দু'টি একটি ডাকছে। প্রথমে মনে হলো, শারীরিক প্রয়োজনে হয়তো বসন্তদাসকে বাইরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও যখন সে এলো না, তখন মায়াবতীর চিন্তা হতে লাগলো, মানুষটা গেলো কোথায়? জননীকে ডাকবে কিনা এ চিন্তায় যখন সে দ্বিধান্বিতা, তখনই দেখলো, সন্তর্পণে বসন্তদাস কক্ষে প্রবেশ করছে।

কোথায় যাওয়া হয়েছিলো? সে জিজ্ঞাসা করে।

ঐ প্রশ্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়াবতীকে দেখে বসন্তদাস। তারপর বলে, বাইরে।

স্বামীর ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তর মায়াবতীকে বিমূঢ় করে দেয়। শুধু উত্তরের সংক্ষিপ্ততাই নয়। দেখে স্বামীর মুখে বিচিত্র গম্ভীর একটি ভাব—যা পূর্বে সে কখনও দেখেনি। দীপে তখনও তৈল ছিলো। সে স্বামীর মুখপানে বারবার দৃষ্টিপাত করছিলো। রাত্রিকালের আলিঙ্গনাবদ্ধ স্বামী রাত্রি বিগত হলেই কেমন ক'রে অচেনা হয়ে যায় সে ভেবে পাচ্ছিলো না। শুধু একটি কথা ঐ মুহূর্তে তার স্মরণ হলো। কথাটি বিবাহ রাত্রে মালিনী আয়ী বলেছিলো। বলেছিলো, দেখিস লো, পুরুষ বড় চঞ্চলমতি হয়—অঞ্চলে বেঁধে রাখিস, যেন পলায়ন না করতে পারে।

স্বামীর একেকদিনের ঐ প্রকার রহস্যময় অন্তর্ধান এবং আবির্ভাব তাকে স্বস্তিবিহীন করে তুললো। একদা যখন রাত্রির প্রথম যামেই বসন্তদাস চলে গেলো এবং সারা রাত্রি ফিরলো না—তখন মায়াবতী ভেঙে একেবারে লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত রাত্রি সে কাঁদলো। কিন্তু তখনও সে বাইরে কারও কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করেনি। সারারাতের রোদনে তার মুখে মলিন প্রচ্ছায়া দেখা দিয়েছিলো। জননী উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য গোপন করে বললো, শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে মা, অন্য কিছু নয়। এবং ঐ সময়ই পিতা শুকদেব একদা জানালেন, বৎসে, জামাতাকে ব'লো সে যেন ভিক্ষু ও যোগীদের সান্নিধ্য পরিহার করে। এমনিতে তো কায়স্থ পল্লীর লোকেরা আমার প্রতি বিরূপ এবং বিদ্বিষ্ট। এখন ভিক্ষুদের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের কথা যদি কেউ সামন্তপতির গোচরে আনে, তাহলে আমাদের সবাইকে বিপদে পড়তে হবে।

মায়াবতী সেদিন শয্যায় দু'বাহু দিয়ে স্বামীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে রাখলো। মুহূর্তের জন্য নিদ্রা গেলো না এবং বাহুবন্ধনও শিথিল করলো না। বসন্তদাস নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে সে বাহুবন্ধন আরও দৃঢ় করলো। বললো, আমি তোমাকে যেতে দেবো না। মধ্যরাতে তুমি কোথায় যাও? ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপে—পিপ্পলী হাটের ঘটনাটির কথা তুমি জানো—তবু—

বসন্তদাস যুবতী পত্নীর শরীরে সস্নেহ হাত বুলায়। বলে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই মায়াবতী, আমি কোনো পাপকর্মে লিপ্ত নই—তোমার পিতা আর মাতুলকে ব'লো, আমি যা করছি, সকলের মঙ্গলের জন্যই করছি।

কী কাজ করো তুমি? মায়াবতী জানতে চায়।

সে কথা এখন নয়, সময় হলে তোমাকে বলবো।

মায়াবতী মরমে মরে যায়। তার দেহসৌষ্ঠব, তার সৌন্দর্য, তার যৌবন—কোনো কিছুই স্বামীকে ধরে রাখতে পারছে না। তার দু'চোখে এক অচেনা রহস্য। যখন বাইরে দৃষ্টিপাত করে, তখন মনে হয়, যেন দিগন্ত অতিক্রম করে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। যখন ভ্রূকুঞ্চিত করে, তখন মনে হয় না যে ঐ ভ্রূরেখা আর কখনও সরল হবে।

সে সখী লীলাবতীকে জানায় ব্যাপারটা। বলে, সখী, আমার বড় ভয় করে।

লীলাবতী হাসে। বলে, ভয়ের কিছু নেই, তোর পুরুষ বোধ হয় কোনো কারণে চিন্তাগ্রস্ত—তুই জেনে নে, কী চিন্তা করে ও।

মায়াবতী ঐ রাত্রে স্বামীকে বিশেষ অস্থির দেখলো। বারে বারে সে বাইরে যাচ্ছে। স্বামীর ঐভাব দেখে এক সময় সে স্বামীর দুই পা জড়িয়ে ধরে। বলে, তোমাকে বলতে হবে, তুমি কেন চঞ্চল হয়েছো, কেন তুমি চিন্তাগ্রস্ত আর অস্থির?

বসন্তদাসের বিরক্তি লাগে প্রথমে। তারপর, পদযুগলে স্ত্রীর কোমল বক্ষস্পর্শ, অশ্রুসজল নয়ন এবং বাহু দু'টির সজোর আকর্ষণ তাকে কিঞ্চিৎ বিহ্বল করে দেয়। স্ত্রীকে সে দু'হাতে তুলে এনে শয্যায় বসায়। তারপর তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলে, মায়া, তুমি আমার গোপন কথা জানতে চাও—কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমার গোপন কোনো কথা নেই। পিপ্পলী হাটে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে ব'লে আশঙ্কা করি। আমি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বাধা দেবার চেষ্টা করছি। কীভাবে, সে প্রশ্ন ক'রো না। শুধু আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। সম্মুখের কাল বড় ভয়াবহ। আসন্ন ঐ দুর্যোগের কালে অবিশ্বাস ও সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। বিশ্বাস আর ভালবাসায় আমাদের সংহত এবং দৃঢ় হতে হবে।

মায়াবতীর দেহ শিথিল হয়ে আসে। সে বসন্তদাসের কথা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে না। বক্ষের ভেতরে ভয় থর থর করতেই থাকে। তারপর স্বামীর মুখের ঐ দু'টি কথা তার মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। বিশ্বাস এবং ভালবাসা! আহা কী সুন্দর কথা! মায়াবতীর চিন্তা ক্রমে সহজ হয়ে আসে। বিশ্বাস করি ব'লেই তো ভালবাসি—আর যদি ভালবাসতে পারলাম, তাহলেই তো আর কোনো ভয় নেই আমার, আমি তখন মুক্ত, নিঃসংকোচ এবং দায়হীন।

বসন্তদাস জানে যে তার আচরণ অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকছে। মায়াবতীর মাতুল দীনদাস বুদ্ধিমান লোক। তিনি প্রায় ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন কয়েকদিন। গ্রামের অন্যান্য লোকেদের কৌতূহলের ব্যাপারটাও তার অগোচর নয়। পিপ্পলী হাটের ঘটনাটি যেভাবে ত্রাস, এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, তাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু দর্শন মাত্র যে তারা অস্থির হয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি! সে জানে, ভিক্ষুদের সঙ্গে তার সংস্রব কেউই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু তার নিজেরও উপায় নেই।

মিত্রানন্দের লোক বারবার আসছে। প্রত্যেকবারেই তাদের ঐ এক কথা। আর সহ্য হয় না, তোমরা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দাও, আমরা যবন জাতিকে ডেকে আনতে চাই। প্রতিবার ওরা আসছে প্রস্তাব নিয়ে, আর প্রতিবারই বসন্তদাস তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। বলছে, এখনও সময় হয়নি, মিত্রানন্দকে ব'লো, সময় হলে আমিই সংবাদ দেবো।

মিত্রানন্দের লোকেদের সঙ্গে তাকে দীর্ঘ আলাপে বসতে হচ্ছে। বোঝাতে হচ্ছে, যবন জাতি বহিরাগত—তারা এলে তুমি আমি কেউ থাকবো না। আর জেনো, তারা শুধু রাজ্য জয়ই করছে না—ধর্মকে পর্যন্ত জয় করে নিচ্ছে। এ বড় চিন্তার কথা—এমতাবস্থায় আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমরা কী করবো। এক সন্ত্রাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যদি আমরা আরেক সন্ত্রাসের মধ্যে নিপতিত হই, তাহলে সেটা কোনো কাজের কথা নয়।

বসন্তদাসের কথায় ভিক্ষুরা নীরব থাকে। শুধু অপলক চক্ষুর স্থির দৃষ্টি মেলে রাখে বসন্তদাসের মুখের উপর। বসন্ত অনুমান করে তার যুক্তি শ্রোতারা গ্রহণ করছে না—কিন্তু তবু সে হতোদ্যম হয় না। যতোদিন পারে, ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিলম্বিত করতেই হবে। এ বিষয়ে সে আশাবাদী। কারণ মিত্রানন্দ তার সুহৃদ বন্ধু এবং সে বসন্তকে বিশ্বাস করে।

প্রতিদিন অপরাহ্নে সে নদীতটে ভ্রমণ করে। কখন যে ভিক্ষুরা আসবে তার স্থিরতা নেই। তাই তাকে নদীতটে আসতে হয়। তার চপল স্বভাব এখনও আছে। বালক ও কিশোরদের সঙ্গে সে একেকদিন ক্রীড়ায় মত্ত হয়। দণ্ডগুলি ক্রীড়ায় তার পারদর্শিতার কথা ইতোমধ্যে গ্রামের কিশোর ও বালকদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে। সুতরাং সে নদীতটে এলে বালকদের মধ্যে উল্লাস দেখা যায়।

আজ সে নদীতটে এসে দেখলো বালকেরা বিমর্ষ মুখে বসে আছে। কি সংবাদ? সে সন্ধান নিয়ে জানলো যে দ্বিপ্রহরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু মানুষের অনুদারতা এবং ক্রোধ সামান্য ঘটনাকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে পারে।

ঘটনাটি হাস্যকরও কিঞ্চিৎ। দ্বিপ্রহরে অভিরাম উপাধ্যায় স্নানে এসেছিলেন। তাঁর অবয়ব শীর্ণাকার, এবং মস্তকে একটি সুন্দর ইন্দ্রলুপ্তি বিরাজমান। তাঁর তৈলসিক্ত ইন্দ্রলুপ্তিটি কখনও কখনও দর্পণের কাজ করে। তিনি যখন নদীজলে নেমে প্রথম ডুবটি দিয়ে সূর্যস্তব আরম্ভ করেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণটি উচ্চারিত হয়েছে-কি-হয়নি—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং পর্যন্ত বলেছেন মাত্র, ঐ মুহূর্তে বালকদের দণ্ডপ্রহৃত গুলিটি তীরবেগে ছুটে এসে তাঁর মস্তকের ইন্দ্রলুপ্তিটিতে আঘাত করে। আঘাতটি তীব্র হওয়ায় ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং রক্তপাত হয়। উপাধ্যায় মহাশয় কুপিত হন, উপবীত হস্তে ধারণ করে বালকটি এবং তার চতুর্দশ পুরুষকে অভিসম্পাত করেন। তাতেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না, বালকটিকে তিনি ধরে নিয়ে যান নিজ গৃহে। সেখানে তাকে যথেচ্ছ প্রহার করা হয়। ঘটনার সেখানেই সমাপ্তি হয়নি, শোনা যাচ্ছে, বালকটির পিতাকে ব্রাহ্মণরক্তপাতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বসন্তদাস মলিনমুখ বালকদের কোনোরূপ সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ বিষয়টি অতিশয় স্পর্শকাতর। সে বহিরাগত, তার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ঘটলেই ব্যাপারটি ভিন্ন আকার ধারণ করবে। সে বালকদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ভাসমান নৌকাগুলির দিকে অগ্রসর হলো।

বসন্তদাস বলিষ্ঠ, তায় যুবাপুরুষ। পুনর্ভবাতীরের উচ্চ ভূমিতে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার উন্নতদেহের প্রতিচ্ছায়া নদীবক্ষে এসে পড়েছিলো। পুনর্ভবার স্রোতে জল এখন

গৈরিক বর্ণ। উত্তরদেশে সম্ভবত কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে—তাই জলের ঐ রূপ। ঐ গৈরিকবর্ণের জল এখন কিছুদিন ক্রমান্বয়ে আসতেই থাকবে।

নদীতীরে একত্রে একটি ক্ষুদ্র নৌবীথি ভাসমান। নৌকাগুলিতে নানান পণ্যসম্ভার। সম্ভবত এরা এখানে রাত্রিযাপন করবে। রাত্রিকালে দস্যুর ভয়, তাই এই ব্যবস্থা। বসন্তদাসের হাসি পায়, মানুষ বড়ই সহজ সরল। পথে দস্যু যা হস্তগত করে সে আর কতটুকু! পক্ষান্তরে যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ গৃহেই অপহৃত হয়ে চলেছে তারা। গ্রামপতি নেয়, রাজপুরুষেরা নেয়, ব্রাহ্মণেরা নেয়, কায়স্থেরা নেয়—কে তাদের শ্রমলব্ধ উপার্জনের অংশ নেয় না? আশ্চর্যের বিষয়, এই চিন্তাটুকু মানুষ করতে চায় না।

সে ঐ সময় শুনলো, নৌকার এক বণিক ডাকছে, মহাশয় কি এই গ্রামবাসী?

কেন? কি প্রয়োজন? বসন্তদাস ঘুরে দাঁড়ায়।

না, জানতে চাইছিলাম। বণিকটি ইতস্তত ক'রে বলে, এই নদীতীর নিরাপদ তো? দস্যুবৃত্তি হয় না তো?

বসন্তদাস হাসে। বলে, আপনি বড় কৌতুকের কথা বললেন, আমি এই গ্রামবাসী আর আমাকেই জিজ্ঞাসা করছেন, আমি দস্যুবৃত্তি করি কি না?

না না, আমি তা বলিনি, লোকটি অতিশয় বিব্রত বোধ করে।

আপনারা এখানে নির্ভয়, বসন্তদাস তাদের আশ্বাস দেয়। বলে, এ গ্রামে কোনো দস্যু নেই—তবে আপনারা কি অধিক দূর যাবেন?

না মহাশয়, আমরা নবগ্রাম হাটে যাবো। পথিমধ্যে শুনলাম ওদিকে নাকি রাজার সৈন্যদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে—কি ঘটনা, এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি কোনো সংবাদ জানেন?

নিকটবর্তী নবগ্রামেও কি কোনো ঘটনা ঘটেছে? বসন্তদাস স্মরণ করার চেষ্টা করে। না, এমন কোনো ঘটনার কথা সে শোনেনি। তার একবার মনে হলো, পিপ্পলী হাটের ঘটনাটি বর্ণনা করে। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তা করে, কি প্রয়োজন অহেতুক নিরীহ লোককে চিন্তাগ্রস্ত ক'রে? সে বলে, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন এখানে সকলই নিরাপদ।

নিরাপদ হলেই ভালো, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সামান্য কিছু উপার্জন করতে পারলেই গৃহের সন্তান গৃহে ফিরে যেতে চাই—আপনি আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন, আপনাকে ধন্যবাদ।

লোকটি হয় ভয়াতুর নতুবা বাচাল। হয় ভয়, নয় তোষণ। এছাড়া কি মানুষের স্বাভাবিক আচরণ হতে পারে না? বসন্তদাস বিরক্ত হয় লোকটির অতিমাত্রায় শিষ্ট আচরণ দেখে। তার মনে হয়, এ তো দাসের আচরণ? কতোকাল মানুষ কেবলি দাসত্ব করে যাবে? মনুষ্যজন্মের অর্থই কি দাসত্ব? ভয় আর সন্ত্রাস কি চিরকাল মানুষকে দাস করে রাখবে? এরা কি বারেকের জন্যেও সংঘবদ্ধ হতে পারে না? বোঝে না কি যে সংঘবদ্ধ বাহুবল কি বিপুল ও প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করতে পারে?

বারবার প্রশ্নটি তার মনে আলোড়িত হতে থাকে।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। দূরে বেণুধ্বনি শোনা যায়। বসন্তদাসের নিজ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হয়। পূর্বদেশের গ্রামগুলিতে সে ভ্রমণ করেছে বন্ধু মিত্রানন্দের সঙ্গে, প্রাচীন পুণ্ড্রনগরীতেও সে গিয়েছিলো—সর্বত্রই তার এক অভিজ্ঞতা। রাজশক্তি প্রজাপীড়ন ছাড়া অন্য কাজে কোথাও ব্যবহৃত হয় না। এই রাজশক্তি যে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল, এ সত্য কেউ স্বীকার করে না। তারা শুধু মহারাজ লক্ষণ সেন দেবের হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী এবং পদাতিকের সংখ্যাটি দেখতে পায়, আর কিছু দেখতে পায় না।

ঐ সময় সে একটি বালককে দ্রুত ছুটে আসতে দেখলো। বালকটি দ্রুত নিকটে এসে জানালো, আপনি এখানে? ওদিকে আপনার সন্ধান করা হচ্ছে।

কেন? বসন্তদাস অবাক হয়।

সামন্ত হরিসেনের গৃহ থেকে দু'জন প্রহরী এসেছে—তারা আপনাকে সামন্ত গৃহে নিয়ে যেতে চায়।

বসন্তদাস চমকিত হলো। কিন্তু বালকটিকে সে বুঝতে দিলো না। বললো, তুমি গৃহে যাও, আমার সঙ্গে যে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে এ কথাটি প্রকাশ ক'রো না।

অতঃপর বসন্তদাস? নিজেকে প্রশ্ন করে সে। ঘনায়মান অন্ধকার, নদীর ছলোচ্ছল স্রোতধারা এবং নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে কয়েকবার এবং নিজেকে বলে, এইবার তাহলে তোমাকে জীবনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে—তুমি না সংঘর্ষ চাইতে না?

তুমি না হিংসা প্রতিহিংসা উভয়ের নিবৃত্তি চেয়েছিলে? বলেছিলে, যবন জাতিকে আমন্ত্রণ জানানো অনুচিত—এখন তুমি কী করবে?

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো। বসন্তদাস স্থির করলো, আপাতত সে পুনর্ভবার পরপারে আশ্রয় নেবে। না, হরিসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো বাসনা তার নেই। ঐ সময় আকাশের নক্ষত্রমালায় সে প্রিয়তমা পত্নী মায়াবতীর মুখখানি দেখতে চাইলো, কিন্তু দেখলো, শুধু মায়াবতী নয়—আরও একটি মানবীর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে। সে বুঝলো, বালগ্রামের মন্দিরদাসী কৃষ্ণাকে বিস্মৃত হওয়া অতো সহজ নয়।

নবগ্রাম হাট থেকে শ্যামাঙ্গ উর্ধ্বশ্বাসেই পলায়ন করেছিলো। নিশ্চয়ই পলায়ন সেটা। তোমার নিজের অনিচ্ছায়, ভীত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে, দ্রুত স্থান ত্যাগ করাকে আর কি বলা যায়? নিশ্চয়ই তাকে পলায়ন বলতে হবে। শ্যামাঙ্গ পথ ভুল করে। ঐ সময় তার

দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকবার কথা নয় এবং ছিলোও না। সে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। পথ ছিলো বনভূমির মধ্য দিয়ে। ঐ বনভূমিরই মধ্যে এক পল্লীতে রাত্রিবাস ক'রে সে তার যথাসর্বস্ব হারায়। শুনেছিলো সে যে বনভূমির পল্লীগুলিতে দস্যুদের বাস। তবু ঈশ্বরের কাছে সে কৃতজ্ঞ যে দস্যুরা তার প্রাণ হরণ করেনি। করতে পারতো—সাধারণত করাই নিয়ম—কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, তার ক্ষেত্রে ঐ ব্যতিক্রমটি ঘটেছে।

কপর্দকহীন অবস্থায় সে বনভূমিও অতিক্রম করে। দেখে যে রাত্রিকালই বরং ভ্রমণের জন্য অধিকতর নিরাপদ। ব্যাঘ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু বরাহ ভল্লুক ইত্যাদির সঙ্গে কয়েকবারই তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে। দেখেছে, মানুষের চাইতে পশু সত্যিই কম বিপজ্জনক।

যে বর্ধিষ্ণু গ্রামটিতে প্রথম এবং সাদর আপ্যায়ন পায় তার নাম কুসুম্বী। সেখানে সে কয়েকদিন অবস্থান করে। গৃহস্থ ছিলেন কুম্ভকার—সুতরাং দরিদ্র হলেও কর্মের বিনিময়ে তারা তাকে উত্তম আশ্রয় দেয়।

সে তখন অনন্যোপায়। তাকে কিছু উপার্জন করতে হবে। তারপর তাকে আবার গৃহে প্রত্যাগমনের চেষ্টা করতে হবে। তার এখন মনে হয়, গুরু বসুদেব সম্ভবত এই সকল পরিস্থিতির জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। তার হাসি পায় নিজের অবস্থা দেখে। আসলেই সে মূর্খ। যে শক্তি সমগ্র সংসারে বিস্তৃত, সেই শক্তির প্রতিকূলে সে যেতে চেয়েছে কোন সাহসে? তার শক্তি কোথায় যে সুধীমিত্রের মতো সামন্তপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে? ধর্ম আছে, শক্তি আছে, সংস্কার আছে—সে নিজ ইচ্ছায় চলতে চাইলেই হলো? নীচ দস্যুর কাছে যে কৃপার পাত্র—তার আবার শিল্পী হবার সাধ?

কুসুম্বীতে অধিকাংশই ক্ষেত্রকর। এখানে ভূমি প্রায়শঃ সমতল এবং নদীতীরবর্তী বলে বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকে আর্দ্র ও উর্বরা। গৃহস্থরা ধনশালী না হলেও প্রায় সকলেই সম্পন্ন। সুতরাং শ্যামাঙ্গকে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করে না কেউ। তদুপরি সে কর্মবিমুখ নয়—কুম্ভকারের কাজগুলি সে যত্নসহকারেই নিষ্পন্ন করে। মনোহরদাস বৃদ্ধ হয়েছেন, সকল কাজ তাঁকে দিয়ে হয় না। ওদিকে আবার তাঁর পুত্রটি রত্নবিশেষ। বুদ্ধিতে বাতুলপ্রায়—এবং শ্রমকাতর। অথচ এই সময়ই কুম্ভকারদের উপার্জনের কাল, দূরে-অদূরে মেলা হচ্ছে, তৈজসাদি যতো অধিক নির্মিত হবে ততোই উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। মনোহরদাস চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এমন সময় শ্যামাঙ্গকে পেয়েছেন তিনি। তাঁর আশা, শ্যামাঙ্গ যদি তাঁর কাছে থাকে, তাহলে এ বৎসর ভালো উপার্জন করবেন। তাই তিনি শ্যামাঙ্গকে স্নেহ প্রদর্শন করতে কখনও কার্পণ্য বোধ করেন না। কিন্তু শ্যামাঙ্গের আচরণ লক্ষ্য ক'রে মনে তাঁর শঙ্কা জাগে। মনে হয় তরুণটি অত্যধিক রহস্যময়। একেকদিন দিগন্ত পানে এমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যে ডাকলেও উত্তর পাওয়া যায় না। কিংবা বালখিল্য পুত্তলি নির্মাণের সময় এমন অভিনিবেশসহকারে সে কাজ করে, যে না দেখলে বিশ্বাস হবার কথা নয়। মনোহরদাস অবাক হন, একটিমাত্র পুত্তলি গঠনেই সে দণ্ডাধিককাল ব্যয় করে। তবে হ্যাঁ—যা করে সে, তার

তুলনা হয় না। মৎস্য হোক, গোয়ালিনী হোক, মৃৎশকট হোক, পক্ষী হোক—বড় সুন্দর পুত্তলিগুলি।

শ্যামাঙ্গ যেদিন কর্ম থেকে অবকাশ প্রার্থনা করলো সেদিন মনোহরদাস বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হলেন। বারবার জানতে চাইলেন—বৎস, আমরা জানি তোমাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করতে হবে—কিন্তু তবু এখানে কি তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে, বলো?

না না, এ আপনি কি বলছেন, শ্যামাঙ্গ বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে। বলে, আপনার কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে, সে কথা কি বিস্মৃত হওয়া সহজ, আপনিই বলুন?

সে বৃদ্ধকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে অন্যকিছু নয়—সে পার্শ্ববর্তী গ্রাম উজুবটে যাবে—সেখানে তার বন্ধু আছে কয়েকজন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সাক্ষাৎ করেই পুনরায় চলে আসবো, শ্যামাঙ্গ বৃদ্ধকে জানায়। বলে, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার দ্বারা আপনার কোনোরূপ ক্ষতি আমি হতে দেবো না।

হ্যাঁ, উজুবটেই যাবে সে। দু'জন যোগীর সঙ্গে অতি সম্প্রতি তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পশ্চিমদেশাগত—সে উজুবট যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। সঙ্গী যোগীটি প্রকৃতই যোগী, সকল ব্যাপারেই তার সীমাহীন অনাসক্তি। সঙ্গীর উজুবট গ্রামে যাবার আগ্রহ দমন করে রেখেছে সে অদ্ভুত কৌশলে। এতকাল বলে এসেছে উজুবট বহুদূর। সে এখন সে কথা বলতে পারে না, কেননা আগন্তুক যোগী স্থানীয় ভাষা বিলক্ষণ বুঝতে শিখেছে। সে এখন বলে, উজুবটের গ্রামপতি এবং তার অনুচরেরা ভয়ানক যোগীদ্বেষী, একবার যদি আয়ত্তের মধ্যে পায়, তাহলে আর রক্ষা নেই।

শ্যামাঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় যোগীটি প্রথম বুঝতে পারে যে, তার সঙ্গীটি তার সঙ্গে এতকাল চাতুরী করে এসেছে। সে শ্যামাঙ্গকে ক্রমান্বয়ে অনুরোধ করতে থাকে। জানায়, উজুবটে তার একজন গুরু অবস্থান করছেন—তাঁর কাছে একটি সংবাদ অবশ্যই উপস্থিত করতে হবে—ইতোমধ্যেই অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে তার।

শ্যামাঙ্গের মনেও একটি বাসনা ছিলো। তার বিপদগ্রস্ত অনিশ্চিত অবস্থায় বাসনাটি প্রবল হতে পারেনি—বলা যায়, সুপ্ত অবস্থাতেই বিরাজ করছিলো। কিন্তু যেই তার অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, অমনি সে উজুবট গ্রাম সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে দিলো। ঐ সময়ই সে নিজের মনের একটি দিক আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার ধারণা ছিলো মায়াবতীর মাতাকে দেখবার জন্যই সে উজুবট যাবে। তাঁর মাতৃময়ী মূর্তিটি তার মনে বারবার আসছিলো। এই প্রকার যখন তার মানসিক অবস্থা, ঐ সময়, একদিন মনোহরদাস একটি পুত্তলি তার হাতে এনে দিলেন। জানতে চাইলেন, এইটি কি তোমার গঠন?

কেন, কি হয়েছে? শ্যামাঙ্গ ঈষৎ শঙ্কা বোধ করে, কারণ মনোহরদাসের মুখ অতিশয় গম্ভীর ঐ সময়।

মনোহরদাস জানায়, এ কি গোয়ালিনী মূর্তি হয়েছে, তুমিই বলো?

শ্যামাঙ্গ তখন মনোযোগী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এবং চকিতেই বিমূঢ় হয়ে যায়। এ কে? এ কার মূর্তি? ক্ষুদ্র পুত্তলি—কিন্তু ভঙ্গিটি অবিকল ধরা পড়েছে—রমণীর গমনভঙ্গি ওটি—দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ, গ্রীবাটি ঈষৎ বঙ্কিম, দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত। রমণীটিকে এবং নিজ মনের একটি দিক একত্রে আবিষ্কার করে সে মরমে মরে গেলো। ছি ছি—এ কোন চিত্র তার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য? এ তো অবিকল লীলাবতী, উজুবট গ্রামের লীলাবতী!

সে মনোহরদাসকে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি পুত্তলিগুলি বিনষ্ট করতে হবে?

না, তা নয়, চিন্তিত মুখে বলেন মনোহরদাস, পুত্তলি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে, আমার চিন্তা হচ্ছে, এই পুত্তলি অধিক সংখ্যায় বিক্রয় হবে কিনা—ক্রেতারা তো গোয়ালিনী চাইবে তোমার কাছে—এ কি গোয়ালিনী? যদি গোয়ালিনী না হয়, তাহলে বলো, এর নাম কি দেবে? মালিনী?

নাম? শ্যামাঙ্গ এই দিকটি কখনই চিন্তা করেনি। সে বললো, নাম যে কুলসূচক হতেই হবে, এমন কি কোনো বিধান আছে? নাম তো ব্যক্তির পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র। যে কোনো নাম দিলেই হয়।

বলো, কি নাম দেবে? মনোহরদাস আগ্রহভরে শ্যামাঙ্গের মুখপানে চান।

শ্যামাঙ্গের মনে তখন একটি নামই উচ্চারিত হচ্ছে। বললো, ওর নাম দিন লীলাবতী!

লীলাবতী! মনোহরদাস ক্ষণেক চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, উত্তম—তাই হোক, এই নতুন পুত্তলির নাম হোক লীলাবতী।

শ্যামাঙ্গ মনোহরদাসকে সন্তুষ্ট করলো বটে, কিন্তু নিজ বিবেকের নিকট সে অপরাধ বোধ করতে লাগলো। নিজ মনের এ কি রূপ দেখছে সে? কখন লীলাবতী এমনভাবে তার মানস লোকে স্থান করে নিয়েছে, সে জানতেও পারেনি। শোণিত ধারার প্রবাহ কি মানুষ জানতে পারে? লীলাবতী কি তাহলে তার শোণিত ধারার মধ্যে মিশে গিয়েছে? সে কি মিশেছে তার শ্বাসে-নিঃশ্বাসে? তার স্বপ্নে? কল্পনায়?

ছি ছি, এ কী হলো? ধিক তোকে শ্যামাঙ্গ? শতবার ধিক তোকে—বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!

নিজেকে শ্যামাঙ্গ ধিক্কার দেয়। হ্যাঁ বিশ্বাসঘাতকতাই তো সে করেছে। লীলাবতীর কাছে সে না প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে যে তার স্বামী অভিমন্যু দাসকে এনে দেবে? আর সে নিজেই কিনা হয়ে পড়লো আসক্ত? ছি ছি, ছি ছি, শ্যামাঙ্গ বিবেক দংশনে অস্থির হয়ে ওঠে।

কিন্তু এসবই বালির বাঁধ—ক্ষণে থাকে, ক্ষণে থাকে না। বরং ঐ প্রকার বিবেক দংশন তার আবেগকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করে তুললো। যোগীটির পীড়াপীড়ি উপলক্ষ মাত্র—এমনকি মায়াবতীর মাকে প্রণাম করার ইচ্ছাটিও উপলক্ষ বই অন্য কিছু নয়। সে যোগীটির সঙ্গে উজুবটের দিকে যাত্রা করলো।

পথে দু'জনায় নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ। উজুবট গ্রামে কোনো সিদ্ধা বা যোগী আছে এমন সংবাদ শ্যামাঙ্গ পূর্বে কখনও পায়নি। শুনলো, ঐ গ্রামে যোগী গুরু সিদ্ধপা অবস্থান করছেন। সিদ্ধপা অসাধারণ শক্তিমান যোগী—যোগবলে তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। চক্ষুর নিমেষে তিনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন, সর্প-মারী-ভয় তাঁকে দেখে শতহস্তেন দূরাৎ পলায়ন করে—আরও আশ্চর্য, আকাশচারী দেবগণ পর্যন্ত অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর উপর দিয়ে গমনাগমন করতে পারেন না—তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত।

নির্জন পথের সঙ্গী দীর্ঘ পথক্রমণকালে স্বভাবতই বন্ধু হয়। তদুপরি যাত্রা যদি হয় পদব্রজে, তাহলে তো কথাই নেই—শয়ন গৃহের বিশ্রম্ভালাপের বিবরণ পর্যন্ত পরস্পরের নিকট অজানা থাকে না। যোগীটি নিজ গুরুর প্রশস্তি আরম্ভ করে। এবং ঐ প্রসঙ্গেই নানান বিষয় এসে যায়। যেমন পশ্চিম দেশে মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে। এক যবন দলপতি রাজপুরুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে—রাজা কোথায়, কেউ জানে না। এই যবন জাতি অশ্বারোহণে অত্যন্ত দ্রুতগতি—আর অস্ত্রচালনায় যন্ত্রবৎ। হিংস্রতায় একেকজন যমের অনুচর। তাদের রক্তপিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না এবং নরমুণ্ড দিয়ে তারা গেণ্ডুয়া খেলে থাকে।

শ্যামাঙ্গ এই যবন জাতি সম্পর্কে শুনেছিলো শুকদেব ও দীনদাসের কাছে। শুনেছিলো এদের মধ্যে একশ্রেণী আছে যারা সজ্জন এবং বিনয়ী। সে বললো, কিন্তু আমি তো শুনেছি যবনেরা ভদ্র, বিনয়ী এবং সজ্জন, তারা কি সত্যিই নিষ্ঠুর?

যোগীটি ঐ কথায় হাসে। বলে, আপনাকে কি বলবো, স্বচক্ষে দৃষ্ট ঘটনাকে তো আর মিথ্যা বলতে পারবো না—মহানন্দা তীরবর্তী দুইখানি গ্রাম তারা ধূলিতে মিশিয়ে দিয়েছে। আপনাদের প্রত্যয় হয়তো হবে না, কিন্তু অপেক্ষা করুন, স্বচক্ষেই দেখবেন—ওরা এদেশেও আসছে।

সে কি? শ্যামাঙ্গ অবাক হয়ে যায়। মুখে বাক্য নিঃসৃত হয় না। পক্ষ দুই আগে শুকদেব যে বলেছিলেন কোনো ঘটনাই কার্যকারণ ব্যতিরেকে ঘটে না—তাহলে যবন জাতির আগমনের এইটিই কি তাৎপর্য? সে বলে, আপনি কি প্রকৃত সংবাদ জানেন যে যবনেরা পুনর্ভবার পূর্বতীরেও আসছে?

যোগী ঐ কথার উত্তরে সহসা কিছু বলে না। পরে জানায়, বন্ধু শ্যামাঙ্গ, যদি চক্ষু উন্মীলিত রাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এদেশে সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা আমরা আবাল্য দেখে আসছি—উপরন্তু এখন আরম্ভ হয়েছে প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার। রাজশক্তি প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা তো করেই না, বরং রাজশক্তির অত্যাচার এবং নিগ্রহে প্রজাপুঞ্জের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। বহিরাগত যবন জাতি বিভিন্ন স্থানে এখন কেন্দ্র স্থাপন করেছে—সদ্ধর্মী ভিক্ষুরা প্রতিদিন তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করছে ঐ সকল কেন্দ্রে। আর প্রতিদিনই তারা অগ্রসর হয়ে আসছে। তুমি শুনলে অবাক হবে যে তোমাদের এই অঞ্চল থেকেও একজন ভিক্ষু ঐরূপ একটি তুর্কি কেন্দ্রে গিয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক, শ্যামাঙ্গ ক্রুদ্ধ মন্তব্য করে।

বন্ধু উত্তেজিত হয়ো না, সকল কর্মের নিজস্ব যৌক্তিকতা থাকে—ঐ ভিক্ষুটিও সম্ভবত তার কর্মের যৌক্তিকতা দেখাতে পারবে। শুনতে পেয়েছি তঙ্গনকূলের তুর্কি কেন্দ্র থেকে এই পক্ষকালের মধ্যেই একটি অশ্বারোহী দল উজুবট গ্রাম অভিমুখে আগমন করবে।

কেন, সেখানে কি হয়েছে? শ্যামাঙ্গ উদগ্রীব হয়ে জানতে চায়।

জানি না, যোগীটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। বলে, আমি এই সংবাদটিই গুরু সিদ্ধপার কাছে জানাতে চাই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অবশেষে উজুবটে প্রবেশ করে শ্যামাঙ্গ। সঙ্গে যোগীটি থাকায় পথিমধ্যে সকলেই তাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত করছিলো। কিন্তু শ্যামাঙ্গের সেদিকে মনোযোগ ছিলো না। সে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। দ্রুত পদক্ষেপে সে অগ্রসর হচ্ছিল। মনে কেবল একটি চিন্তা, কখন শুকদেবের গৃহে সে উপনীত হবে।

শুকদেবের গৃহ নীরব। বেলা দ্বিপ্রহর, কিন্তু জনমানব কোথাও আছে বলে মনে হয় না। সে ক্ষণেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। তাতে বিচিত্র একটি ভাব তার উপলব্ধি হয়। মনে হয়, নীরব পল্লীটিতে বিষাদ এবং হতাশা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তার কাছে পরিবেশটি অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য লাগে। সে একটি রাখাল বালককে ডাকলো। বালকটি সংবাদ দিতেই শুকদেব বাইরে এলেন। ক্ষণেক পর দীনদাসকেও দেখা গেলো। যোগীটিকে দেখে দীনদাস বিরক্ত হয়েছেন ব'লে মনে হলো। বললেন, যোগী মহাশয় কি এই গ্রামেই অবস্থান করবেন?

শ্যামাঙ্গ অবাক হয়। দীনদাসের ব্যবহার তো পূর্বে কখনও রূঢ় দেখেনি সে? এই অল্প ক'দিনে এমন কী ঘটলো যে—

মহাশয়, শুকদেব জানান, আপনি বরং অন্য পল্লীতে যান, আমরা এই পল্লীবাসীরা, বর্তমানে বিপদগ্রস্ত আছি।

দু'জনের কেউই শ্যামাঙ্গকে কিছু বলেন না।

শ্যামাঙ্গ বিমূঢ় এবং হতবাক। এমন আচরণ কেন করলেন এঁরা? কী বিপদ এঁদের যে বহিরাগত একজন সংসার ত্যাগী যোগীপুরুষকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না? শ্যামাঙ্গ

অধিক বাক্য ব্যয় আর করলো না। যোগীগুরু সিদ্ধপাকে কোথায় পাওয়া যাবে—শুধু এই সন্ধানটুকু সে প্রৌঢ় দু'জনের কাছে জানতে চাইলো।

দীনদাস সম্মুখে হাত তুলে নির্দেশ করলেন, ঐ যে, ঐ গৃহে যাও।

শ্যামাঙ্গের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঐ গৃহ তো লীলাবতীদের। ঐ গৃহে যে একজন সিদ্ধ যোগী থাকেন—এ সংবাদ তো কেউ তাকে পূর্বে দেয়নি।

সঙ্গী যোগীটি নির্দিষ্ট গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো। শ্যামাঙ্গকে শুধু বললো, আমি গুরুদেবের কাছে যাই।

দীনদাস জানতে চাইলেন, এই লোকটি লীলাবতীর মাতুলের কাছে কেন এসেছে, জানো?

শ্যামাঙ্গ বুঝতে পারে, লীলাবতীর মাতুলই তাহলে যোগী সিদ্ধপা। বলে, না আমাকে সে কিছু বলেনি, শুধু জানি, সে সিদ্ধপা'র শিষ্য এবং তার নিবাস পশ্চিমে।

যোগমায়া সম্মুখে এলে শ্যামাঙ্গ তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। সে লক্ষ্য করে, মাতার মুখখানি বিষাদময়।

সে জানতে চাইলো, মাতঃ, মায়াবতীকে যে দেখছি না।

ঐ কথায় যোগমায়ার রুদ্ধ আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠলো। বললেন, হতভাগিনী বাইরে আসবে না বৎস, তার বড় দুর্ভাগ্য এখন।

অতঃপর যোগমায়াই বললেন—খণ্ডে খণ্ডে, ইতস্তত, পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন, তবু তিনি বললেন, আর তিনি বললেন বলেই শ্যামাঙ্গ ঘটনাগুলি জানতে পারলো।

বৎস, বড় দুর্ভাগ্য আমাদের; জামাতার সন্ধানে প্রতিদিন সামন্ত হরিসেনের গৃহ থেকে দু'জন ক'রে লোক আসছে—জামাতা গৃহত্যাগ করেছে—কবে ফিরবে, কিছুই বলা যায় না। এদিকে আবার বালকদের খেলাধুলার সময় দণ্ডগুলির একটি গুলি মস্তকে লেগে এক স্নানার্থী ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটায় ভয়ানক একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এ স্থানে—এ পল্লীতে ভিক্ষু আর যোগীদের সন্ধান করছে গূঢ়পুরুষেরা—কী অঘটন ঘটবে ভবিষ্যতে, কে জানে—আমরা সম্মুখে অন্ধকার দেখছি, তুমি বৎস, বড় দুর্দিনে এলে।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না মাতঃ, শ্যামাঙ্গ জানায়, দুর্দিন সুদিন উভয়ই আমার কাছে একরূপ।

লীলাবতী গৃহদ্বার থেকে যোগীটিকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলো। মাতুল শিষ্যকে দেখে প্রীত হলেন। অতঃপর দু'জনে একটি কক্ষে প্রবেশ ক'রে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। লীলাবতীর কৌতূহল হয়েছিলো সামান্য—হয়তো সে ঐ দু'জনের আলাপ শুনবার চেষ্টাও করতো—কিন্তু ঐ সময়ই সে মায়াবতীদের গৃহদ্বারে শ্যামাঙ্গকে দেখতে পায়। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বিচিত্র একটি স্পন্দন অনুভব করে নিজ রক্তধারায়। ফলে তার ক্রোধ হয়। নিজের উপর, না শ্যামাঙ্গের উপর তা অবশ্য সে স্থির জানে না। কিন্তু ইচ্ছা হয়, একবার লোকটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে। সে জানে, শ্যামাঙ্গের সম্মুখীন হওয়ার আর তার প্রয়োজন নেই। কারণ আম্রপট্টলীর যে সংবাদ জানবার জন্য শ্যামাঙ্গকে তার প্রয়োজন

ছিলো, সেই সংবাদ তো তার মাতুল এনে দিয়েছেন। অভিমন্যু দাস আম্রপট্টলীতে নেই, সে সামন্ত হরিসেনের সেনাদলে যোগ দিয়েছে। সুতরাং কোন যুক্তিতে সে এখন শ্যামাঙ্গের সম্মুখীন হবে? লীলাবতী বার দুই শ্যামাঙ্গকে দূর থেকে দেখলো। আর দুইবারই তার মনে হলো, লোকটা প্রতারক, ভণ্ড এবং কাপুরুষ।

লীলাবতী মায়াবতীদের গৃহে এলো অপরাহ্ণে। তখনও মায়াবতী ভূমিতে শয়ান। লীলাবতীকে দেখে বললো, আয় এখানে উপবেশন কর।

লীলাবতীর ক্রোড়ে মাথাটি রেখে মায়াবতী কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললো, সখী, এ আমার কি হলো?

লীলাবতী সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। স্বামীর সুখে বড় সোহাগিনী হয়েছিলো মায়াবতী। সেই স্বামী তার হারাবার উপক্রম হয়েছে। এই অবস্থায় সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করার কি কোনো অর্থ হয়?

সে বলতে পারে, সখী দুশ্চিন্তা করিস না, তোর স্বামী অবশ্যই ফিরে আসবে—কিন্তু কথাটা কি সত্যি হবে? কে না জানে, বসন্তদাস ভিক্ষুদলের লোক। তাকে সন্ধান করে ফিরছে হরিসেনের লোকেরা। এ অঞ্চলে কোথাও দেখতে পেলেই ওরা বসন্তদাসকে বন্দী করবে। আর একবার ওদের হাতে বন্দী হলে কোনো লোক অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে, এমন সংবাদ কারও জানা নেই।

লীলাবতী সখীর মাথায় হাত রাখে, তার রুক্ষ কেশদামে অঙ্গুলি চালনা করে পরম মমতা ভরে। তার মনে হয়, জীবন বোধহয় এইরূপই—খণ্ডিত, বিকৃত, প্রতারণাময় এবং হিংস্র। সুখী সংসার ব'লে জগতে কিছু আছে বলে তার মনে হয় না। সংসারে সুখনীড় রচনা করবার কথা তার, কিন্তু ঘটনা এমন ঘটলো যে, সংসারই তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো—অথচ তার কোনো অপরাধ ছিলো না। আর সখী মায়াবতী! ক'দিন পূর্বেও যে ছিলো সংসারবৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুমটি, আজ দেখো, তার কী অবস্থা, সে কেমন ধূলিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে—তারও কোনো অপরাধ নেই, তাহলে?

সে বললো, সখী, কাঁদিস না—জীবন বিরূপ হয়ে উঠেছে ব'লে কি তুই তাকে পরিত্যাগ করবি? বরং ওঠ তুই, আয় আমরা শেষ অবধি দেখি, জীবন আমাদের জন্য কিছু দান করতে পারে কি না।

কথা দু'টি সে বললো এই জন্য যে এ ছাড়া তার বলবার কিছু ছিলো না। নিজের অতীত বর্তমান সে একত্রে দেখতে পাচ্ছিলো। এক অদৃশ্য বিধানের নিগড়ে আবদ্ধ সবাই। কেবলি ভয়, কেবলি নিষেধ, কেবলই হতাশা। পিতৃগৃহে দেখছে, স্বামীগৃহে দেখছে, মাতুলালয়ে দেখছে—সর্বক্ষেত্রেই জীবন পিষ্ট, সঙ্কুচিত এবং বিবর্ণ। আশা করার কিছুই নেই কারও—কেননা আশা কখনই ফলবতী হয় না। সুতরাং কেবলই চেষ্টা, কোনো প্রকারে যেন বেঁচে থাকা যায়—জীবনের ধর্মে পারা যায় না, সহজ স্বাভাবিকতায় পারা যায় না, কিন্তু তবু বাঁচতে হবে—কৌশলে হোক, ছলনা করে হোক, আত্মপ্রতারণা করে হোক। এমন ক্লান্তিকর দীর্ঘ প্রক্রিয়ার নামই কি তাহলে জীবন? সে চিন্তা করে কূল পায় না।

সন্ধ্যাকালে নদীতীরে শ্যামাঙ্গ লীলাবতীর সাক্ষাৎ লাভ করলো। লীলাবতী তার মেষ শাবকটি নিয়ে গৃহে ফিরছিলো। বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে শ্যামাঙ্গ ডাকলো, লীলাবতী!

লীলাবতী ঐ ডাক শুনে স্থির হলো মুহূর্তেক, পরক্ষণেই আবার সে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে চললো। শ্যামাঙ্গের ডাক সে উপেক্ষা করতে চায় ব'লে মনে হলো। শ্যামাঙ্গ আবার ডাকলো, লীলা—আমি আপনার সঙ্গে দু'টি কথা বলতে চাই।

লীলা এবার দাঁড়ায়—এটিও বৃক্ষতল, এবং নিবিড় ছায়া এখানে।

আমি দুঃখিত লীলা, আম্রপট্টলী গ্রামে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

কেন? লীলাবতী কুণ্ঠাবনত পুরুষটির মুখ পানে চায়।

পথিমধ্যে দস্যু আক্রান্ত হয়ে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি।

আহা! দুঃখের কথা! লীলা ক্ষুদ্র মন্তব্য করে।

আপনি বিদ্রূপ করতে পারেন, কিন্তু আমি যা বলছি, তার কণামাত্র মিথ্যা নয়।

আর কি কোনো কথা আছে সত্যবাদী পুরুষটির? লীলাবতীর কণ্ঠস্বর এবার গম্ভীর এবং অবিচলিত। জানায়, আমার কাজ আছে, গৃহে আজ অতিথি।

লীলা পদক্ষেপণ করলে শ্যামাঙ্গ বলে, আপনি কোন কারণে আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন জানি না, তবে একটি কথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করি—আমি আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা অবশ্যই পালন করবো।

লীলা আপন মনে যেন হাসে। অতঃপর জানায়, উত্তম কথা, আপনার ভবিষ্যৎ চেষ্টার জন্য পূর্বাহ্নেই ধন্যবাদ। তবে জেনে রাখুন, যাঁর সন্ধানে আপনি যাবেন, তিনি এখন সেখানে নেই—তিনি সামন্ত হরিসেনের বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন—কি, পারবেন সেখান থেকে তাঁকে আনতে?

শ্যামাঙ্গের বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন এই ক্ষোভ। লীলাবতীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কথা তাকে বিলক্ষণ বিদ্ধ করলে সেও লীলাবতীকে জানায়—তাহলে তো আপনি এখন রাজপুরুষের গৃহিণী—আমাদের ভক্তি ও ভয় উভয়ই আপনার প্রাপ্য।

হ্যাঁ, আপনার দেখছি বুঝবার ক্ষমতাটি তীক্ষ্ণ—এখন থেকে বুঝে কাজ করবেন।

সে না হয় করবো, শ্যামাঙ্গ যেন সম্মত হয়। তারপর বলে, কিন্তু একটা কথা কি শুনেছেন?

না বললে কেমন করে শুনবো?

তাহলে শুনুন, অতি শীঘ্রই দুর্ধর্ষ এবং হিংস্র যবন জাতি এদেশে আসছে, ওরা এলে কিন্তু রাজপুরুষদের সত্যি সত্যিই যুদ্ধ করতে হবে—সে বড় কঠিন কাজ হবে তখন।

লীলাবতীর স্বরে আর বিদ্রূপ ধ্বনিত হয় না। সে ধীর পদে কাছে এগিয়ে আসে। বলে, এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন? সত্যি সত্যিই কি যবন জাতি এদেশে আসবে?

সত্যি-মিথ্যা জানি না, শ্যামাঙ্গ জানায়, আপনাদের গৃহে যে যোগীটি অতিথি, সে-ই সংবাদটি নিয়ে এসেছে।

এদিকে আবার কুম্ভকার রুহিদাসের পুত্রটিকে নিয়ে যে কাণ্ডটি ঘটেছে তাতে সকলেরই ভয়—সেই পিপ্পলী হাটের মতো কিছু ঘটে না যায়—লীলাবতী চিন্তিত স্বরে জানায়।

শ্যামাঙ্গ দেখলো, এখন লীলাবতী আর চপল নয়, তার স্বরে এখন বিদ্রূপ নেই, ক্রোধ নেই। সে বললো, সাবধানে থাকবেন—প্রয়োজন বোধ করলে এ গ্রাম ত্যাগ করুন—অহেতুক লাঞ্ছিত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

এ গ্রাম ত্যাগ করে কোথায় যাবো বলুন? শ্যামাঙ্গ দেখে, লীলাবতী তার মুখপানে চেয়ে আছে।

শ্যামাঙ্গ মুখখানি দেখলো, চোখ দু'টি দেখলো, কেশপাশ দেখলো, তার মুখে তখন আর বাক্য নিঃসৃত হয় না।

কই, বলুন? কোথায় যাবো এই গ্রাম ত্যাগ করে?

শ্যামাঙ্গের যেন সম্বিৎ ফেরে লীলাবতীর কথায়। মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়েছিলো। বললো, যেখানে হোক, চলে যান—এ গ্রাম নিরাপদ থাকবে না।

আপনি দেখছি আমার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন?

শ্যামাঙ্গ সচকিত হয়। এ কথাও কি বিদ্রূপ? সে বুঝতে পারে না। বলে, আপনার রোষ কি এখনও যায়নি?

না, যায়নি, লীলাবতী উত্তরে জানায়। বলে, আপনার উপদেশের কোনো অর্থ হয় না—সমস্ত গ্রাম বিপন্ন হলে আমি কোথায় যাবো, কার সঙ্গে যাবো? আর বিপদ কি শুধু বহিরাগত যবনদের কারণে? কেন, সামন্তপতিদের উপদ্রব নেই? তারা আক্রমণ করে না? বরং আপনাকে বলি, আপনি নিজে সাবধান হন, যে কোনো দিন হরিসেনের অনুচররা এ গ্রামে আসতে পারে—

কথা ক'টি ব'লে লীলা চলে গেলো। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শ্যামাঙ্গ।

তার কিছু বলবার নেই, করণীয়ও কিছু নেই। সে যথার্থই কি কাপুরুষ? সমূহ বিপর্যয় আসন্ন উপলব্ধি করেও সে কেবলমাত্র ক'টি বাক্য ব্যয় ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না? ধিক তোর এই নির্বীর্য অস্তিত্বে—তুই কিছুই করতে পারিস না। সন্ধ্যাকালের নির্জন পথে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করে।

বহির্বাটির কক্ষটিতে শ্যামাঙ্গের শয়নের স্থান হয়েছে। শ্যামাঙ্গ আহারাদির পর শয্যাগ্রহণ করলো। সমস্ত পল্লী অস্বাভাবিক নীরব। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি পথকুক্কুর রোদন ক'রে উঠছে। ঐ শব্দ অদ্ভুত লাগে—অজানা ভয় শিহরিত হয় মনে। কে জানে, কোন দুর্যোগ সমাসন্ন? বাহিরে শুকদেব ও দীনদাসের কথা শ্রবণে আসছিলো। এক সময় ঐ মৃদু আলাপও গেলো নীরব হয়ে। শ্যামাঙ্গ উপাধান দু'হাতে আকর্ষণ করে শয়ন করলো—এবং তার ক্লান্ত শরীর অচিরেই নিদ্রাভিভূত হয়ে গেল।

বিপর্যয় আরম্ভ হলো মধ্যরাতে। প্রথমে কিছুই বোঝা যায়নি। দূরে রুহিদাসের গৃহ থেকে যখন চিৎকার ওঠে—তখনও শ্যামাঙ্গ নিদ্রামগ্ন। ক্রমে পল্লীবাসীরা দ্রুতপদে বনভূমি

লক্ষ্য করে পলায়ন আরম্ভ করলো। দু'টি একটি গৃহে যখন অগ্নিসংযোগ আরম্ভ হয়েছে—তখনও শ্যামাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। অকস্মাৎ সে অনুভব করে, কেউ তার কক্ষদ্বারে সজোরে করাঘাত করছে। সে জেগে উঠে বসলে মুহূর্তেক পরই চিৎকার এবং আর্তনাদ শুনতে পায়। দ্বার অর্গলমুক্ত করতেই লীলাবতী কক্ষে প্রবেশ করে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, শীঘ্র পলায়ন করুন, বিলম্ব হলে প্রাণ হারাবেন।

শ্যামাঙ্গ বাইরে এসে বললো, মায়াবতীরা কোথায়?

লীলাবতী তার হাত ধরে জানায়, তারা বনভূমির দিকে গেছে, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, কথা বলবেন না।

এদিকে ততক্ষণে সমগ্র পল্লীটি জ্বলে উঠেছে। কাদের এই কাজ, কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না। দূরে তরবারি হস্তে বীর ধটিকা পরিধানে কিছু লোককে দেখে অনুমান করা গেলো, এরা আর যাই হোক, দস্যু নয়। দু'জনে অগ্রসর হতে গেলেই বাধা পায়, সম্মুখে একটি বৃদ্ধকে প্রহার করা হচ্ছে। শ্যামাঙ্গ প্রমাদ গণনা করে—আজ তবে এখানেই ইহলীলা সাঙ্গ করতে হবে। লীলাকে বলে, তুমি অগ্রে যাও—আমি তোমার পশ্চাতে আসছি। লীলা সজোরে শ্যামাঙ্গের বাহু ধরে রাখে। বলে, ওভাবে পারবেন না, পশ্চাতে যাই চলুন।

পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেলো, লীলাবতীদের গৃহ জ্বলছে।

না এদিকে না, সম্মুখেই চলুন, লীলা প্লাবিত হলো।

অন্ধকার, ধূম, অগ্নিশিখা এবং আক্রমণকারীদের সোল্লাস চিৎকার। ঐ যে পলায়—ধর ধর—ব'লে দু'জন শ্যামাঙ্গের পশ্চাতে অনুসরণ করে। লীলাবতীর সাধ্য কি যে বলশালী সৈনিকদের পশ্চাতে ফেলবে। তারা লীলাকে ধরতে উদ্যত হওয়া মাত্র শ্যামাঙ্গ একখানি প্রজ্বলিত বংশদণ্ড দু'হাতে তুলে নিলো। ওদিকে দু'জনের হাতেই রক্তাক্ত তরবারি। ঐ তরবারি দু'খানির বিরুদ্ধে বংশদণ্ডটি আর এমন কি অস্ত্র! লীলা, তুমি চলে যাও—শ্যামাঙ্গ চিৎকার করে। কিন্তু ঐ চিৎকার লীলাবতীর শ্রবণে যায় কি না অনুমান করা কঠিন। সৈন্য দু'টি তখন ভয়ানক হাসি হাসছে। শেষ আঘাত একেবারেই আসন্ন। শ্যামাঙ্গ প্রস্তুত হলো—জীবন, তোমাকে বিদায়!

কিন্তু ঐ মুহূর্তেই আবার ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনিও শোনা গেলো। ধূম এবং অগ্নিশিখার প্রক্ষিপ্ত প্রতিফলনে দ্রুতগতি ছায়ার মতো অশ্বারোহীদের আগমন নির্গমন দেখা যেতে লাগলো। এই অশ্বারোহীদের কারও হাতে উন্মুক্ত তরবারি, কারও হাতে সুদীর্ঘ শূলদণ্ড, কারও হাতের দীর্ঘদণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। এরাই কি পল্লীটিকে ভস্মীভূত করতে চায়? দীর্ঘদেহ, শ্মশ্রুময় মুখমণ্ডল, মস্তকে উষ্ণীষ—না, কোনো সন্দেহ নেই—এরাই সেই যবন দল। শ্যামাঙ্গ নিশ্চিত হয়।

সৈন্য দু'টি যেমন, তেমনি শ্যামাঙ্গও বিমূঢ় দৃষ্টিতে ইতস্তত ধাবমান অশ্বারোহীদের দেখছিলো। ঐ সময় একজনকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে সৈন্যরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো। এবং তারপরও ওদের পশ্চাতে একজন অশ্বারোহীকে ধাবমান হতে দেখা গেলো।

লীলা তার হাত ধরে আকর্ষণ করে, চলুন, মূর্খের মতো দাঁড়াবেন না।

কিন্তু বারেবারেই দাঁড়াতে হলো দু'জনকে। দেখলো, তরবারির আঘাতে বালকের ছিন্নমুণ্ড কেমন ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে, শূলাঘাতে বৃদ্ধ কিভাবে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে মরণ-চিৎকার কণ্ঠ থেকে নির্গত করে, ধাবমান অশ্বের পদাঘাতে রমণী মস্তক কিভাবে চূর্ণিত হয়। সমস্তই দেখলো দু'জনে। এবং ঐসব দৃশ্য দেখতে দেখতে বনভূমির প্রান্তে উপনীত হলো তারা। সেখান থেকেই লীলাবতী চিৎকার করে পিতাকে ডাকতে লাগলো। সে তখন উন্মাদিনীপ্রায়—পিতার সন্ধান করছে, মাতুলের সন্ধান করছে, সখী মায়াবতীর সন্ধান করছে। সে জানে না, কে আছে, আর কে নেই। শ্যামাঙ্গ তখনও প্রজ্বলিত, লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত পল্লীটির দিকে চেয়ে আছে। তার মনে কেবলই প্রশ্ন, এরা কারা? একই স্থানে আঘাত হানে, একই গৃহে অগ্নি দেয়, একই পল্লীর মানুষকে হত্যা করে—অথচ দু'টি ভিন্ন দল—এদের মধ্যে কি সত্যিই কোনো পার্থক্য আছে?

বরেন্দ্রভূমির জনপদগুলিতে তখন ঐভাবেই প্রাণ বধ হচ্ছে, গৃহ লুণ্ঠিত হচ্ছে, পল্লী প্রজ্বলিত হচ্ছে। রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণ সেন দেব সিংহাসনে সগৌরবে আসীন হলেও তাঁর মহাসামন্ত ও সামন্তবর্গ প্রজাপালনের কোনো কাজ করে না। বরঞ্চ তারা বিলাসব্যসন ও প্রজাপীড়নে অধিক মত্ত। ওদিকে যবন জাতির হাতে মহাকালের ডমরুতে অনাহত ধ্বনি বেজে উঠেছে। কেউ জানে না, ভবিষ্যতে কী আছে। বড় ধূসর ঐ প্রদোষকাল!

প্রায় পরিত্যক্ত নগরীর নির্জন পথে পথে কয়দিন সে ভ্রমণ করলো। চোর দস্যু এবং পথকুক্কুর ব্যতীত আর জনপ্রাণী গোচরে আসে না। যারা নগরীতে তখনও আছে, তারা গৃহের বাহির হয় না।

তথাপি সংবাদ পাওয়া যায়। এখন আর অবিদিত নয় কিছু। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নওদীয়ার প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেছেন। নওদীয়ার প্রাসাদ ধ্বংস হতে বিলম্ব হয়নি। লক্ষ্মণাবতীও হয়েছে যথেচ্ছ লুণ্ঠিত। সেনাপতিরা পলায়ন করেছেন। সৈন্যরা কেউ পলায়িত, কেউ নিহত আর অবশিষ্টরা এখন যবন সেনাদলের সহযোগী। তারা সদলে এখন নগরের পর নগর লুণ্ঠন করে চলেছে। যে কোনোদিন পুন্ড্রনগরীতেও তারা এসে যেতে পারে।

একাকী ভ্রমণ করতে করতে সে নগরপ্রান্তে সদ্ধর্মীদের প্রাচীন বিহারের দিকে গেলো একদা। তার জনরব শোনা ছিলো যে সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের নাকি যবনদের সঙ্গে মিত্রতা হয়েছে এবং ভিক্ষুদের কোনো ভয় নেই। কিন্তু দেখলো, বিহারটি প্রায় পরিত্যক্ত। কয়েকজন তরুণ তখনও অপেক্ষা করছে।

একজন তাকে দেখে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি মহাশয়, আপনি নগর ত্যাগ করেননি?

না, সকলেই নগরী ত্যাগ করলে অতিথিদের অভ্যর্থনা কে করবে?

উত্তম, ভিক্ষুটি হাসলো। বললো, উত্তম বলেছেন, জিজ্ঞাসিত হলে আমরাও ঐ উত্তরই দিই।

ভিক্ষুরা ঐ একই সংবাদ জানে। এবং তাদেরও ধারণা, ভিক্ষুদের যবনেরা কিছু বলবে না। একজন বললো, কেন বলবে, বলুন? আমরা তো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনোভাবেই নই। এক হতে পারতো ধন-সম্পদের কারণ, ধন-সম্পদের লোভে আমাদের আক্রমণ করতো—কিন্তু সে গুড়ে তো এখানে বালি—অধিক হলে আমরা ভিক্ষাপাত্রটি দিয়ে দিতে পারি।

যেন কৌতুকের বিষয়। শ্যামাঙ্গ বললো, এ কি কৌতুকের সময়?

বাহ্, কৌতুক ব্যতিরেকে কী করবো বলুন? রোদন করবো? রোদনের কোনো কারণ আছে কি? রক্তপাত, লাঞ্ছনা, অপমান ইত্যাদি আমরা পূর্বেও দেখেছি, এখনও দেখছি।

বসন্ত কী?

বসন্তদাস।

উত্তম কথা, কুলবৃত্তি কী, সেটি বলছো না কেন?

আজ্ঞে আমরা ক্ষেত্রকর, আমার পিতা হেমন্তদাস আত্রেয়ী তীরে ক্ষেত্রকর্ম করেন।

উত্তম উত্তম—পিতৃনাম স্মরণে আছে তাহলে। তা ক্ষেত্রকররা কি ইদানীং বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছে নাকি, অ্যাঁ? বৃত্তি সাংকর্য সৃষ্টি করে চলেছো, তোমার লজ্জা করে না? পাপবোধ নেই, অ্যাঁ?

অদ্ভুত কথা! বসন্তদাস কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। শেষে সবিনয়ে বলে, প্রভু ক্ষমা করবেন, যদি অপরাধ হয়—কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিতেই তো এমন কিছু লোক থাকে যারা কুলবৃত্তি ত্যাগ করে অন্যবৃত্তি গ্রহণ করে।

মিথ্যা ভাষণ ক'রো না বসন্তদাস। শ্রীনাথবর্মণ রোষ কষায়িত দৃষ্টি রাখেন বসন্তের মুখের উপর। বসন্তদাসের মনে ভয় ঈষৎ শিহরিত হয়।

শোন হে ক্ষেত্রকরের পুত্র, শ্রীনাথবর্মণ বলতে লাগলেন, তোমার অপরাধ সীমাহীন—প্রথমত, তুমি মিথ্যা কথা বলেছো, অতঃপর এখন যা বলছো, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি ধর্মদ্রোহীও বটে। উপরন্তু আমার সন্দেহ, এ সমস্তই তোমার অপহৃত সম্পদ। নাহলে ক্ষেত্রকরের পুত্র হয়ে এতো মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী তুমি কোথায় পাবে? এমতাবস্থায় এ দ্রব্যগুলি রাজকোষে গচ্ছিত থাকবে। তুমি যার কাছ থেকে এই মণিমাণিক্যাদি সংগ্রহ করেছো তাকে যদি আমার সম্মুখে আনতে পারো, তাহলেই এগুলির মূল্য পাবে, নচেৎ নয়। এখন তুমি যেতে পারো।

প্রভু, দয়া করুন, বলে বসন্তদাস কাকুবাদ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ফল হয় না তাতে। প্রাসাদের প্রহরীরা তাকে তুলে এনে প্রাসাদদ্বারের বাহিরে রেখে যায়। যাবার সময় এক প্রৌঢ় প্রহরী বলে যায়, বৎস তুমি নির্বোধ। ঐভাবে সমুদয় পণ্য নিয়ে কেউ যায় সামন্তপতির কাছে? যা হয়েছে, হয়েছে—এবার গৃহের সন্তান গৃহে ফিরে যাও। এ স্থানে গোলযোগ করলে হয়তো তোমাকে শূলেও দিতে পারেন, সামন্তপতি ভয়ানক ক্রোধী পুরুষ। তিনি যে তোমাকে বন্দী না করে প্রাসাদের বাহিরে পাঠিয়েছেন এ তোমার চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্য মনে করবে।

বসন্তদাস হতবাক, এ কি হলো! মুহূর্তের মধ্যে তার সর্বস্ব অপহৃত হয়ে গেলো? তার কিছুই করণীয় নেই? সে বিভ্রান্ত হয়ে পথে পথে ভ্রমণ করতে লাগলো।

শেষে এক বিপণীকার পরামর্শ দিলো, মহাশয়, এভাবে শক্তিক্ষয় করে কোনো ফল হবে না—আপনি বরং মহাসামন্ত শক্তিবর্মণের কাছে যান—তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী, যদি তাঁর দয়া হয়, তাহলে আপনার পণ্যের আংশিক মূল্য পেয়েও যেতে পারেন।

আবার এও জানালো লোকটি—তবে দেখবেন, যেন কোনো কারণে রুষ্ট না হন তিনি, হলে কিন্তু বিপদ।

উজুবট গ্রামখানি যখন লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয় তখন বসন্তদাস পুনর্ভবার পশ্চিম তীরের গ্রামগুলিতে ভিক্ষু মিত্রানন্দের সন্ধান করে ফিরছে। মিত্রানন্দকে তার বিশেষ প্রয়োজন। তাকে যে উজুবট গ্রামের উত্তরপাটক পল্লী থেকে পলায়ন করে আসতে হয়েছে শুধু সেই কারণেই নয়। তার আশঙ্কা হচ্ছিলো, পিপ্পলী হাটের ঘটনাটির শীঘ্রই পুনরাবৃত্তি হবে। সামন্ত হরিসেন তো আর একাকী ঘটনাটি ঘটাননি। তাঁর সঙ্গে বহু অনুচর ছিলো। ঐদিন যারা ঘটনাটি ঘটাতে সহায়তাদান করেছিলো তারা নিজেরাও যদি ঐ প্রকার ঘটনা ঘটাতে চায়, তাহলে কে বাধা দেবে? ব্যাঘ্র একবার শোণিতের স্বাদ পেলে তা কি আর ত্যাগ করে? একইসঙ্গে আবার সে শুনতে পাচ্ছিলো, যবন সেনাদল নাকি পশ্চিমে অবস্থান করছে। অশ্বারোহণে দশ/পঞ্চদশ ক্রোশ আর এমন কি দূরত্ব? তদুপরি জানে, লাঞ্ছিত অপমানিত ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ এই পথেই গমন করেছেন। এখন যদি তরুণ ভিক্ষুদের আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধানন্দ যবন সেনাদলকে আহ্বান করেন, তাহলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হবে। নিকটবর্তী গ্রাম জনপদগুলি একেবারে শ্মশান হয়ে যাবে। তার ধারণা, এই ভয়াবহ সঙ্কটকালে পরিত্রাণের পথ কেউ যদি উদ্ভাবন করতে পারে তো সে হলো মিত্রানন্দ এবং তার সহচরেরা।

কিন্তু কোথায় মিত্রানন্দ? যে স্থানেই সে উপনীত হয়, সে স্থানেই শোনে, আহা দিনেক পূর্বে এলেন না—মাত্র গতকালই তিনি এ গ্রাম ত্যাগ করেছেন।

সে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছিলো। ঐ সময় মালঞ্চ হাটে এক গন্ধবণিক তাকে সংবাদটি দেয়। বিশদ কিছুই বলতে পারেনি সে। শুধু জানায় যে, উজুবট গ্রামখানি একেবারেই ভস্মসাৎ হয়েছে—একটি প্রাণীও নাকি রক্ষা পায়নি।

সংবাদটি আকস্মিক এবং ভয়াবহ। বসন্তদাস কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। পরক্ষণেই সে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা হয় তার। তখন অপরাহ্ণকাল, পথ নির্বিঘ্ন নয় এবং যেতেও হবে তিন ক্রোশাধিক পথ। কিন্তু সেসব বিষয়ে চিন্তা করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিলো না।

দ্রুত পথক্রমণ করছিলো সে, আর ঐ সময় ক্ষণে ক্ষণে মায়াবতীর মুখখানি সে মনের ভেতরে দেখতে পাচ্ছিলো। বড় মায়া মুখখানিতে। তার বাহু দু'খানির উষ্ণ স্পর্শ

সে গণ্ডদেশে এখনও অনুভব করে। কি স্নিগ্ধ, কি পবিত্র এবং কি গভীর হতে পারে প্রিয়তমা নারী, তা সে মায়াবতীকে না পেলে কখনই জানতে পারতো না। মায়াবতীর সান্নিধ্যই তাকে সেই উপলব্ধি দান করেছে যার কারণে মুক্তস্বভাব পুরুষ সংসার-জীবনে স্থির থাকতে পারে। সন্তানের কথাও তার কল্পনায় উদিত হচ্ছিলো। আহা, শিশু কোলে না থাকলে রমণী কি আর রমণী? তার এখন মনে হয়, সে সংসার-জীবনের সারাংসারে প্রায় উপনীত হতে যাচ্ছিলো। ক্রমেই তার উপলব্ধি হচ্ছিলো, জীবন এইভাবেই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়, পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমে একটি পরমার্থতায় উপনীত হয়। তার বিশ্বাস, জীবনের পরমার্থতা অন্য কিছুতে প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় সৃজনে। আর এও তার মনে হয় যে, সংসারই সৃজনের আধার, সংসার ধ্বংস হয়ে গেলে সৃজন প্রক্রিয়া আর থাকে না। ধর্ম বলো, সংঘ বলো, রাষ্ট্র বলো, সকলই সংসারকে রক্ষা করার কারণে। সংসারের কারণেই মানুষের যাবতীয় বৃত্তি এবং কর্মকাণ্ড। সুতরাং সংসারকেই জগতের সকল অস্তিত্বের কেন্দ্রে স্থাপন করতে হবে। এই প্রকার একটি সরল মীমাংসায় উপনীত হচ্ছিলো সে। এবং ঐ সংসার সম্পর্কেই প্রেমধর্মের কথাটি এসে যাচ্ছিলো। প্রেম না হলে কি সংসার হয়? আর সংসার না হলে তো জীবন হয় না। এবং জীবন যদি না থাকে, তাহলে জগতের অস্তিত্ব কোথায়? মীমাংসাটি এইভাবে বিন্যস্ত করে সে মিত্রানন্দের কাছে জানিয়েছিলো। এবং ঐ সূত্রেই মানুষে মানুষে প্রীতি ও সদ্ভাবের কথাটি তুলেছিলো। সনাতন ও সদ্ধর্মীদের মিলন যে ঐ সূত্রেই হতে পারে তাও সে জানিয়েছিলো। মিত্রানন্দ জগদ্দল মহাবিহারে একখানি পত্র নিয়ে যাচ্ছে তখন। ঐ সময়ই সে অনুরোধটি করে। মহাভিক্ষু ও মহাশ্রমণদের মধ্যে ঐ সরল মীমাংসার কথাটিও যেন আলোচিত হয়।

কিন্তু এ কোন দুষ্কালের আবির্ভাব ঘটলো! জীবনের ধ্বংস প্রক্রিয়া কি এতোই দ্রুত অগ্রসর হয়? সময় এতো বেশী কেন? মানুষ কি সামান্য কিছুকালও ধৈর্য ধারণ করতে পারে না? বলাধিকার থাকলেই তা প্রয়োগ করতে হবে? তার কিছুতেই বোধগম্য হয় না একজন বয়স্ক, বুদ্ধিমান, সম্ভ্রান্ত ও সামাজিক মানুষ কীভাবে অন্যের ধনসম্পদ, সংসার, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হরণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারে। এ কি শুধুই লোভ? শুধুই জিঘাংসা? তোমার পুত্র তোমার নয়, সে আমার দাস হবে। তোমার সুন্দরী স্ত্রী তোমার নয়—সে আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। তোমার ধনসম্পদ কেন থাকবে তোমার অধিকারে? তা থাকবে আমার অধিকারে।

তার একেক সময় জানার বাসনা হয়, এ কি তাহলে মানুষের চূড়ান্ত পতন? এখন পাশবিকতার জয়জয়কারই হবে সত্য? মহাকাল তার শেষ ঘোষণাটি দিয়ে বসে আছেন—কেবল মৃত্যু ও মিথ্যাই সত্য—অন্য কিছু নয়।

আবার একেক সময় মনে হয়, এ হলো এক প্রকার ক্ষয়। জরা এসে তোমার দেহের শক্তি হরণ করছে, তোমার মনের চিন্তাকে স্থবির করে দিচ্ছে, তোমার উদ্যমকে বিনষ্ট করছে। তোমার অস্তিত্বকে ধারণ করে যে শক্তি, সেই শক্তিই ক্ষয়ে যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। ফলে তোমার দেহ মন কিছুই আর তোমার নয়। এ হলো সেই পুত্তলির মতো

যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আর একত্র থাকছে না। তোমার হস্তপদ তোমার নয়। সমস্তই ক্ষয় হয়ে, শিথিল হয়ে, ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সংসারেরই কি কোনো গঠন থাকে?

অথচ সংসারই মূল। আমার হস্তপদাদি আমার থাকতে হবে—চক্ষু দুইটিকেও আমি সংলগ্ন চাই। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, গৃহ, কর্মক্ষেত্র সমস্তই আমি সংলগ্ন চাই। ঐ সব সংলগ্ন না থাকলে আমি যে আর আমি থাকতে পারি না। সুতরাং এই সংলগ্নতাই সংসারের সৃষ্টি করে। এরই অন্য নাম প্রেম। প্রেমে জগৎ হয়ে ওঠে একান্ত আপন। সৃজনের আধার সংসার, সংসারের আধার আবার জগৎ। যে পথেই অগ্রসর হই, প্রেম ব্যতীত জগৎ নেই।

একাকী মনের চিন্তা এসব। একদিনের নয়। বাণিজ্য যাত্রার সময় থেকে আরম্ভ। নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসব চিন্তার জন্ম হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে-অসংলগ্নভাবে। পরে এগুলি ক্রমশ স্পষ্টতর হয়েছে শ্বশুরালয়ে অবস্থানকালে, পিপ্পলী হাটের ঘটনাটি ঘটবার পর, যখন ভিক্ষুরা একাদিক্রমে তার কাছে আসতে আরম্ভ করে, তখন।

কিন্তু এখন এসব চিন্তার কি আর আদৌ কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে? সমস্ত কিছুর এখন ছিন্নভিন্ন অবস্থা। মস্তিষ্কের চিন্তার যেমন, বাইরের দৃশ্যাবলীরও তেমনই।

সমস্ত পথ তার মনে অসংলগ্ন আরও নানান চিন্তার উদয় হচ্ছিলো। সেই সঙ্গে আবার মায়াবতীর প্রণয়ভাষণের কথাগুলিও থেকে থেকে কর্ণকুহরে মর্মরিত হচ্ছে তখন। ফলে সে নিজের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছিলো নিমজ্জিত। পথের প্রতিকূলতা তার সম্মুখে কোনো বাধারই সৃষ্টি করতে পারেনি।

খিল ভূমির মধ্য দিয়ে পথ। কোথাও ঈষদুচ্চ ঝোপ, কোথাও আইল, কোথাও বা জল প্রবাহিনী নালিকা। কিন্তু কিছুই তার বোধগোচর হচ্ছিলো না। তবে সৌভাগ্য যে আকাশে ছিলো পূর্ণচন্দ্র এবং তার দৃষ্টিশক্তিও ছিলো প্রখর। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতোই ছিলো সচল।

অবশেষে রাত্রির মধ্যযামে পুনর্ভবা তীরের একটি হাটে এসে উপস্থিত হলো। পদযুগল আর বশে ছিলো না তখন। একটি হট্টকুটিরের চালার নীচে ভূমিতেই সে শয়ান হলো। ভয়ানক তৃষ্ণার্ত ছিলো সে। কিন্তু নদীর জলধারা পর্যন্ত যাবে, এমন ক্ষমতা দেহে তখন আর অবশিষ্ট ছিলো না।

হাটের প্রান্তে ছিলো একটি হড়ডিপল্লী। পল্লী বলতে সামান্য কয়েকটি পর্ণ কুটির মাত্র। ঐ কুটিরবাসীদের মধ্যে সম্ভবত কেউ তার আগমন লক্ষ্য ক'রে থাকবে। এক সময় সে দেখলো, অদূরে কয়েকটি মানবমূর্তি দাঁড়িয়ে। একজন আবার প্রশ্নও করছে, মহাশয় আপনি কে? কি হেতু এ স্থানে আগমন, এই দশাই বা কেন?

আমাকে জল দিন, বসন্তদাসের মুখে ঐ একটি কথা তখন। প্রশ্নগুলি কর্ণে প্রবেশ করলেও কোনো উত্তরই তার মুখে আসছিলো না।

মহাশয় কি আমাদের হাতে জলপান করবেন?

বসন্তদাসের কাছে প্রশ্নটি ভয়ানক হাস্যকর বোধ হয়। ঐ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পুনরায় জল চায়। বলে, জল দিন ভ্রাতঃ, আমি তৃষ্ণার্ত, পরে কথা বলবেন।

এক বৃদ্ধ মৃৎপাত্রে জল এনে দিলে সে তা পান করে এবং স্বস্থ হয়। শেষে নিজ পরিচয় জানিয়ে সে তার উজুবট যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ ছিলেন ঐ স্থানে। তিনি বললেন, মহাশয়, উজুবট যাওয়া একেবারেই অর্থহীন, শুকদেব মহাশয়কে আমি জানি, অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি—তাঁর সন্ধান করার জন্য আমরাও গিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকেই পাইনি—আপনিও পাবেন না—বরং এই আশঙ্কা যে, সামন্ত হরিসেনের গুপ্তচরদের হাতে বন্দী হয়ে যেতে পারেন।

হ্যাঁ মহাশয়, যাবেন না! অধিকতর বয়স্ক আরেকজন বললেন। পরামর্শ দিলেন, আপনি বরং নদীর এই পশ্চিমতীরের গ্রামগুলিতেই সন্ধান ক'রে দেখুন।

বসন্তদাস লোকগুলির কথা শোনে এবং তার অদ্ভুত বোধ হয়। শেষে সে বলে, এ আপনারা কী বলছেন, আমার আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না। মায়াবতী আমার স্ত্রী, আমার ধর্মপত্নী, অগ্নিসাক্ষ্য করে তাকে আমি বিবাহ করেছি। সে মৃত, না জীবিত, সে সংবাদ আমি নেবো না? যদি মৃত হয়, তাহলে তার শেষকৃত্যেরও তো একটি প্রশ্ন আছে।

বৃদ্ধটি বসন্তদাসের কথা শুনে করুণ ও মলিন হাসি হাসেন। বলেন, মহাশয়, আমি পক্বকেশ বৃদ্ধ, নিম্নজাতি, কিন্তু কেশগুলি আমার অহেতুক পাকেনি। সেই জন্যই বলছি, বুদ্ধিভ্রষ্ট হবেন না—এ বড় দুঃসময়—এখন স্থির এবং শান্তচিত্তে সমস্ত কাজে হাত দেওয়া উচিত। আপনি কিঞ্চিৎ স্বস্থ হয়ে বর্তমান অবস্থাটি চিন্তা করে দেখুন। আজ ষষ্ঠ দিবস, তায় গ্রীষ্মকাল, আপনি কি মনে করেন শৃগাল-কুক্কুর মৃতদেহগুলিকে অক্ষত রেখেছে? প্রকৃত ব্যাপার তো মহাশয় ললাটে, ললাটলিপি আর কে খণ্ডাতে পারে?

বসন্তদাসের মনেও যে ঐ প্রকার চিন্তা আসেনি তা নয়। সে অনুমান করতে পারে, উজুবটে গেলে হয়তো সে কাউকেই পাবে না, কিন্তু তথাপি সে অন্তরের হাহাকারটি প্রশমিত করতে পারছিলো না। তার কেবলি মনে হচ্ছিলো থেকে থেকে—আছে, জীবিত আছে মায়াবতী, লোকে যা-ই বলুক।

অতি প্রত্যূষে বনকুক্কুটের ডাক আরম্ভ হতেই সে আর স্থির থাকতে পারলো না। হড্ডিপল্লীর ঘাটে বাঁধা ক্ষুদ্র কোষা নৌকাখানি নিয়ে সে নদী অতিক্রম করে পূর্বতীরে উপনীত হলো।

নদীতীর একেবারেই নিঃশব্দ। কেবল উষাকালের শীতল বায়ুতাড়নায় বৃক্ষরাজির পত্রপল্লবে মর্মরধ্বনি উঠছে। ঐ তো বট এবং অশ্বত্থ বৃক্ষগুলি, বৃক্ষতলের উচ্চবেদীসমূহ। ঐ সকল বেদীতে কতদিন অপরাহ্ণে সে বিশ্রাম নিয়েছে। বটবৃক্ষের সংখ্যাধিক্যের কারণেই কি গ্রামখানির নাম উজুবট? বটবৃক্ষ কি ঋজু হয়? সে একবার নামটির তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলো, সফল হয়নি। গ্রাম বৃদ্ধেরাও কেউ তাকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেনি। আহা মাত্র সেদিনই না সে এই নদীতীরে ভ্রমণ করেছে! বালক ও কিশোরদের খেলার সঙ্গী হয়েছে! কি নাম ছিলো যেন বালকটির? অর্কদাস? হ্যাঁ, ভারী

সুন্দর নামটি আর মুখখানি কেমন ভারী কোমল, আর এতো মায়া চক্ষু দু'টিতে যে দৃষ্টিপাত হলে সে দৃষ্টিকে আর সরানো যেতো না। সেই অর্কদাস এখন কোথায়? এবং সেই বৃষস্কন্ধ বলশালী কিশোরটি? প্রতিটি কথায় যার হাসি উচ্ছ্বসিত হতো?

নদীতীরে নৌকা নেই কেন? এখানে না বীথির পর বীথি নৌকা ভাসমান থাকতো! তার মনে পড়ে, পল্লীটি কোলাহলে মুখর হয়ে জেগে উঠতো প্রত্যূষকালে। গোধনের হাম্বা রব, ক্ষেত্রকরদের সচিৎকার আহ্বান, ধার্মিক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের কণ্ঠে শিবের মঙ্গলগীতি, সমস্ত একত্রে পল্লীটির প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রকাশ করতো। এখন একেবারেই নিঃশব্দ। ভ্রম হয়, যেন কোনো শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এখানে ভস্মস্তূপ, ওখানে অর্ধদগ্ধ কুটির চালা, চারিদিকে ভগ্ন তৈজসাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কোনো এক গৃহবধূর হাতে সীবনকৃত একখানি অর্ধদগ্ধ কন্থার প্রান্তদেশে বৃক্ষশাখার তোতাপাখিটি বড় মনোহর। সে হাতে তুলে নিতে গিয়েও নিলো না। অনুমান করতে চেষ্টা করলো, কার গৃহ ছিলো এ স্থানে? দেখলো, বৃথা চেষ্টা, কিছুই অনুমান করা যায় না। সমস্ত কিছু একাকার। উৎকট একটি দুর্গন্ধ ঘ্রাণে আসছিলো। ক্রমে দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠলো। ঐ সময় সে একটি পথকুক্কুর দেখলো। তার স্ফীতোদরটি দেখবার মতো। এবং আরও দেখলো, অনতিদূরে একটি শিশুর ছিন্নবাহু নিয়ে দুটি শ্মশান শৃগাল কলহ করছে। শৃগাল ও কুক্কুরের যে সহাবস্থান হতে পারে, তার জানা ছিলো না।

বসন্তদাস অধিকদূর অগ্রসর হতে পারলো না। দূরে ব্রাহ্মণপল্লীর মন্দিরে ঐ সময় ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। সে ঘণ্টাধ্বনিটি শুনলো অনেকক্ষণ ধরে। কল্যাণ ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা আরম্ভ হয়েছে। শ্লোকটি তার মনে পড়লো, যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ... ধর্মে যখন গ্লানির অনুপ্রবেশ ঘটে, জগত পাপে পূর্ণ হয়ে যায়, দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির নিমিত্ত এবং সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। বড় আশ্বাসের কথা। ধর্মে এবং জীবনে মানুষকে সুস্থির করার জন্য এতদপেক্ষা বৃহৎ ও মহৎ আশ্বাস আর কী হতে পারে।

ভগবান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান কোথায়? তার মনে প্রশ্ন জাগে। যেখানে এবং যাদের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান, সেখানে কি গ্লানি আছে? নির্যাতিত মানব শিশুর রোদন ধ্বনি কি অতদূরে কারও শ্রবণ স্পর্শ করে? কে জানে, বসন্তদাসের অন্তত জানা নেই। ভগবান বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ ইত্যাদি সকল রূপেই মর্তে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু চণ্ডালের, কি ব্রাত্য শূদ্রের গৃহে কখনও কি তাঁর জন্ম হয়েছে? কেন হয়নি, বলা কঠিন। তবে হলে বড় ভালো হতো। চণ্ডাল ডোম হড়ডিরা ভাবতে পারতো যে নর সত্য সত্যই নারায়ণ। এই চিন্তা করে স্বস্থ ও সাহসী হতে পারতো যে তারাও একই ভগবানের আশ্রিত।

পুরাণ-কথার সঙ্গে সঙ্গে তার জাতক-কাহিনীও মনে পড়লো। কিন্তু সবই বিচ্ছিন্ন, সংলগ্নতাবিহীন ও পারম্পর্যশূন্য—ক্ষণেক ক্ষণেক আলোকোদ্ভাসের মতো। সে জানে, এমন তুলনা একেবারেই অনর্থক—কেউ এমন তুলনা কখনও করবে না। ন্যায় এবং

মীমাংসার পদ্ধতিগুলিও তার জানা নেই। আর জানা থাকলেই বা লাভ কি? তার কি সাধ্য যে পুরাণ ও জাতক কাহিনীর তুলনামূলক বিচার করবে? বিশেষত এই সময়ে? সুতরাং চারিদিকে যা ঘটছে তা স্বীকার করে নাও। তোমার মানবজন্মের এই-ই ললাট লিপি।

সে আরেকবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে। এখন তার চারিদিকে ধ্বংস ও মৃত্যু। নরক কি এই প্রকার? হতে পারে—তার অনুমান হয়। জীবনহীনতা এবং সম্ভাবনাহীনতা একত্রিত হওয়ার নামই সম্ভবত নরক। বিকৃতি, পচন, পাপ, পতন—এ সমস্তই নরকের লক্ষণ। আর সমস্তই সম্ভব হয় জীবনের অনন্ত প্রবাহটি স্তব্ধ হয়ে গেলে। সৃজন ও জীবনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলেই নরকের আরম্ভ। সে যেখানে দাঁড়িয়ে তা এখন নরকই, অন্য কিছু নয়। এবং একইসঙ্গে বাইরের যে জগৎ বিস্তৃত, যেখানে পিপ্পলী হাটের মতো ঘটনা ঘটে, সে স্থানও নরক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তার মনে হয় না দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য আছে।

বিধ্বস্ত পল্লীটির বুকে দাঁড়িয়ে বসন্তদাস কেবলই উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছিলো। নানান কথা আসছিলো মনে। বেদনা-শোক-ক্ষোভ-ক্রোধ ইত্যাকার অনুভূতিগুলি তখন আর সজাগ ছিলো না। যেন বিচিত্র এবং প্রকাণ্ড শূন্যতার মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে, তার কিছুই করণীয় নেই। কোনো কিছুর সঙ্গেই সে আর সম্পর্কিত নয়।

ঐ সময় সে দূরে দেখতে পায় দু'জন লোক আসছে। লোক দু'টিকে এক সময় হঠাৎ ধাবমান হতে দেখে তার সন্দেহ হলো। এবং পরক্ষণেই তাদের হাতের অস্ত্র দু'খানিও দৃষ্টিতে এলো। সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই, সুতরাং সে আর কোনো প্রকার বিলম্ব করতে পারে না। দ্রুত নদীতীরে এসে নৌকাখানি নিয়ে সে পশ্চিমতীরে চলে এলো। দেখলো, হড়ডি বৃদ্ধটির কথাই যথার্থ। পূর্বতীরে তার বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে।

তুমি এখন তবে কার? বৃক্ষছায়ার নীচে, হট্টকুটিরে অর্ধশয়ান অবস্থায় নিজেকে প্রশ্ন করে সে। তুমি কি পিতামাতার? নাকি প্রিয়তমা পত্নীর? নাকি সেই বালগ্রামের কৃষ্ণা নাম্নী মন্দিরদাসীটির?

সে যেমন এখন কারও নয়, তেমনই আবার নিজেরও নয়। তুমি কি তোমার বসন্তদাস? প্রশ্ন করে সে উত্তর পায় না। 'ব্যক্তির অস্তিত্ব তো সম্পর্কে—তা সে যেমনই হোক—বস্তুসম্পর্ক হোক, অথবা হোক ব্যক্তিসম্পর্ক। আমি আমি বলে চিৎকার করলেই কি তাতে কিছু প্রমাণিত হয়? আমার এখন মানবসম্পর্ক নেই—পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজন, স্ত্রী-বন্ধু, কোনো সম্পর্কেই তো আমি এখন যুক্ত বোধ করি না। আর বস্তু সম্পর্ক? সেখানেও কি আমি যুক্ত? কোন পরিচয়টি আমার? আমি কি বণিক? বণিক হলে বিত্তহীন সম্বলহীন অবস্থায় আমি হট্টগৃহে একাকী শয়ান কেন? নাকি আমি ক্ষেত্রকর? তাহলে তো আমার গৃহবাসী হয়ে ক্ষেত্রকর্মে যুক্ত থাকার কথা।

না সে বণিক নয়। ঐ পরিচয় তার অপহৃত হয়ে গেছে ফল্গুগ্রাম জনপদে। এবং ক্ষেত্রকর পরিচয়টি ত্যক্ত হয়েছে আরও পূর্বে। এখন তাহলে কি সে ভৃত্য? দাস? নাকি

সাধু অথবা যোগী? সে নিজের জন্য কোনো অভিধা আবিষ্কার করতে পারে না। দুর্বাত্যা প্রবাহে উন্মূলিত ক্ষুদ্র পাদপের মতো অবস্থা তার। সে উপলব্ধি করে, এই অবস্থা তার একার নয়। প্রায় সকল মানুষেরই এই অবস্থা। তুমি ক্ষেত্রকর? কিন্তু ঐ পরিচয়ে তুমি স্থিত থাকতে পারবে না। একজন সামন্ত বা রাজপাদোপজীবী তোমাকে ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তুমি বণিক? তোমার ধন-সম্পদ, পণ্যসামগ্রী সমস্তই এক সুন্দর প্রভাতে দেখবে যে অপহৃত হয়ে গেছে। তুমি গৃহবধূ? তোমার রূপ-যৌবন দেখবে একদিন লম্পটের ভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বসন্তদাস উঠলো। শরীরে ক্লান্তি, মনে অবসাদ। আপাতত একটি কাজ তার এখন। আর তা হলো, মায়াবতীর অনুসন্ধান করা। হড়ডি বৃদ্ধের অনুমানটি সম্ভবত যথার্থ। পশ্চিম তীরের গ্রামগুলিতেই, যদি জীবিত থাকে, মায়াবতীর সন্ধান করতে হবে।

পথ আর পথ। শুধুই পথ অতিক্রমণ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর পথ অতিক্রম ক'রেও তার যাত্রা শেষ হলো না।

পথের আকর্ষণ অবশ্য বাল্যকাল থেকেই। ক্ষেত্রকরের পুত্র সে, কিন্তু কুলবৃত্তিতে তার মতি ছিলো না। গোচারণে গেলে কোনো না কোনো অঘটন ঘটাতোই সে। হয় তার গাভীটি প্রতিবেশীর ক্ষেত্র নষ্ট করেছে, নয় তার একটি গোবৎসকে সন্ধ্যাকালে পাওয়া যাচ্ছে না। পিতা হেমন্তদাস লাঠ্যৌষধি কম প্রয়োগ করেননি—কিন্তু কাজ হয়নি তাতে। দেওয়া হলো তাকে হল চালনার কাজ, দেখা গেলো, দ্বিপ্রহর না হতেই বলীবর্দ দু'টির পশ্চাৎপদগুলি রক্তাক্ত। লাঙলে তার মুষ্টি কখনই দৃঢ় হয় না। অমন কর্ষণকারীকে সহ্য করবে কোন গৃহস্থ? হোক না সে নিজ পুত্র!

দেখা যেতো সংসারে তার মন নেই। যখনই তার সন্ধান হতো, দেখা যেতো নদীতীরে ভাসমান নৌকাগুলির নিকটে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নৌযানের মানুষগুলির মুখে সে দূর দূর দেশের নাম শুনতো—বারাণসী, প্রয়াগ, কামরূপ, সোমদ্বীপ, বিক্রমপুর—আর এইসব নাম তার কিশোর মনের কল্পনায় নানান চিত্র মুদ্রিত করে দিতো।

বণিক নতুন হলেই হলো, সে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবেই। বলতো, মহাশয় কি দূর দেশ থেকে আসছেন? রাজধানীতে গিয়েছিলেন কি? আপনার নৌযানে কি প্রকার পণ্য? এ স্থানে কতদিন অবস্থান করবেন? এই প্রকার সব উপর্যুপরি প্রশ্ন। কোনো বণিক বিরক্ত

হতো। বলতো, কেন হে, এতো প্রশ্ন কেন তোমার? তুমি কি ভগিনী দান করবে? কোনো আসবমত্ত বনিক অশ্লীল ইঙ্গিত করতো। বলতো, বৎস, তোমার বোধ হয় পিতা নেই, তাই পিতার সন্ধান করতে এসেছো—যাও, তোমার মাতাকে আসতে বলো—তিনিই উত্তমরূপে আমার পরিচয়টি জেনে যাবেন।

কিন্তু ঐ প্রকার কর্কশ স্থূল বিদ্রূপেও বসন্তদাস নিবৃত্ত হতো না। শুধু বণিকেরা নয়, আর একটি আকর্ষণ ছিলো নদীতীরে। সে হলো কুটিরবাসী একজন যোগী। প্রায়, অষ্টপ্রহরই তিনি গীত গাইতেন। রামায়ণ-কাহিনী, ভারত-কথা, পুরাণ-বৃত্তান্ত—সমস্তই থাকতো তাঁর গীতে। ঐ প্রৌঢ় যোগীটি আবার শিক্ষাদানও করতেন। এক প্রকার উন্মাদ ছিলেন সম্ভবত। না হলে ধর্মহীন চণ্ডাল, হড্ডি, শবর ইত্যাদি নীচ জাতীয় বালকদের কেউ শিক্ষাদান করে? মৃত্তিকায় রেখা টেনে টেনে বর্ণপরিচয় হতো। কাজটি ছিলো গর্হিত। কেননা কে কবে শুনেছে যে, ডোমের পুত্র, হড্ডির পুত্র, বিদ্যাভ্যাস করে?

একদিকে বণিকদের মুখে দূর দেশের কাহিনী, অন্যদিকে উন্মাদ যোগীর কাছে বিদ্যাভ্যাস—এই দু'টি আকর্ষণ ছিলো প্রবল। ঐ সঙ্গে ছিলো আবার প্রাকৃত গীতগুলি। ঐ গীতগুলি তার বড় প্রিয় ছিলো। আর সেই কাহিনী, রামের বনগমনের দৃশ্যটি—পিতা মূর্চ্ছাহত, মাতা উন্মাদিনীপ্রায়, নগরবাসী 'হা রাম হা রাম' বলে হাহাকার করছে—কিন্তু রাম অবিচল। দৃঢ় পদক্ষেপে বনবাসে চলেছেন। কিংবা ধরো, গঙ্গা শান্তনুর বৃত্তান্তটি—সত্যভঙ্গ হয়েছে বলে গঙ্গা চলে যাচ্ছেন, শিশু সন্তান কাতরস্বরে মা মা ব'লে ডাকছে, স্বামী মিনতি করছেন, কিন্তু দেবী গঙ্গা অবিচল। শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতো কিশোর বসন্তদাস। ওদিকে পিতার যষ্ঠ্যৌষধি প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তাতে গ্রাহ্য ছিলো না বসন্তদাসের।

এবং প্রায়ই সে পলায়ন করতো। শীত আরম্ভ হলো—তারপর দেখো বসন্তদাস আর গৃহে নেই। সন্ধান করো, দেখবে, কিশোর বসন্তদাস মেলায় মেলায় পুত্তলি বিক্রয় করছে। শেষে কৈশোর অতিক্রান্ত হলে, নবীন যৌবনে একদা সত্য সত্যই সে পলায়ন করলো। কোথায় গেলো, কি বৃত্তান্ত, কেউ জানলো না। স্ত্রী রোদন করলে হেমন্তদাস শাসন করতেন। বলতেন, ঐ কুষ্মাণ্ডটার জন্য অহেতুক অশ্রুপাত করছো, ওর কি পিতামাতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে? অমন পুত্র না থাকাই উত্তম।

কিন্তু যখন সে ফিরলো, পিতা কিছু বলতে পারলেন না। কি বলবেন? ঐ যুবা পুরুষকে কি আর তখন কিছু বলা যায়? দেখছেন, দীর্ঘদেহ যুবা পুরুষটি—পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, মস্তকে দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, কর্ণে দু'টি স্বর্ণ কুণ্ডল, উর্ধ্বাঙ্গের উত্তরীয়খানি স্বর্ণাভ চীনাংশুক, অন্তরাল থেকে অঙ্গদের উজ্জ্বলতা চমকিত হচ্ছে। আর গমন ভঙ্গিটি এমত যে মনে হয় দূর দেশাগত ধনী কোনো শ্রেষ্ঠী অথবা সার্থবাহ ভ্রমণে বাহির হয়েছেন। অমন বয়স্ক সুপুরুষ পুত্রকে কি কিছু বলা যায়? বিশেষত সে পুত্র যখন বাণিজ্য করে গৃহে ফিরছে।

হেমন্তদাসের অর্থের প্রয়োজন ছিলো। গৃহসংস্কার হয়নি বহুকাল। গো-শালার খুঁটিগুলি হয়ে পড়েছিলো দুর্বল ও কীটদষ্ট, ভাণ্ডার গৃহের চালাগুলিতে পচন ধরেছিলো, শয়ন প্রকোষ্ঠের

গবাক্ষ ও দ্বারগুলির অবস্থা ছিলো শোচনীয়। এমতাবস্থায় পুত্রের উপার্জিত অর্থ তিনি সদ্ব্যবহার করলেন নিঃসংকোচে। ওদিকে আবার মাতৃদেবীরও সাধ, গৃহে বধূ আনবেন। পিতারও ঐ ব্যাপারে সমর্থন ছিলো। কারণ তিনি ভালো জানেন যে, যুবতী রমণীর বাহুপাশ ছিন্ন করে কোনো নবীন যুবকের পক্ষে বিদেশ যাত্রা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সন্ধান করো, কন্যা যেন যুবতী এবং রূপসী হয়। পুনর্ভবা তীরের দীনদাস নামক একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো হেমন্তদাসের। সে-ই এনে দিলো প্রকৃত সংবাদ।

কন্যাটি প্রকৃতই রূপবতী, যদিও বর্ণটি শ্যামল ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। বসন্তদাসের মাতা কন্যাটিকে দেখে আনন্দিত হলেন। সধবা রমণীরা হুলুধ্বনি করছিলো, তিনি ধানদূর্বা দিয়ে বধূবরণ করবেন। গৃহদ্বারে পিঁড়িখানি পাতা, বধূ পিঁড়িতে দাঁড়াবার পরও মাতা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন রূপবতী বধূটিকে। আহা কপালখানি যেন নবচন্দ্রিকা। ওষ্ঠ দু'টির তো তুলনা হয় না—যদি হতো, তাহলে বলা যেতো কামকুসুম—আর গ্রীবাটি দেখো, কী মসৃণ, বাহু দু'খানি কেমন সুগোল—আর বক্ষোদেশ? অমন কি দেখেছেন কোথাও? না, মনে পড়ে না।

অমন রূপবতী যুবতী যদি বাহুপাশে বাঁধতে না পারে নিজ পুরুষকে, তাহলে ধিক সে যুবতীকে।

কি হলো, বিলম্ব কেন? বধূবরণ করো? স্বামীর তাড়নায় বসন্তদাসের মাতা ধান-দূর্বা কুসুম-চন্দনাদি দিয়ে বধূকে বরণ করলেন।

অতঃপর বলাই বাহুল্য যে বসন্তদাসের দিবারাত্রির জ্ঞান লোপ পেয়েছিলো। পক্ষকাল যেন কাটলো ভয়ানক এক ঘোরের মধ্যে, রমণীদেহ তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিলো বলতে হবে। ওদিকে পিতা নিশ্চিন্ত, মাতার আনন্দ আর ধরে না।

তবে ভোগেরও শেষ আছে। পক্ষকালও গত হয়নি, বসন্তদাস পুনরায় উন্মন হয়ে উঠলো। ঐ সময় নদীতীরের ঘাটে নতুন বণিকেরা এসেছে। বসন্তদাসের সময় অতিবাহিত হয় তাদের সান্নিধ্যে। উপার্জিত অর্থও ততদিনে নিঃশেষিত প্রায়। সে বুঝে নিয়েছিলো, যাত্রার সময় হয়ে এসেছে।

কিন্তু ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করলো গ্রামপতি কুশল দত্ত। কার মুখে কী শুনেছিলো ঈশ্বর জানেন, একদা এসে হস্ত প্রসারিত করে দাঁড়াল। বললো, আমাকে দুইশত মুদ্রা ঋণ দাও।

কুশল দত্ত এমন ব্যক্তি যার হস্ত প্রসারিত হলে প্রত্যাহৃত হয় না। তা সে রমণী হোক অথবা ধনসম্পদ। তার এক কথা, তোমার নেই, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিন দিবসের মধ্যে আমার দুইশত মুদ্রা চাই—যদি স্বেচ্ছায় দাও, উত্তম, না হলে আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে।

বসন্তদাস ঘটনাটি কাউকে জানতে দিলো না। কেবল পিতাকে জানালো, আপনার পুত্রবধূ পিত্রালয়ে যেতে চায়। ঐটুকুই কথা। একই শকটে দু'জনে গৃহত্যাগ করলো অতঃপর। শেষে দেখা গেলো, পুত্রবধূ যথাস্থানে উপনীত হয়েছে কিন্তু পুত্র নিরুদ্দেশ।

আত্রেয়ীবক্ষে অপেক্ষমাণ অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে যাত্রারম্ভ। তারপর শকটারোহণ—দক্ষিণে যাত্রা, কখনও আবার ঈষৎ পশ্চিমে। এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। এক হাট থেকে অন্য হাটে—যদি শকট দুষ্পাপ্য হয়, তাহলে অশ্বারোহণ, কিংবা পদব্রজ। কোথাও তৈজসাদি কেনে, কোথাও কেনে গন্ধদ্রব্য, কোথাও লবণ, কোথাও ক্ষৌমবস্ত্র, কোথাও আবার দুকূল-জীনাংশুক। এই প্রকার ক্রয় এবং বিক্রয়। কখনও ক্ষতি এমন হয় যে, মনে হয়, এইবার তার বাণিজ্য শেষ। কিন্তু পরবর্তী উদ্যোগই তাকে আশাতীত লাভবান করে দেয়। দু' দু'বার তার আশাতীত লাভ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ লাভ থাকেনি। দস্যু এবং রাজ পুরুষদের উপদ্রব এমনই প্রবল যে বণিকের পক্ষে তিষ্ঠানো কঠিন। দস্যুরা কিছুই বলে না, আকস্মিকভাবে আসে এবং পণ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। কখনও কখনও প্রহারও করে। কিন্তু রাজপুরুষেরা তোমার বিপণীতে এলে ব্যবহার এমন করবে, যেন কতোদিনের পরিচয়। পানগুবাক খাবে, আলাপে নিমগ্ন হবে, হাস্যকৌতুকও করবে। শেষে প্রসারিত হস্তের অঙ্গুলি নির্দেশে একে একে দ্রব্যগুলি ভৃত্যের হাতে উঠতে থাকবে। ঐ ওঠার যেন শেষ নেই। মনে হবে, পারলে যেন সমস্ত বিপণীটিই স্কন্ধে তুলে নিয়ে যায়।

দুকূল বস্ত্রখানি নিলাম হে, ভারী সুন্দর এর বর্ণটি—মুক্তামালাগুলি বুঝি নব্যা-বকাশিকার? দু'খানি দাও, গৃহিণী পেলে সুখী হবে—আরে! তোমার কাংস্য স্থালীগুলি তো চমৎকার—এগুলি কি পশ্চিমের? আমার গৃহে কয়েকখানির প্রয়োজন, ওরে সুখদাস, স্থালীগুলি গৃহে নিয়ে যা।

বসন্তদাস ক্লান্তি বোধ করে এক্ষেত্রে সময়। গণনা করে দেখে, লাভালাভ শেষে একই প্রকার থেকে যাচ্ছে। অতিরিক্ত উপার্জন চলে যাচ্ছে দস্যু নয়তো সামন্তপতি গ্রামপতিদের হাতে। সে ক্রমে হতাশ হতে আরম্ভ করে। যখন যাত্রারম্ভ করে তখন শীতের শেষ। আশা ছিলো, বর্ষার পূর্বেই গৃহে ফিরবে। কিন্তু দেখলো অসম্ভব। সঞ্চয়ে প্রায় কিছুই নেই। অগত্যা স্থির করে, পথিমধ্যেই বর্ষাযাপন করবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত মতো সে গ্রাম্য বণিকের মতো হাটে হাটে সামান্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করে। ঐভাবেই যায় বর্ষাকাল। কিন্তু তাতেও লাভ হয় না। অবস্থা থেকে যায় যথাপূর্বং তথাপরং। সর্বত্রই কোনো না কোনো দুর্বিপাক। ধবলদীর্ঘিকা হাটে বন্ধু শঙ্খদত্ত করে প্রতারণা। সমস্ত পণ্য সে ক্রয় করে কিন্তু মূল্য পরিশোধ না করেই পলায়। ফলে বাণিজ্যে আর তার উৎসাহ থাকে না। শঙ্খদত্তের সন্ধানে তাকে যেতে হয় দেবীকোটের মেলায়। প্রাচীন নগরী দেবীকোট তখন পরিত্যক্তপ্রায়। কিন্তু বৎসরান্তে মেলাটি নিয়মিত বসে। শুনেছিলো শঙ্খদত্ত মেলায় অশ্ব ক্রয় করবে। কিন্তু দেখলো, ঐ মেলায় শঙ্খদত্তকে সন্ধান করা কঠিন। তার সঙ্গে তখনও কয়েকখানি মুক্তামালা ছিলো। সে মণিকার বিপণীগুলিতে ঐ মালা কয়খানি একে একে বিক্রয় করলো। বলা বাহুল্য, মূল্য পাওয়া গেলো আশাতীত। কিন্তু তারপর? তারপর আর তার বিক্রয় করার মতো কিছু নেই। সে স্থির করলো, এখন ক'দিন সে মেলা দেখবে এবং শঙ্খদত্তের সন্ধান করবে।

এও বোধ হয় ভবিতব্যই। না হলে সে বিলম্ব না করে গৃহে ফিরতে পারতো। জীবন তার হতো অন্য প্রকার। কেননা ঘটনা মানুষকে নানা বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেয়। মেলার ঘটনাগুলি আকস্মিক, কৌতূহলপ্রদ, কৌতুকময় এবং কোনো কোনোটি দুঃখবহও বটে। আর ঐ সকল ঘটনাই তাকে বিচিত্র পথে চালিত করে।

মেলার প্রান্তে একটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই এবং বড়ই জীর্ণদশা তার। কোনো এক সময় সম্ভবত পূজা হতো—এখন একেবারেই পরিত্যক্ত। শোনা যায়, ঐ মন্দিরে দেবী বজ্রতারা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কোনো এক সময় নাকি মঞ্জুশ্রী মূর্তিও সেখানে স্থাপিত হয়েছিলো। নিকটবর্তী দু'খানি গ্রামের নাম বজ্রেশ্বর ও মঞ্জুকল্প। গ্রাম দু'খানিই কেবল ঐ দুই দেবদেবীর নাম ধারণ করে আছে—নতুবা আর কোনো চিহ্ন তাদের নেই। মেলাটি যে কি উপলক্ষে বসে, তাও কেউ বলতে পারে না এখন।

বসন্তদাস পরিত্যক্ত মন্দিরটি দেখতে গেলে পরিচিত হয় এক যবন বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধটিও মন্দির দেখতে এসেছিলেন। সৌম্য শান্ত মুখাবয়ব, দেখলেই শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। আলাপে বসন্তদাস জানলো বৃদ্ধটি অশ্ববিক্রেতা। দশটি অশ্ব এনেছিলেন, সবই প্রায় বিক্রয় হয়েছে, অবশিষ্ট দু'টি বিক্রয় হলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। ঐ অশ্ব বিক্রেতাই জানালেন, শঙ্খদত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে—এবং সে দু'একদিনের মধ্যেই একটি অশ্ব ক্রয় করবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

ঐ সংবাদের পর কে আর স্থির থাকতে পারে। বসন্তদাস মেলার পশু হাটে শঙ্খদত্তের সন্ধান করতে থাকে। স্থানটি একেবারে নরকবিশেষ। অশ্ববিক্রয়ের স্থানটি সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। দু'দিকে অশ্বের সারি, মধ্যস্থলে প্রশস্ত পথ। ঐ পথেই চলেছে অশ্বের পরীক্ষা। কোন অশ্ব কতখানি শিক্ষিত ক্রেতারা তা পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। ফলে কখন যে ধাবমান অশ্ব কার স্কন্ধে এসে পতিত হবে তার স্থিরতা নেই। হৈ চৈ চিৎকার, ধাবমান অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, তাদের গ্রীবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুন্টিকা মালার ঝুম ঝুম শব্দ এবং মানুষের উল্লম্ফ পলায়ন, সমস্ত একত্রে স্থানটিকে যুগপৎ আকর্ষণীয় ও বিপজ্জনক করে রেখেছে।

আর হস্তি বিক্রয়ের স্থানটি তো একেবারেই অসহ্য। কপিত্থ পড়ে আছে ইতস্তত আর স্থানে স্থানে পুরীষস্তূপ। সেই স্তূপ আবার প্রায়শঃই মূত্রস্রোতে বিগলিত ও ভাসমান। দুর্গন্ধে ও স্থানে দাঁড়ানো যায় না। তদুপরি সময় নেই, অসময় নেই, মাহুতেরা কুলিশাঘাত করে আর দিগন্তকম্পী বৃংহণধ্বনি ওঠে। সে এমন চিৎকার যে কর্ণপটাহ ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হয়। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয় গো-হট্টে। কতো প্রকার, কতো আকারের যে গোধন হতে পারে তা এই মেলায় না এলে ধারণা করা যাবে না। এ স্থানেও দু'সারি গবাদিপশুর মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত পথ রাখা হয়েছে। সেখানে শকটবাহী বলীবর্দদের শক্তি এবং কৌশলের পরীক্ষা হচ্ছে। তাদের সুচিক্কণ লোমাবৃত দেহ, গর্বোচ্চ গ্রীবাভঙ্গী এবং সুছন্দ গমন দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না যে এগুলি বলীবর্দ। মনে হয় এগুলি অন্য কোনো প্রাণী। আর গাভীগুলিকে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। পশ্চিম দেশীয় গাভীগুলি বিদ্ধনাসা, তবে নথের সঙ্গে রজ্জু বাঁধা থাকলেও ক্রেতাদের পীড়নে একেকবার

এমন লম্ফ দিয়ে উঠছে যে তাদের শান্ত করতে বিক্রেতাদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। তাদের দুগ্ধস্থলীটি বিশাল এবং বাঁটগুলি প্রায় ভূমিস্পর্শী। প্রতিদিন নাকি দশ ভাণ্ড দুগ্ধ দিতে পারে এরা। দেশীয় গাভীগুলিই কি কম! খর্বাকার, কিন্তু এদের ওলানগুলিও কম স্ফীত নয়। শোনা যায়, এদের দুগ্ধদানের ক্ষমতাও প্রতিদিন পাঁচ ছয় ভাণ্ডের মতো।

বসন্তদাসের এই এক কাজ। প্রতিদিন পশুহট্টে বিচরণ, আর শঙ্খদত্তের সন্ধান। প্রতিদিনই যবন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও অপেক্ষায় আছেন, কখন লোকটি আসে এবং তার শেষ অশ্বটি ক্রয় করে নিয়ে যায়। বৃদ্ধটি একই পান্থশালার অতিথি, যদিও রাত্রিযাপন করেন ভিন্ন একটি প্রকোষ্ঠে। তবে অন্তরঙ্গতা হতে বিলম্ব হয়নি। দেখা হলেই বলেন, কি বৎস, তোমার মিত্র শঙ্খদত্তের দর্শন পেলে?

বৃদ্ধটি একেবারেই বৃদ্ধ—পক্বকেশ, শ্বেত শ্মশ্রু, এমনকি ভ্রূ-যুগল পর্যন্ত শুভ্র। তাঁর কাছে কতো যে কাহিনী সংখ্যায় গণনা করা যায় না। একবার আরম্ভ করলেই হলো, বিরতি হবে না সহজে, ক্লান্তিবিহীনভাবে বলে যেতে থাকবেন। অতিথিশালার অন্য আর একজনের সঙ্গেও বসন্তদাসের হৃদ্যতা হয়েছে—তবে সে হৃদ্যতা অন্য প্রকারের। বৃদ্ধ যখন তাঁর কাহিনী বলেন, তখন তাতে কৌতুক থাকলেও মাথা নত করে শুনতে হয়। শ্রদ্ধা ও প্রীতির এমন একাকার ভাব পূর্বে কখনও বসন্তদাস অনুভব করেনি।

বৃদ্ধ এবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করবেন। বাণিজ্য যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। গৃহে সকলে অপেক্ষা করে রয়েছে। একটি বালিকা কন্যা আছে তাঁর। কন্যাটি বড় আদরের। ইতোমধ্যে হয়তো বিবাহের বয়স হয়েছে। বৎস বলতে পারো, বিবাহের বয়স হলে দুহিতারা প্রবাসী পিতার কথা চিন্তা করে, না ভাবী স্বামীর চিন্তায় অধিক সময় ব্যয় করে? সাধ্য কি বসন্তদাসের যে ঐ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দেয়। সে হাসে প্রশ্ন শুনে। বলে, মহাশয় বুঝি আশা করেন যে কন্যারা সকলেই পিতার চিন্তায় নিশিদিনযাপন করুক?

না, তা নয়, একটি দীর্ঘশ্বাস নিঃসৃত হয় বৃদ্ধের বক্ষ থেকে। বলেন, বড় আদর করতাম কন্যাটিকে—ঐটিই কনিষ্ঠা কিনা—আর অপরূপ সুন্দরী হয়েছে সে দেখতে, যদি তুমি দেখতে! তুমি স্বজাতীয় হলে আমি তোমাকে জামাতা করতাম।

কথাটি কৌতুক, না সত্যভাষণ, কিছুই বোঝা যায় না। তথাপি সে জানায়, মহাশয়, আমি কিন্তু বিবাহিত।

তাতে কি, আমাদের সমাজে চারিটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার বিধান রয়েছে।

তাই বলে আপনি সপত্নী গৃহে কন্যাদান করবেন?

হ্যাঁ করবো, বৃদ্ধ হাসেন। বলেন, কারণ আমি জানি, আমার কন্যাটিই হবে জামাতার সর্বাপেক্ষা আদরণীয়া।

বস্ত্র ব্যবসায়ী অক্রূরদাস একেবারেই বয়স্য স্বভাবের। তার কৌতুকাদিতে বারণ থাকে না। যতো উদ্ভট প্রসঙ্গ তার আলাপে। একদা জানতে চাইলো, সখা বসন্ত, এদেশে রমণীদের বক্ষ স্তনশূন্য কেন বলতে পারো?

কি অদ্ভুত কথা! স্তনশূন্য বক্ষ যার সে রমণী হবে কি প্রকারে? বোঝে সে, পীতাঙ্গী পার্বত্যজাতীয়া রমণীদের কথা বলছে অক্রূরদাস।

সে জানায়, অক্রূরদাস, একবস্ত্রা ঐ রমণীদের বক্ষদেশে স্তন দুর্লক্ষ্য হলেও তাদের নারীত্বে সন্দেহ পোষণ ক'রো না—বিপদে পড়বে—রমণ রণে কিন্তু তারাই প্রথম আক্রমণ করে এবং পুরুষকে নিঃশেষিত না করে ত্যাগ করে না।

বসন্তদাস লক্ষ্য করছে, রাঢ়দেশবাসী অক্রূরদাসের নারী বিষয়ে আগ্রহ অত্যধিক। ঐ প্রসঙ্গ একবার পেলেই হলো, প্রহরের পর প্রহর সে আলাপ করে যাবে।

শঙ্খদত্তের সন্ধান করার সময় একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখলো সে একদিন। কাষায় বস্ত্রধারী, পীতবর্ণ, মুণ্ডিতমস্তক একদল লোক সারিবদ্ধভাবে প্রাচীন মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। সকলের মতো তারও কৌতূহল হলো, এরা কারা? কেউ বললো, এরা বণিক—কেউ বললো, এরা সদ্ধর্মী ভিক্ষু, হিমালয়ের পরপার তিব্বত দেশ থেকে এসেছে—আবার কেউ বললো, না হে, এরা সমুদ্রপারের মানুষ, তীর্থস্নানে চলেছে।

প্রকৃত পরিচয় কেউ দিতে পারে না। তবে লক্ষ্য করা গেলো, দেশী ভিক্ষুরা তাদের সঙ্গে সাগ্রহে আলাপ করছে।

পরদিন প্রভাতে আর তাদের দেখা গেলো না। তবে জল্পনা-কল্পনা চললো পরদিনও। অশ্বহট্টের লোকদের মুখে উদ্বেগ চিহ্ন। তাদের আশঙ্কা, ভয়ানক কিছু ঘটবে—সদ্ধর্মীদের এতো সংখ্যক লোক একত্র হয়েছে, এ শুভ লক্ষণ নয়। বসন্তদাস শঙ্খদত্তের কথা জিজ্ঞাসা করলে একজন বিরক্ত হয়ে জানায়, মহাশয়, আপনার কি মস্তিষ্কের দোষ হয়েছে, প্রতিদিন এক কথা? আমরা কি রাজার গূঢ় পুরুষ যে প্রতিটি লোকের আগমন নির্গমনের সন্ধান জেনে রেখেছি? এখন যান, বিরক্ত করবেন না।

সন্ধ্যাকালে দেখা গেলো মেলার লোক পলায়ন করছে। কি বৃত্তান্ত, কেউ জানে না। শুধু জনরব শোনে। ঐ আসে তারা, শীঘ্র পলাও—ঐ এসে গেলো। পলায়ন করুন মহাশয়, যদি প্রাণ রক্ষা করতে চান।

ক্রমে জানা গেলো, নিকটেই কোথাও ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হবে। রাজার সেনাদল আসছে বিদেশী সদ্ধর্মীদের দমন করতে। যতো শীঘ্র পারা যায়, পলায়ন করা উত্তম। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

কোথায় কি! শেষাবধি কিছুই হলো না। পরদিন দ্বিপ্রহরে দু'জন অশ্বারোহী দেখা গেলো—তারা ভিক্ষুদের সন্ধান করলো প্রথমে, তারপর মন্দিরগৃহে বিশ্রাম করতে গেলো। অপরাহ্নে দেখা গেলো ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল আসছে। তারা মেলার কিছু খাদ্যদ্রব্য ও কয়েকটি বিপণী লুণ্ঠন করে বিদায় হলো।

কিন্তু ততক্ষণে মেলার অর্ধাংশ শূন্য হয়ে গেছে।

ঘটনাটি বসন্তদাসকে হতাশ করে দিলো। সে বুঝলো, শঙ্খদত্তকে আর পাওয়া যাবে না।

অপরাহ্নের দিকে একদিন অক্রূরদাস তাকে শয্যা থেকে তুললো। বললো, চলো সখা, আজ কিঞ্চিৎ আনন্দ উপভোগ করে আসি। তোমাকে আজ অতীব উপভোগ্য বস্তু দেখাবো।

অক্রূরদাসের স্ফূর্তির কারণ ছিলো। সমস্ত বস্ত্র তার বিক্রয় হয়ে গেছে, এখন সে মুক্ত পুরুষ। দিন দুই আমোদ উপভোগ করবে, তারপর গৃহের সন্তান গৃহে ফিরে যাবে। সে ইতোমধ্যে দু'খানি শাটিকা বসন্তদাসকে উপহার দান করেছে। ভারী সুন্দর বস্ত্র দু'খানি। একখানি স্বর্ণাভ চীনাংশুক—কল্পনায় মায়াবতীর দেহে ঐ বস্ত্র দেখে সে সাগ্রহে বস্ত্রখানি গ্রহণ করে। আর অন্যখানি গাঢ় নীল বর্ণের পট্টবস্ত্র। তাতে আবার স্বর্ণসূত্রের সূচিকর্ম। শাটিকাখানি মেলে ধরলে মনে হবে তারকাখচিত রাত্রির আকাশ। শ্যামবর্ণা মায়াবতীর দেহে ঐ বর্ণের বস্ত্র যে মানাবে না, তা সে জানতো। তাই বস্ত্রখানি গ্রহণ করতে তার ইতস্তত বোধ হচ্ছিলো। তাতে অক্রূরদাস হেসে ওঠে। বলেছিলো, নাও সখা, নিয়ে রাখো—সমস্তই যে পত্নীকে দিতে হবে এমন তো কথা নেই—পত্নী ব্যতিরেকেও তো কোনো রমণী বাঞ্ছিতা হতে পারে।

অক্রূরদাসের আগ্রহে সে সঙ্গী হলো। কিন্তু এমন স্থানে সে নিয়ে গেলো যেখানে যাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। অক্রূরদাস তাকে নিয়ে তুললো একেবারে বারাঙ্গনা পল্লীতে। তাকে অপ্রতিভ দেখে জানতে চাইলো, সখা বসন্ত, এই কি তোমার প্রথম? পূর্বে কখনও এরূপ স্থানে আসোনি?

বসন্তদাস বিরক্ত হচ্ছিলো। উত্তর না দিয়ে বললো, চলো, কোথায় যাবে।

সে এক অদ্ভুত জগৎ। কুটিরের দ্বারে দ্বারে বাররমণীরা। ওষ্ঠ রক্তিম, কপোলে শঙ্খচূর্ণ এবং তদুপরি কুঙ্কুম বিন্দু। কঞ্চুলীগুলি এতোই স্ফীত যে সন্দেহ হয় ভিতরে গোলাকার প্রস্তরখণ্ড বাঁধা। সে এমন কখনও দেখেনি। নিজ গ্রামে হাটের প্রান্তে কয়েকটি ডোম এবং হড্ডি কুটিরের কথা সে জানে, যেখানে কয়েকটি শিথিলশাসনা রমণী বাস করতো। তারা এমন সাজসজ্জা করতো না। অন্য দশটি রমণীর মতোই ছিলো তাদের বেশবাস। জনরব ছিলো যে তারা অর্থের বিনিময়ে দেহোপভোগ করতে দিতো। কিন্তু এ যে দেখছে, একেবারেই অন্য রূপে যেমন, তেমন আকার প্রকারেও।

মাদকসেবী নাগরেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করছিলো। কেউ নীবিবন্ধন ছিন্ন করার কপট ভঙ্গি করছিলো, কেউ মুখ চুম্বন করছিলো, কেউবা অহেতুক চিৎকার করছিলো। অক্রূরদাস একটি কুটিরের দ্বারদেশে উপনীত হয়ে বললো, সখা, এখানে দাঁড়াও। অতঃপর কুটিরের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করলে ভিতর থেকে চিৎকার শোনা গেলো। রমণীকণ্ঠ চিৎকার করে বলছে, রে কুক্কুরীপুত্র, রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখ নিজেকে, আমার কুটিরে এখন লোক আছে।

ঐ কথা শুনে বসন্তদাস আমূল বিচলিত হলো। একটি বিবমিষার ভাব তার সমগ্র দেহাভ্যন্তরকে আলোড়িত করতে লাগলো। অন্য লোক যে রমণীতে উপগত হয়েছে সেই রমণীতেই তুমি গমন করবে? এ কীভাবে সম্ভব? তোমার কি ঘৃণা নেই? যদি অন্যজনের

উপগমন হতো তোমার অজ্ঞাতে, তাহলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ-তো স্পষ্ট, তবু তোমার রুচি থাকবে? ছি ছি। সে ডেকে বললো, অক্রূরদাস, আমি চললাম—তোমার আনন্দ নিয়ে তুমি থাকো।

অক্রূরদাস আসব পান করেছিলো। তার তখন ঈষৎ মত্তাবস্থা। বললো, কেন সখা, তোমার কি যুবতী রমণী অভিপ্রেত নয়? যদি বলো, তাহলে কিশোরী অথবা বালিকা সন্ধান করি।

বসন্তদাস কি বলবে ভেবে পায় না। তবু বলে, অক্রূরদাস, তোমার ঘৃণা হবে না? যে রমণীকে ক্ষণমাত্র পূর্বে অন্য লোকে ব্যবহার করেছে তার কাছে যেতে তোমার রুচি হবে?

কেন হবে না? অক্রূরদাস বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বসন্তদাসের মুখপানে চায়। ক্রমে যেন বোঝে কথাটি। শেষে হা হা রবে হেসে ওঠে। বলে, তুমি হাসালে সখা, অন্যের উপগমনের চিহ্ন কি ঐ স্থানে খোদিত হয়ে থাকবে? বারেক ধৌত করে নিলেই হলো।

ঐ সময় একটি কোলাহল সৃষ্টি হয় স্থানটিতে। দেখা যায়, সশস্ত্র প্রহরীদের একটি ক্ষুদ্র দল সদর্পে অগ্রসর হচ্ছে কুটিরগুলির দিকে। বসন্তদাস অনুমান করে, একটি গোলযোগ আসন্ন। সে বিলম্ব না করে ঐ স্থান ত্যাগ করে।

পান্থশালার দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন যবন বৃদ্ধটি। বসন্তকে দেখে বললেন, বৎস তুমি না বন্ধুর সঙ্গে আনন্দোপভোগের জন্য গেলে—তা এতো শীঘ্র ফিরলে যে? কি দেখলে, নাটগীত নাকি বাজিকরের খেলা?

বসন্তদাস সামান্য ইতস্তত করে। তারপর ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, না মহাশয়, ওসব নয়—আমরা বারাঙ্গনাদের পল্লীতে গিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ অপ্রস্তুত হলেন। শেষে সহজ হওয়ার জন্য ঈষৎ হেসে বললেন, তাহলে শীঘ্র ফিরলে যে?

বসন্তদাস নিজেরই কাছে অপমানিত বোধ করছিলো ঐ সময়—ক্রোধ হচ্ছিলো তার। বৃদ্ধের কথা তার বিরক্তি উৎপাদন করলো। বললো, হ্যাঁ, শীঘ্রই ফিরলাম। সকলের রুচি কি একপ্রকার?

না, তা বলিনি আমি, বৃদ্ধ সহজ স্বরে বলেন—সে তুমি যা-ই বলো, কেউ তোমার কথা এখন বিশ্বাস করবে না!

মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কি আমার কোনো প্রকার দায় আছে?

না, তা নেই, বৃদ্ধ স্বীকার করেন। বলেন, বরং তুমি চলে এসে উত্তম কাজই করেছো—ঐ অভ্যাস কুৎসিত, শাস্ত্রে বলে, অত্যধিক রমণীআসক্তি পুরুষকে দরিদ্র ও নির্বীর্য করে।

ঐ সময় একটি কোলাহল শোনা গেলো। স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার এবং গালাগালি করতে করতে একদল লোক এদিকেই আসছে। নিকটে এলে দেখা গেলো, সকলেই পান্থশালাবাসী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক। এরা সকলেই আনন্দ সম্ভোগের সন্ধানে সন্ধ্যাকালে পান্থশালা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলো।

একজন বললো, ওহে বালিকাটি বোধ হয় সত্যই সুভগা ছিলো।

অপরজন বললো, আর ঐ যুবতীটি! নিতম্ব দু'টি যেন পূর্ণকুম্ভ।

অন্য আরেকজন জানতে চাইলো, ওহে এতো বাক্যব্যয় যে করছো, অগ্রে বলো, তোমরা ঐ বালিকা এবং যুবতীটিকে কি শয্যায় পেয়েছিলে?

না সখা, পাইনি, শূকরপুত্র সৈনিকেরা এমত তাড়না করলো যে আমাদের পলায়ন না করে উপায় রইলো না—আহা, বালিকাটি এতো কোমল—যদি একবারের জন্যও পেতাম।

আরে মর্কট, অন্য আর একজন ধিক্কার দিয়ে উঠলো, ধিক তোকে যে, যুবা পুরুষ হয়েও বালিকা বালিকা করছিস। বালিকা রমণে আর এমন কি সুখ! পারঙ্গমা যুবতী রমণরণে স্বেদাক্ত হলে কেমন দেখায়, দেখেছিস কখনও?

ঐ সময় হঠাৎ এক ক্ষীণাঙ্গ প্রৌঢ় ছুটে এসে বৃদ্ধের পদপ্রান্তে উপবেশন করে। বলে, আপনিই বিচার করুন মহাশয়, রাজপ্রহরীরা কী মনে করে নিজেদের? রমণী সম্ভোগের অধিকার কেবল কি ওদেরই? আমাদের দেহে কি বস্তুটি নেই, আঁ? এ কি বিচার তাদের!

প্রত্যেকেই লম্পট এবং প্রত্যেকেই মাদক সেবন করে এসেছে। তাদের প্রমত্তাবস্থার ব্যবহার ন্যক্কারজনক—প্রত্যেকের মুখে দুর্গন্ধ। আর কথা কি তাদের! ঐ স্থানে তিষ্ঠানো দায়। দেখা গেলো বসন্তদাস নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সে চিৎকার করে গালাগালি করতে লাগলো। বললো, তোমরা মক্ষিকীট, বুঝেছো? মলভাণ্ডই তোমাদের যথার্থ স্থান—তোমাদের শাস্তির এখনই কি হয়েছে? অচিরেই তোমরা শিক্ষা পাবে, চোরের দল, লম্পটের দল কোথাকার।

কিন্তু ঐ ভর্ৎসনায় কী লাভ! সম্বিৎহীনদের কানে তো ঐ প্রকার ভর্ৎসনা পশে না। তাকে উত্তেজিত দেখে বৃদ্ধ হাত ধরে নিয়ে গেলেন অদূরে এক বৃক্ষতলে। বললেন, তুমি অযথা উত্তেজিত হচ্ছো বৎস—এ-তো তোমার একার দায় নয়—তুমি একাকী উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ আছে, বলো?

বড় বিচিত্র তোমাদের এই দেশ, বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, এতো দস্যু এতো মাদকপায়ী এবং এমন বিশৃঙ্খল শাসন আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেশের মানুষ যে কীভাবে জীবনযাপন করে, আমি ভেবে পাই না। বণিকবৃত্তি ধনাগমের প্রধান উৎস। কিন্তু দেখছি এদেশে বণিকবৃত্তি অসম্ভব। সকল দেশে রাজপুরুষেরা বণিকদের রক্ষা করে—কিন্তু এদেশে দেখছি ভিন্ন রীতি, এখানে রাজপুরুষেরা পারলে বণিকের সমস্তই গ্রাস করে। এদিকে বণিকদের মধ্যেও দেখো, নিজ বৃত্তি রক্ষার কোনো চেষ্টা নেই। এই যে দেখছো ক্ষুদ্র বণিকদের, এদের কারও মধ্যে উচ্চাশা লক্ষ্য করেছো? অল্পেই এরা তুষ্ট। আর যেটুকু বা উপার্জন করে, তার প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়ে যায় ব্যসনে। ঐ যে গন্ধ বণিকটিকে দেখলে, আসবপান ও গণিকালয়ের ব্যয় সংকুলানের পর তার আর কী অবশিষ্ট থাকবে, ভাবো তো?

এ আবার অধিক হয়ে যাচ্ছে, বসন্তদাসের মনে হলো। বিদেশী মানুষ তিনি, কেন এতো অধিক কথা বলবেন? সামান্য বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্বদান একেই বলে। সে বলে উঠলো, মহাশয় দেখছি ক্ষুদ্র বিষয়কে অহেতুক গুরুত্বদান করছেন, আপনার কথা মিথ্যা নয়—কিন্তু সংসারের তো এই-ই রূপ, সমস্ত কিছুই উত্তমানুত্তমে মিশ্রিত। রাজপুরুষের শাসনের মধ্যেও কি প্রকারভেদে পার্থক্য অধিক থাকে? পীড়ন ও যথেচ্ছাচারকেই তো শাসন বলা হয়, এর অন্যথা যদি কোথাও কিছু থাকে, তাহলে বলতে হবে সেটি ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমকে কি বিধান বলবেন? আজীবন আমরা এই-ই দেখে আসছি। আর বণিকেরা বিলাসব্যসন না করলে কে করবে বলুন? শুধু বণিক কেন, অর্থবান মানুষমাত্রই বিলাসব্যসন করে। দরিদ্রকে বিলাসী হতে দেখেছেন কখনও?

যবন বণিকটি মৃদু হাসেন বসন্তদাসের কথা শুনে। বলেন, তুমি আহত হবে জানলে কথাটি আমি ঐভাবে বলতাম না। বৎস, চিন্তা করে দেখো, কিরূপ বেদনার কথা। বঙ্গ ও বরেন্দ্রে বণিকবৃত্তিই ছিল প্রধান—এদেশের পণ্য এতো দূর দূর দেশে যেতো যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সমুদ্র পর্বত অতিক্রম করে দূরদূরান্তরে পণ্য বিক্রয় সহজ কথা নয়। অথচ সেই কাজটিই করতো এ দেশীয় বণিকেরা। এখন স্বর্ণরৌপ্য তোমরা দেখতে পাও না—কিন্তু এদেশে গৃহে গৃহে এতো স্বর্ণরৌপ্য ছিলো যে বলার কথা নয়।

বৃদ্ধ ভিন্ন দেশবাসী কিন্তু এদেশের কতো সংবাদ জানেন। বসন্তদাসকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে হয়। তার শোনা ছিলো, কয়েক শতাব্দ পূর্বে বঙ্গ বরেন্দ্রের সেনাবাহিনী দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে অঙ্গ কলিঙ্গ মগধ মিথিলা বিদেহ কোশল ইত্যাদি কতো যে দেশ জয় করেছিলো তার নাকি ইয়ত্তা ছিলো না। সে বুঝতো ঐ সব অতীতের কল্পকথা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিন্তু এখন, বৃদ্ধের কথা শোনার পর, মনে হচ্ছে, কে জানে, হয়তো ঐ দিগ্বিজয়ের ঘটনাটিও সত্য সত্যই ঘটেছিলো। তবে বৃদ্ধের সকল কথায় আর তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এতো অকল্পনীয় ঘটনার কথা কি বিশ্বাস করা যায়?

সে জানতে চাইলো একদা, মহাশয় এতো কথা আপনি কোথায় জেনেছেন? আমি তো কখনও শুনিনি।

বৃদ্ধ বসন্তদাসের মুখপানে চেয়ে হাসেন। বলেন, বৎস, তোমরা নিজেকে জানো না—আত্মবিস্মৃতির মতো পাপ আর নেই। এ সকল সংবাদ তুমি যেমন আমার কাছ থেকে জানছো, সেই রূপই আমি অন্যের কাছ থেকে জেনেছি। প্রয়াগের এক বৃদ্ধ বণিক তোমাদের এই সমৃদ্ধ দেশের কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। তোমার সন্দেহ হলে কোনো জ্ঞানী পণ্ডিতের নিকট সন্ধান করে জেনে এসো, আমার কথা সত্য না মিথ্যা।

বসন্তদাস দু'তিনটি দিন মাত্র বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে। কিন্তু ঐ দু'তিন দিনেই বৃদ্ধ তার কাছে বহু কথা বলেছেন। পশ্চিম দেশে নাকি এক শ্রেণীর শস্ত্রধারী যবনের আবির্ভাব হয়েছে যাদের নাম তুরুক। ঐ যবনেরা একের পর এক রাজ্য জয় করছে। তারা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই নাকি বর্বর। ধ্বংস ও লুণ্ঠন ব্যতীত তারা অন্য কিছু বোঝে না। আবার এও এক অদ্ভুত কথা যে যবন বণিকদের ধর্ম ও তুরুকদের ধর্ম এক হওয়া

সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সম্ভাব নেই—বরং শত্রুতা ভাবই পোষণ করে গোপনে গোপনে—এইরূপ নানান কথা বৃদ্ধের। তবে এই সকল কথার মধ্য দিয়ে বসন্তদাস একটি ভিন্নতর জগতের সন্ধান পাচ্ছিলো। যেমন, সমস্ত কিছুই ললাটলিপি নয়—রাজা রাজপুরুষ কেউ অজেয় নয়। রাজার বিরুদ্ধে প্রজা দ্রোহ উত্থাপন করতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সফলও হয়। আরও বুঝছিলো, ছুৎমার্গ একেবারেই অহেতুক। স্পর্শ মাত্রই খাদ্যবস্তু নষ্ট হয় না। যে মনে করে হয়, সে মূর্খ। চণ্ডাল ব্রাহ্মণভেদে জলের গুণাগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—জল জলই থাকে। কেবল দেবতা সম্পর্কিত বিষয়টি সে বোঝেনি। প্রকৃত কথা এই যে, মেলায় অবস্থান এবং যবন বণিকের সান্নিধ্য বসন্তদাসের মনের মধ্যে একটি রূপান্তরের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে দেয়। বস্তুর আপাত অবয়বের পশ্চাতেও যে অন্যকিছু থাকতে পারে, সে বিষয়ে সে এখন সজাগ ও সচেতন।

শঙ্খদত্তের আশা সে ত্যাগ করেছিলো। সুতরাং মেলায় অবস্থানের কোনো যুক্তিই তার ছিলো না। কেবলি মনে হচ্ছিলো, অহেতুক তার কালক্ষেপণ। অতঃপর সে গৃহে প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত নেয়। সন্ধান ক'রে সে পূর্বগামী একদল বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। হ্যাঁ, তারা জানায়, শকটারোহণে বসন্তদাস স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে যেতে পারে।

সুতরাং বিলম্ব কেন, শিবনাম স্মরণ ক'রে এবার যাত্রা করো, অক্রূরদাস পরামর্শ দেয়।

মেলায় সে তিনটি ক্ষুদ্র দ্রব্য ক্রয় করে। বলাবাহুল্য, সবই মায়াবতীর জন্য। একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়, যার পৃষ্ঠে তিনখানি ক্ষুদ্র বর্ণাঢ্য প্রস্তরখণ্ড, দুটি রক্তবর্ণ চুনির মধ্যস্থলে একটি শুভ্র মুক্তাফল। দেখলে নয়ন জুড়ায়। তার দ্বিতীয় ক্রয়ের বস্তু একটি ক্ষুদ্র তৈলপাত্র। কাংস্যনির্মিত, কিন্তু এমনই উজ্জ্বল যে চক্ষু ধাঁধে—ভ্রম হয়, বুঝিবা স্বর্ণ। তবে পাত্রটির আকর্ষণ উজ্জ্বলতার কারণে নয়। তার আকর্ষণ বহিরঙ্গের খোদিত ফুল লতাপাতার কারণে। আর তৃতীয় বস্তুটি হলো গজদন্ত নির্মিত ক্ষুদ্র একটি সিন্দুর পাত্র। পাত্রটি এমনই হৃদয়গ্রাহী যে একবার দৃষ্টিপাত করলেই মনে হবে, আহা এমন আর হয় না।

সন্ধ্যাকালে মেলায় যখন ঐ দ্রব্যগুলি ক্রয়ে সে ব্যস্ত, ঐ সময় যবন বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি তরল পদার্থে পূর্ণ ক্ষুদ্র একটি পাত্র এনে দিলেন হাতে। পাত্রটির মুখ বন্ধ ছিলো। এবং আকারে সেটি অঙ্গুলি পরিমাণ হবে কি না সন্দেহ। পাত্রটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বাতাস সুগন্ধে এমন আমোদিত হয়ে উঠলো যে বলার কথা নয়। তরল পদার্থটি নাকি পুষ্পাসব। তথ্যটি জানিয়ে বৃদ্ধ বললেন, বধূমাতাকে দিও এটি, শয়নকালে যেন বিন্দু পরিমাণ অঙ্গে লেপন করেন।

পদার্থটির নাম নাকি ইতর। হাস্যকর নাম বলতে হবে। বসন্তদাসের কৌতুক বোধ হয় নাম শুনে। বলে, এক দেশের বুলি তাহলে সত্যসত্যই অন্য দেশের গালি হয়ে থাকে।

বৃদ্ধের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা পূর্বেই হয়েছে। তথাপি ঐ স্নেহের দান গ্রহণ ক'রে সে অভিভূত বোধ করে। বলে, মহাশয়, আমি আপনাকে বিনিময়ে কী দেবো বুঝতে পারছি

না। বৃদ্ধ হাসেন। অতঃপর জানান, তোমার কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই—তুমি এই বৃদ্ধকে যেভাবে গ্রহণ করেছো তাতেই আমি অভিভূত—এদেশে এমন আত্মীয়জ্ঞান আমাকে কেউ করেনি।

বৃদ্ধ বিদায় নিলেন। বললেন, আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ করছি। প্রভাতে যদি নিদ্রিত থাকি, কিছু মনে ক'রো না।

ইতস্তত ভ্রমণকালে অক্রূরদাসের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ।

সে কৌতুক স্বরে বললো, সখা বসন্ত, যাবে নাকি একবার, শেষবারের মতো?

বারাঙ্গনা পল্লীতে যাবার ইঙ্গিত। বসন্তদাস হাসে। বলে, না সখা, আমার সঞ্চয়ে অতো রস নেই যে যত্র তত্র ঢালবো, তুমি যাও।

সে আরও দ্রব্য ক্রয় করতে পারতো, কিন্তু করলো না। নিজের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে যা আছে তা সে অন্যভাবে ব্যয় করতে চায়। অর্থোপার্জন যে কি বস্তু, সে তো তার দেখা হয়েছে। না, আর বাণিজ্য নয়। বন্ধু শঙ্খদাস তাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাটি দিয়ে গেছে। ক্ষেত্রকরের পুত্র সে, তার ক্ষেত্রকর হওয়াই উচিত। গৃহে যদি স্বর্ণমুদ্রা কটি অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে, তাহলেই সে নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করবে। যা তার সঞ্চয়ে আছে, একজন ক্ষেত্রকরের কাছে তার মূল্য বিপুল। এই অর্থে সে দুই কুলব্যাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় অনায়াসে করতে পারে। ঐ পরিমাণ ভূমি ক্রয় কম কথা নয়। দুই না হোক, এক কুলব্যাপ ভূমি অবশ্যই ক্রয় করবে সে। গ্রামসামন্তপতিরা কেউ না কেউ স্বর্ণের বিনিময়ে নিশ্চয়ই ভূমিদান করতে সম্মত হবে। অন্য কেউ না হোক, কুশলদত্ত তো নিশ্চয়ই হবে। কেননা তার অর্থাভাব সর্বক্ষণ থাকে। সুতরাং এখন থেকে বসন্তদাস ক্ষেত্রকরের পুত্র ক্ষেত্রকর। সে চিন্তা করে দেখেছে, এই ব্যবস্থাই উত্তম। দেশে দেশে ভ্রমণ—কিন্তু পরিণামে লাভ বন্ধুর প্রতারণা, দস্যুর আক্রমণ এবং রাজপুরুষদের তাড়না। কি প্রয়োজন ঐ বৃত্তির। ক্ষেত্রকর্মই তার জন্য উত্তম।

পরদিন প্রত্যূষে সে যাত্রার আয়োজন দেখতে গিয়েছিলো। সেখানেই গৃহগামী বণিকদের সঙ্গে আলাপে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। পান্থশালায় যখন প্রত্যাগমন করছে তখন সূর্যোদয়ের পর দণ্ডাধিককাল অতিক্রান্তপ্রায়। ঐ সময় লক্ষ্য করে মেলার লোকেরা পলায়ন করছে। কি ব্যাপার! সে একজনকে ডাকলো। জানতে চাইলো, কিছু হয়েছে কি?

সর্বনাশ হয়েছে মহাশয়, প্রাণরক্ষা করতে চান তো পলায়ন করুন। বিসূচিকা, বিসূচিকা দেখা দিয়েছে।

বসন্তদাস ক্ষণেক দাঁড়ায়। সে জানে বিসূচিকা মারী রোগ। এবং মেলায় যদি ঐ রোগ দেখা দেয়, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। সে পলায়নকারীদের ত্রস্ত ভঙ্গি ও মুখভাবে ভয়ানক আতঙ্ক দেখতে পায়। মনে মনে চিন্তা করে, তারও বিলম্ব করা উচিত নয়।

কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখে অক্রূরদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। নিকটে এসে বলে, সখা বসন্ত, চললাম, যদি জীবিত থাকি দেখা হবে।

বসন্তদাস কঠিন মুষ্টিতে অক্রূরদাসের হাত ধরে। বলে, কি হয়েছে তোমার, উন্মাদের মতো আচরণ করছো কেন?

সখা, আমার, আমারও যেন বমন ভাব হচ্ছে, শেষে আমিও কি আক্রান্ত হলাম? হে ভগবান রক্ষা করো—আমি ছিলাম তার পার্শ্বের শয্যাটিতে। হায়, হায়, কেন যে পান্থশালায় ম্লেচ্ছ যবনদের স্থান দেওয়া হয়।

ঐ কথা শোনার পর বসন্তদাস আর মুহূর্তেকও দাঁড়ায় না। তার অনুমান হয়, অন্য কেউ নয়, যবন বৃদ্ধটিই আক্রান্ত হয়েছেন। গত রাত্রে তিনি অসুস্থতার কথা বলেছিলেন।

পান্থশালায় এসে দেখে একটি লোকও নেই। প্রকোষ্ঠে বৃদ্ধ একাকী শয্যাশায়ী। একবার উঠতে চাইলেন, পারলেন না। চক্ষু দু'টি কোটরাগত। সুন্দর গৌর মুখখানিতে পাণ্ডুর ছায়া। একটি দুর্গন্ধ ঘ্রাণে আসছিলো। লক্ষ্য করে দেখলো, বৃদ্ধের নিম্নাঙ্গের শয্যা সিক্ত। শয্যার দু'পাশের ভূমিতে বমন চিহ্ন। বোঝা যায়, তাঁর দেহ এখন উত্থানশক্তিরহিত। সে কী করবে বোধগম্য হচ্ছিলো না। একবার ভাবলো, পলায়ন করে। কিন্তু ঐ সময়ই বৃদ্ধ হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। বসন্তদাসের আর পশ্চাদপসরণ করা হলো না। নিকটে গেলে বৃদ্ধ বললেন, জল দিতে পারো? সে কলস থেকে জল এনে বৃদ্ধের মুখে ধরলো। জলপান করে বৃদ্ধ চক্ষু দু'টি মুদিত করে বললেন—তুমি চলে যাও, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই।

মাত্র ঐ ক'টি কথা উচ্চারণ করেন বৃদ্ধ। কিন্তু বসন্তদাসের মনে হয়, ঐ কথা ক'টি উচ্চারণ ক'রে যেন জগৎ সংসারকে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। কথা ক'টির মধ্যে দারুণ তাচ্ছিল্যের ভাব। যেন বলতে চাইলেন, তোমরা আমাকে ত্যাগ করলে, আমিও তোমাদের ত্যাগ করলাম। সে ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, বসন্তদাস তুমি কি পলায়ন করবে? তৎক্ষণাৎ মনে হয়, পলায়ন করাই তার উচিত। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার মনে হয়, বৃদ্ধের শয্যাটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পুনরপি লক্ষ্য করে, তাঁর পানের জন্য জলও আবশ্যক হবে। পলায়ন তো সে করতেই পারে। পদযুগল সচল করলেই হয়। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির মুখে জল কে দেবে? ঐ নষ্ট শয্যাতেই বা তিনি কেমন করে থাকেন। সে বৃদ্ধকে তুলে পার্শ্ববর্তী শয্যায় নিয়ে গেলো। এবং পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলো, জল পান করবেন? জল দেবো?

বৃদ্ধের সম্ভবত আর জ্ঞান ছিলো না। আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করলেন কয়েকবার, নিজ ভাষায় কিছু যেন বললেন কাউকে। কিছুই বোধগম্য হয় না বসন্তদাসের। সে তখন পান্থশালার বাইরে আসে। মেলার লোক তখনও পলায়ন করছে। পলায়নপর একজনকে ডাকলে লোকটি কর্ণপাত করে না। সে ছুটে লোকটিকে ধরলো। জানতে চাইলো, একজন বৈদ্যের সন্ধান দিতে পারেন? লোকটি আর্তনাদ করতে লাগলো, ভ্রাতঃ আমাকে যেতে দিন—গৃহে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে।

মুক্ত হয়ে লোকটি এমন গতিতে ধাবমান হলো যে মুহূর্তেক পরে আর তাকে দেখা গেলো না।

বসন্তদাসকে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একজন বৈদ্য ডেকে আনতে হয়। বৈদ্য এসে দূর থেকে রোগীর অবস্থা দেখে আর অগ্রসর হন না। বলেন, ম্লেচ্ছ যবনদের চিকিৎসা আমি করি না।

বসন্তদাস তখন একপ্রকার মরিয়া। বৃদ্ধের স্কন্ধে হাত রেখে বলে, মহাশয়, আমি আপনার শমন, ঐ ম্লেচ্ছ যবনের সঙ্গে যদি একত্রে যমালয়ে গমনের বাসনা না থাকে, তাহলে রোগীর চিকিৎসা করুন।

বৈদ্যটি অম্বোষ্ট কায়স্থ, সম্ভবত তাঁর কৌলীন্যেরও দাবি আছে—অন্তত উপবীতটি দেখে তাই মনে হয়। উপবীত স্পর্শ করে তিনি বসন্তদাসকে যথেচ্ছ অভিসম্পাত দিলেন। তারপর রোগীকে পরীক্ষা করলেন। শেষে বললেন, এ রোগীর আশা নেই—পারলে প্রস্তর-লবণের চূর্ণ মিশ্রিত করে জলপান করাও। অন্য কিছু করণীয় নেই।

বৈদ্যটি প্রস্থান করার সময় হস্ত প্রসারণ করতে ভুললেন না। একটি মুদ্রা হাতে পেয়ে প্রায়শ্চিত্য মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বিদায় হলেন।

বৃদ্ধ পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। প্রস্তর-লবণ তখন আর কোথায় সন্ধান করবে? পান্থশালার রন্ধনস্থলে কৃষ্ণ-লবণ ছিলো, তাই জলে মিশ্রিত করে বার দুই দেওয়া সম্ভব হলো। তারপরই বৃদ্ধের শেষ নিঃশ্বাসটি নির্গত হয়ে চলে গেলো।

শিয়রে তখন সে উপবিষ্ট। মৃত্যুকে এতো নিকট থেকে পূর্বে সে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। তার অদ্ভুত লাগছিলো। এই লোকটির সঙ্গে গত রাত্রেই না তার আলাপ হয়েছে। এঁরই দেওয়া পুষ্পাসবের সুগন্ধ পাত্রটি এখনও না তার সঙ্গে। অথচ লোকটি জগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। দূরদেশে স্ত্রী-সন্তান পরিবার অপেক্ষায় রয়েছে আর ইনি নির্বান্ধব অবস্থায়, প্রবাসে এক পান্থশালায়, শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করে বসলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কেউ জানাতেও পারলো না। সে বৃদ্ধের চক্ষু দু'টি মুদিত করে দিলো। একখানি হাত শয্যার বাইরে ভূমিস্পর্শ করেছিলো। হাতখানি সে বক্ষোপরি স্থাপন করলো। তারপর বললো, মহাশয় বিদায়, এবার আমি যাই, পরকালে আপনার মঙ্গল হোক।

কুটির ত্যাগ করে সে অগ্রসর হলো। মন ভারাক্রান্ত। অনিত্য মানব জীবনের কথা বারংবার মনে উদিত হচ্ছে। এই জীবনের কি কোনো অর্থ আছে? জীবন যদি এই প্রকার অজ্ঞাতে, অগোচরে, মৃত্যুতে সমর্পিত হয়, তাহলে সংসার কেন? পুত্র কলত্রেরই বা কি প্রয়োজন?

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। মেলায় এখন জনপ্রাণী নেই। সামান্য পথ অতিক্রম করেছে, এমন সময় দেখলো, দু'টি শ্মশান শৃগাল অগ্রসর হয়ে আসছে।

শৃগাল দুটি দেখে সে দাঁড়ায়। তার স্পষ্ট অনুমান হয়, বৃদ্ধের দেহ এখন শৃগাল দু'টির উপাদেয় ভক্ষ্য হবে।

যবন বৃদ্ধের মৃতদেহের পরিণাম অনুমান ক'রে সে আর পদক্ষেপণ করতে পারলো না। সৌম্য সুন্দর মুখখানি, কোমল মমতাময় হাতের অঙ্গুলিগুলি, শ্বেত শুভ্র কেশভার—

সমস্তই এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে শৃগাল দু'টির দ্রংষ্ট্রাঘাতে। দৃশ্যটি কল্পনায় আসা মাত্র সে ফিরলো।

সে জানে না, যাবনী ধর্মে শেষকৃত্যের বিধান কী। শুনেছিলো যে যবনেরা মৃতের দাহ করে না, সমাধি দেয়। কিন্তু কি মন্ত্র, কোন দেবতাকেই বা আহ্বান করা হয়, কিছুই তার জানা নেই। কিন্তু হতোদ্যম হলো না সে। পান্থশালাতেই পাওয়া গেলো খনিত্র খানি। সে কালবিলম্ব না করে খনন আরম্ভ ক'রে দিলো।

পিঙ্গল পশ্চিমাকাশে তখন বঙ্কিম চন্দ্রটি উদিত হয়েছে, পরিত্যক্ত জনহীন মেলায় একটি ভৌতিক ভাব, দূরে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে। সম্ভবত যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে মারী-ভয় দূর করার চেষ্টা করছে পল্লীবাসীরা। দু'টি কুক্কুরের ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেলো অদূরে। বসন্তদাসের খনন যখন সমাপ্ত হলো তখন রাত্রি গভীর হয়েছে।

অতিশয় ক্লান্ত সে তখন। দেহ আর চলে না। পান্থশালা থেকে মৃতদেহটি বহন করে আনার সময় দু'বার তার পদস্খলন হয়। তথাপি কাজটি করে সে। মৃতদেহটি সমাধিগর্ভে নিক্ষেপ করে দেখে, নিক্ষেপ যথাযথ হয়নি। উর্ধ্বাঙ্গ সমাধিগর্ভে গেলেও পদযুগল রয়েছে বাইরে। তখন আবার নামতে হয় সমাধিগর্ভে। দেহটিকে লম্বমান করে শায়িত করতে হয়। ঐ সময় সে আবিষ্কার করে বৃদ্ধের কটিবন্ধটি স্থূল এবং কঠিন, সম্ভবত সেখানে কোনো কঠিন বস্তু গ্রন্থিবদ্ধ। তখন সেটি সে মোচন করে নেয়। শেষে উঠে এসে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে পূর্ণ করে দেয় সমাধিগর্ভটি।

প্রক্রিয়াটি যেমন দীর্ঘ তেমনই কষ্টকর। সমাধি পার্শ্বের ভূমিতে সে কিছুক্ষণ লম্বমান হয়, এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে সে। তারপর বিদায়।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে জানে না। বোধ হয় তখন মধ্যরাত্রি। শীত বোধ হওয়াতে সে উঠলো। এবং তখনই দৃষ্টি পতিত হলো বৃদ্ধের স্থূল কটিবন্ধটির উপর। সেটির গ্রন্থিমোচন করার পর যা দেখলো তাতে তার চক্ষুস্থির।

একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড। স্বর্ণমুদ্রাগুলি সে চেনে কিন্তু ক্ষুদ্র প্রস্তরবৎ বস্তুগুলি কী? একটি হাতে তুললে দেখলো তার মধ্য থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এগুলি হীরক? নাকি পদ্মরাগ? নাকি বৈদূর্য? সংখ্যায় সাতটি, কিন্তু কোনোটির পরিচয়ই সে জানে না। তার চিন্তা হলো, এখন সে কী করবে? এই স্বর্ণখণ্ড ও মণিমাণিক্যগুলি কি নিজে নেবে, না সমাধির কাছেই রেখে যাবে?

বিচিত্র এক মানসিক অবস্থা তখন তার। স্বাভাবিক চিন্তা করার অবস্থাটুকুও নেই। না হলে অমন মূল্যবান বস্তু সে সমাধি পার্শ্বে রেখে আসার চিন্তা করে? কি অদ্ভুত কাণ্ড, হঠাৎ সে বিপুল সম্পদের অধিকারী। হীরক মাণিক্যের মূল্য সে জানে না, কিন্তু দশখানি স্বর্ণখণ্ড? এক কুলব্যাপ ভূমির মূল্য তিন দীনার। তার অর্থ চারি কুলব্যাপ ভূমি সে ক্রয় করতে পারবে। কি ভয়াবহ কাণ্ড। হায়, হায়, মানুষ জানলে একেবারে নিশ্চিত মরণ। পিতা হেমন্তদাস জানলে তাকে গৃহ থেকে বিতাড়ন করবেন। যদি তা নাও করেন, ধনরত্নগুলি নিশ্চয়ই আত্রেয়ী জলে নিক্ষেপ করবেন। দস্যু হস্তে প্রাণ কে দিতে চায়?

একবার মনে হলো, সন্ধান করলে যবন বণিকের স্বদেশবাসী কাউকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—আর তার হাতে স্থলীটি তুলে দিতে পারলেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। পরক্ষণেই তার ভিন্ন চিন্তা হয় আবার। যার হাতে সে স্থলীটি দেবে সে যদি যথাস্থানে সেটি না দেয়, তাহলে?

অর্থাৎ এই দশখানি স্বর্ণখণ্ড এবং মণিমাণিক্যগুলি তাকে নিতেই হচ্ছে—অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।

বসন্তদাসের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী ঐ স্থানে অর্থাৎ দেবীকোটের পরিত্যক্ত ঐ মেলাতেই সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু হয়নি। তার গৃহের পথ তখনও বহুদূর। আরও বহুবিধ ঘটনা ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে, যে ঘটনাগুলি বর্তমানের বসন্তদাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সেগুলি আমরা পরে জানবো একে একে।

পুনর্ভবার পশ্চিমতীরের গ্রামগুলিতে সে অনুসন্ধান করতে করতে উত্তরে অগ্রসর হচ্ছিলো। তার অনুমান, পূর্বে বা দক্ষিণে প্রাণ ভয়ে ভীত পলায়নকারীরা যাবে না। শুকদেব যদি জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি পশ্চিমে অথবা উত্তরেই এসেছেন। ইতোমধ্যে সে সংবাদ নিয়েছে যে মাতুল দীনদাসও গৃহে ফেরেননি। তাঁর এক ভাগিনেয় পশ্চিমতীরের গ্রামগুলিতে সন্ধান করতে এসেছিলো।

মদনপুরের দিকে সে অগ্রসর হচ্ছিলো। জানা ছিলো, শুকদেবের এক বন্ধু থাকেন ঐ গ্রামে—যাঁর কন্যার সঙ্গে মৃত চন্দ্রদাসের বিবাহের কথা স্থির হয়েছিলো। শুকদেব সম্ভবত বন্ধুগৃহেই আশ্রয় নিয়েছেন, এই প্রকার অনুমান করেছিলো সে। কিন্তু দেখলো, মদনপুরে শুকদেব আসেননি। বৃদ্ধ প্রফুল্ল দাস জানালেন, বৎস, আমিও তাঁদের সন্ধান করছি, কিন্তু এখনও সফল হইনি, মঙ্গলময় শিব জানেন, তাঁরা কোথায় আছেন। আমার সন্দেহ, তাঁরা কেউ পশ্চিম তীরে আসেননি। যদি জীবিত থাকেন, তাহলে পূর্বতীরেই কোনো গ্রামে তাঁরা রয়েছেন—তুমি বরং পূর্বতীরেই তাঁদের সন্ধান করো।

এ অঞ্চলে পথ এখন প্রায়শই নির্জন থাকে। বণিকদের গোশকটগুলিও আর চোখে পড়ে না। হাটগুলি বিষণ্ন, সন্ত্রস্ত এবং ক্ষণস্থায়ী। মানুষ দিবাভাগেই গৃহে ফেরে। গ্রামে গেলে লোকেরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। লোকে সন্দেহ করে, সামন্তপতির কোনো

গুপ্তচর এসেছে। একদিন একজন তো স্পষ্টতই বললো, মহাশয়, যদি যথোচিত পুরস্কার দান করেন, তাহলে আমি একটি সদ্ধর্মী ভিক্ষু দলের সন্ধান দিতে পারি।

সে লোকটিকে কী বলবে ভেবে পায় না। শেষে ভ্রম অপনোদনের জন্য বলে, মহাশয়, আমি গূঢ়-পুরুষ নই যে আপনাকে পুরস্কৃত করবো। তবে একটা কথা বলি, নিশ্চিত না হয়ে অপরিচিত লোকের কাছে এ প্রকার প্রস্তাব করবেন না, সে কোন পক্ষের লোক তার কি কোনো স্থিরতা আছে?

বলাবাহুল্য লোকটি প্রথমে হতাশ, পরে ভীত হয়ে প্রস্থান করে।

প্রফুল্লদাস তাঁকে জামাতা জ্ঞানেই সমাদর করলেন। তাঁর কন্যাটি এখনও সুস্থ হয়নি। তার শোনা ছিলো যে চন্দ্রদাস দস্যুহস্তে নিহত হওয়ার পর কন্যাটি উন্মাদিনীপ্রায় হয়ে রয়েছে। দেখলো, মধুমতী সম্মুখ দিয়ে গমনাগমন করছে কিন্তু তার যেন সম্বিত নেই। নারীসুলভ লজ্জার ভাবটি তার মুখে অনুপস্থিত। বিকার ঐটুকুই, না হলে সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক। উত্তম স্বাস্থ্য, গঠনটিও সুন্দর, তদুপরি মধুমতী রূপসীও। একবার সম্মুখে এসে বললো, আপনি বুঝি মেলায় যাবেন? সেখানে ইন্দ্রদাস গেছে, বলবেন তো, যেন বিলম্ব না করে। আর স্মরণ করিয়ে দেবেন, আমার জন্য যেন একখানি মুক্তামালা অবশ্যই নিয়ে আসে।

প্রফুল্লদাস বললেন, বৎস, এই-ই আমার ললাটলিপি, এই উন্মাদিনীকে কে রক্ষা করবে? দুশ্চিন্তায় আমার নিদ্রা হয় না।

সকলের মনেই অদ্ভুত একটি আতঙ্ক। কখনও শঙ্কা, এই বুঝি যবন সেনাদল এলো—কখনও ভয়, আজ রাত্রে আর নিস্তার নেই, পূর্বতীরে সামন্তপতির লোকদের দেখা গেছে। কখনও আবার হতাশা, যদি যুগপৎ আক্রমণ হয়, তাহলে আমাদের তো পলায়নের পথ নেই।

কেউ কোনো কাজ করে না। গোচারণে রাখাল নেই, গোরুগুলি ইচ্ছামতো ক্ষেত্র নষ্ট করছে—কর্ষিত ভূমিতে বীজ ফেলে না কেউ—নতুন ধান্যক্ষেত্রে প্রচুর আগাছা, কেউ সেগুলি উৎপাটন করতে আসে না। চতুর্দিকে এমন একটি নিরুদ্যম হতাশ ভাব যে অধিকক্ষণ বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মন পীড়িত হয়ে ওঠে।

বসন্তদাস রাত্রিযাপন ক'রে পরদিনই মদনপুর গ্রাম থেকে বিদায় নেয়। এখন ক্রমাগত উত্তরে চলেছে সে। তিন-চারখানি গ্রাম অতিক্রম করে সে এক হট্টকুটিরে তিনজন সদ্ধর্মী ভিক্ষুকে দেখতে পায়। তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে অল্পক্ষণ পূর্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছে। প্রথমত তারা আলাপে একেবারেই অনাগ্রহ প্রকাশ করে। শেষে একজন বললো, মহাশয় আমরা সাধারণ ভিক্ষু, আপনি যা যা জানতে চাইছেন, সে সব সংবাদ আমরা কোথায় পাবো, বলুন?

তবে তারা একত্রে আহারের আয়োজন করে। এবং ঐটুকু অন্তরঙ্গতার সুযোগে বসন্তদাস নানান বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে। ফলে রাত্রি গভীর হতে হতে পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দ আলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। ভিক্ষুরা নানান সংবাদ জানে। যেমন ভিক্ষু

মিত্রানন্দকে এখন নিকটে কোথাও পাওয়া যাবে না, তিনি দূরের এক মহাবিহারে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনে বেশ বিলম্ব হবে।

তারা আরও সংবাদ জানায়। যবন সেনাদের একটি দল নাকি দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানন্দার অপরপারে অবস্থান করছে। সম্ভবত রাজধানীতে কোনো ঘটনা ঘটবে, এবং সেটি ঘটলে, তারা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে পারে। তাদের কেউই বাধা দিচ্ছে না। রাজপুরুষেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। মন্ত্রী-মহামন্ত্রীরা পরস্পর কলহে লিপ্ত। বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। রাজপুরোহিত বিধান দিয়েছেন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের। অলৌকিক শক্তিবলেই নাকি শত্রু দমন সম্ভব হবে।

পিপ্পলী হাটের সংবাদটিও তারা জানে, কিন্তু উজুবট গ্রামে কী ঘটেছে, তা তাদের জানা নেই। তবে তারা পথিমধ্যে দেখেছে, উত্তরাঞ্চলের গ্রামগুলিতে কিছু সংখ্যক লোক আশ্রয় নিয়ে আছে। এবং আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাহলে কি আরও গ্রাম উপদ্রুত হয়েছে?

ঐ প্রশ্নে একজন হেসে ওঠে। বলে, মহাশয় দেখছি নিজ দেশের কোনো সংবাদই রাখেন না। কোন অঞ্চলটি অনুপদ্রুত বলতে পারেন? পূর্বে যান, দক্ষিণে যান, উত্তরে যান, সর্বত্র একই কাহিনী। সর্বত্রই ধর ধর রব, সর্বত্রই মার মার চিৎকার।

অপর ভিক্ষুটি সহাস্যে মন্তব্য করে, এ স্থানেও ঐ দৃশ্য অচিরেই দেখতে পাবেন— চিন্তার কোনো কারণ নেই।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত চললো আলাপ। মনে হয়েছিলো তারা সাধারণ ভিক্ষু। কিন্তু জানা গেলো, একজন উচ্চতর সম্মানের অধিকারী। তিনি পশ্চিমে যাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা, যবন সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

কেন? বসন্তদাস জানতে চাইলো, আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে তাদের সঙ্গে প্রকৃত সম্প্রীতি সম্ভব? এবং তারা এলে এদেশবাসী উপকৃত হবে?

ঐ প্রশ্নে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। ঈষৎ চিন্তা করলেন মনে হলো। শেষে বললেন, না মিত্র, তা নয়—যা আপনি ভাবছেন। লোকে সন্দেহ করে যে আমরা ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো যবনদের এদেশে ডেকে আনছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমরা শুধু জানাবো, যে লোক ক্ষয় যেন না হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ তো কোনো দোষ করেনি, তারা কেন নিপীড়িত হবে? বিশেষত সাধারণ মানুষ যখন রাজশক্তির সমর্থক নয়, তখন যবন সেনারা কেন তাদের হত্যা করবে?

বসন্তদাস ভিক্ষু তিনটিকে লক্ষ্য করে দেখলো। কেশশ্মশ্রুহীন গোলাকার শান্ত সৌম্য মুখ। কোনো প্রতিক্রিয়াই সে মুখে আভাসিত হয় না। তার দুর্বোধ্য লাগে। আবার কেমন সন্দেহও হয়, তবে কি মিত্রানন্দ আর তাঁর সঙ্গীরা একরূপ চিন্তা করে এবং এরা অন্য চিন্তা করে? মিত্রানন্দের সঙ্গে এরা যে সম্পর্কবিহীন তা-ও নয়। যদি মিত্রানন্দের সেই কথা সত্য হয় যে, যবনদের সঙ্গে সদ্ধর্মীদের কী সম্পর্ক হবে তা এখনও স্থির হয়নি, তাহলে এই ভিক্ষুরা কীভাবে যবন সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়? সে জানতে

চাইলো, সকল সদ্ধর্মীর সম্মতিক্রমে কি আপনি যবন সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন?

এই প্রশ্নে তিনজনই গম্ভীর হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুটি বলেন, এতে সম্মতির কি প্রয়োজন? এতো সংঘের কাজ নয়, একেবারেই দৈনন্দিন ধর্মের কাজ। শুধু বলবো, জীবে দয়া করো—এই কাজের জন্য কারও সম্মতি প্রয়োজন নেই।

বসন্তদাসের অনুমান হয় মিত্রানন্দের প্রচেষ্টা কোনো কাজেই আসেনি, তাদের সংঘ এখনও সংগঠিত নয়। কোনো কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত নেই, ভিক্ষুরা স্বেচ্ছাচারীর মতো আচরণ করছে। সে কৌতূহল বশত পুনরপি জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়, যবন সেনাপতির নিকট না গিয়ে ঐ একই আবেদন কি রাজ পুরুষদের কাছে করা যেতো না?

এবার বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুটি হাসেন। বলেন, না ভ্রাতঃ, তা করা যেতো না—প্রথমত আমাকে রাজার সমীপে যেতে দেওয়া হতো না। এবং দ্বিতীয়ত যদি কোনোক্রমে যেতামও, তাহলেও কেউ আমার আবেদন শুনতো না।

কেন, শুনতো না কেন? বসন্তদাস জানতে চাইলো।

মিত্র, আপনি দেখছি নিতান্তই বালসুলভ প্রশ্ন করছেন। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু বললেন, চিন্তা ক'রে দেখুন, আমার আবেদন ওঁরা কেন শুনবেন? তাতে কারও কোনো লাভ নেই। রাজসভার লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই সামন্ত মহাসামন্ত, নিজ শ্রেণীর বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কথা তাঁরা রাজসভায় উত্থাপিত হতে দেবেন না, এ তো সহজ কথা।

রাজসভায় তো মহারাজও থাকেন, তিনিই তো সর্বেসর্বা—বসন্তদাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, মহারাজ অবশ্যই থাকেন। কিন্তু রাজার নিজস্ব শক্তি আর কতোটুকু—অশীতিপর বৃদ্ধ আমাদের রাজা। সামন্তপতিদের শক্তিতেই রাজার শক্তি। কেউ কি স্বেচ্ছায় নিজ হস্ত ছেদন করে, বলুন?

না, তা করে না, বসন্তদাস স্বীকার করে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কি চিন্তা করে না মানুষ? সে জানতে চাইলো।

অবশ্যই করে, ভিক্ষুটি বললেন, কিন্তু সে তো সুস্থ মানুষ। দেহ মনে সুস্থ মানুষ অবশ্যই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। কিন্তু তেমন সুস্থ মানুষ রাজসভায় আর কয়জন? রাজসভা অর্থ ও ক্ষমতার পীঠস্থান আর দুই-এরই প্রবণতা হচ্ছে কালক্রমে স্বয়ং-বিকৃত হওয়া। প্রায় দ্বিশতাধিক বর্ষের রাজসভা, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালই প্রায় অশীতিবর্ষ। এমতাবস্থায় সভার প্রায় সকল লোকই যে বিকারগ্রস্ত হবে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই। আর সেই বিকারগ্রস্তদের মানসচক্ষু কি স্বচ্ছ, বলুন? যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কি তাদের পক্ষে সম্ভব? এরা অচিরেই ধ্বংস হবে দেখবেন। কেউ এদের রক্ষা করতে পারবে না।

যেন জটিল একটি বিতর্ক ক্রমেই প্রসারিত ও দীর্ঘ হয়ে চলেছে। বসন্তদাস বললো, শুনুন মহাশয়, আমি অতো কথা জানি না, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন, তাঁর রাজসভা, কিংবা তাঁর সামন্তবর্গ, এরা রক্ষা পাবে কি পাবে না, এ বিষয়ে আমার সামান্যতম শিরোবেদনা

নেই। জানি, স্বকৃত পাপই এদের ধ্বংস করবে। আমার চিন্তার বিষয় বহিরাগত যবনেরা। এরা একেবারেই বহির্দেশীয় এবং ধর্মে ভিন্ন, আচারে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন—এরা যে কী করবে, কেউ জানে না।

ভিক্ষুরা বসন্তদাসের কথা শুনে অনেকক্ষণ নীরব রইলো। শেষে জ্যেষ্ঠভিক্ষু বললেন, আপনার কথাটি আমাদের মনে থাকবে—ভিক্ষু মিত্রানন্দের মুখেও আমরা এইরূপ কথা শুনেছি—দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়—তথাগতের কী ইচ্ছা।

রাত্রি শেষে প্রত্যূষকালে ভিক্ষুরা প্রস্থান করলে বসন্তদাসও নদী অতিক্রমের আশায় পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে।

নদী এ স্থানে অগভীর। উজুবট থেকে স্থানটি ক্রোশ চারেক উত্তরে। নদীবক্ষে স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ। নৌকাটি পরপারে উপনীত হতে সময় নেয়। নৌকার অন্যান্য আরোহীদের আলাপ শ্রবণে অনুমান হয় নদীর পূর্বতীরে গোহালিহাট, বিল্বগ্রাম, সুনন্দপুর ইত্যাদি গ্রাম জনপদগুলি পরস্পর নিকটবর্তী। পরপারের কদম্বঘাট থেকে ঐ সকল গ্রামের দিকে যাওয়ার সুব্যবস্থাও নাকি আছে। প্রায় প্রতিদিনই দু'একখানি গো অথবা মহিষ শকট ঐ সকল গ্রামে যায়।

বসন্তদাসের গন্তব্য স্থির নয়। নদীতীরে সংবাদাদি নিয়ে তবে নিজ গন্তব্য স্থির করতে হবে।

নৌযানটি যখন তীরবর্তী হলো তখন সকাল। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। নদীবক্ষে বীচিমালার শীর্ষে শীর্ষে নবীন সূর্যালোক এমত ঝলকিত হচ্ছে যে সেদিকে দৃষ্টি রাখা যায় না। রাখলে নয়ন ধাঁধে। নদীজলে কয়েকজন স্নানার্থী ছিলো, তাদের একজন সূর্যস্তব সমাপন ক'রে একজন নৌকারোহীকে ডেকে বললো, ওহে পীতাম্বর, তুমি এতো বিলম্ব করলে কেন, তোমার শ্যালিকাটির অবস্থা ওদিকে এখন-তখন, শীঘ্র গৃহে যাও।

পীতাম্বর কিছু বলে না, সে অধোমুখে থাকে। তার বন্ধুটি মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে বলে, এ তোমার উচিত হয়নি, ছি ছি!

তারা আরও কিছু বলাবলি করে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগী হবার আর অবকাশ ছিলো না। কারণ নৌকাটি ঐ মুহূর্তেই ভূমিস্পর্শ করেছে। বসন্তদাস পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিটির কাছে জানতে চাইলো, বিল্বগ্রামের পথ কোনদিকে, বলবেন?

আহা দণ্ডকাল পূর্বে এলে তো শকটারোহণে যেতে পারতেন, লোকটি জানায়। বলে, পথ খুবই সহজ, এই পথেই গোহালিহাট হয়ে বিল্বগ্রামে গেছে।

মহাশয়, মনে হচ্ছে, নতুন এসেছেন এদিকে?

লোকটির কৌতূহল নিবৃত্ত করে বসন্তদাস। বলে, হ্যাঁ, নতুনই বলতে পারেন।

ক্ষণকাল পরে ঐ লোকটির কাছেই সে জানতে চাইলো, এখানে পান্থশালা নেই?

আজ্ঞে না, পান্থশালা নেই, তবে ঐ যে মন্দির দেখতে পাচ্ছেন, লোকটি হাত তুলে দেখায়, ওখানে যান, দূরের যাত্রীরা ওখানেই রাত্রিযাপন করে।

মন্দিরে তখন ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিলো। সেখানে জনসমাগমও হয়েছে দেখলো। সে মন্দিরের দিকেই অগ্রসর হলো।

একেবারে নিকটে নয় মন্দিরটি। পদব্রজে যেতে সময় লাগে। যখন উপস্থিত হলো, তখন আরতি চলছে। ভক্তরা চত্বরে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে।

সেও দুই কর যুক্ত করে প্রথমে বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম জানালো, তারপর অন্যদের মতো করযুগল যুক্ত করে দাঁড়ালো। সংক্ষিপ্ত আরতি, অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়ে যায়। তাতে বালক-বালিকারা প্রসাদ সংগ্রহের জন্য হয়ে ওঠে তৎপর। ফলে চাঞ্চল্য জাগে ক্ষণেকের জন্য।

প্রসাদ বিতরণ করছিলো একজন তরুণ এবং একজন যুবতী। তারা সম্ভবত মন্দিরের সেবক এবং সেবিকা। সেবিকাটি অপরূপ সুন্দরী। মস্তকোপরি অবগুণ্ঠন ছিলো, তথাপি উত্তোলিত হাত দু'খানি ব্যস্ত থাকায় প্রভাতকালের বায়ুতাড়না তাকে বিস্রস্তবাসা করে দিলো। এবং ঐ মুহূর্তটিতে যা দৃষ্টিগোচর হলো তা যে কোনো পুরুষ মানুষকে আমূল চঞ্চল করে দেবার জন্য যথেষ্ট। বলাবাহুল্য, এমন রূপ-যৌবন কদাচিৎ দেখা যায়। কৃষ্ণার কথা মনে পড়ে গেলো বসন্তদাসের। ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে সে দুই পা পশ্চাতে ফিরলো। এবং ক্ষুদ্র জনসমাবেশটি থেকে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়ালো।

ভক্ত এবং প্রসাদ প্রার্থীরা একে একে সকলেই বিদায় হলো। বসন্তদাস দু'একজনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তারা কেউ-ই তার প্রতি মনোযোগী হয়নি। মন্দিরের সেবিকাটি সম্ভবত বসন্তদাসকে দেখে থাকবে। সে মন্দিরের দ্বারান্তরাল থেকে মন্দিরসেবক বালকটিকে ডেকে বললো, দেখো তো অংশুমান, লোকটি কি চায়?

মন্দিরটি সূর্যদেবতার। বিগ্রহটি ক্ষুদ্র কিন্তু ধাতু নির্মিত, প্রদীপের আলোকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। তরুণটি নিকটে এলে বসন্তদাস পুরোহিতের সন্ধান করলো। তাতে জানলো, পুরোহিত মন্দিরে থাকেন না, পূজা শেষে স্বগৃহে গমন করেন। স্বল্প পূর্বে যে বৃদ্ধটি চলে গেলেন, বসন্তদাস বুঝলো, তিনিই পুরোহিত। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসবেন। তখন সাক্ষাৎ হতে পারে।

মন্দিরের সেবিকা তখনও দ্বারান্তরালে এবং কৌতূহলী। অনুচ্চ কণ্ঠে জানতে চাইলো, আপনার কি বিশেষ প্রয়োজন? বৃদ্ধ মানুষ, সন্ধ্যাকালে নাও আসতে পারেন, তাহলে আপনাকে তাঁর গৃহে যেতে হবে।

বসন্তদাস চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছিলো। এদেশে সূর্যদেবতার পূজা হয় জানে, কিন্তু মন্দির এই প্রথম দেখলো। এতদঞ্চলে সম্ভবত এই একটিই মন্দির। প্রাচীনতার চিহ্ন মন্দির গাত্রের প্রায় সর্বত্রই প্রকট। এইরূপ প্রায় অযত্নরক্ষিত মন্দিরেও সেবাদাসী রয়েছে দেখে সে অবাক হচ্ছিলো। দাসীটি সপ্রতিভ ভঙ্গীতে তখনও দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। বসন্তদাস জানালো, ভদ্রে, আমি কতিপয় আত্মীয়ের সন্ধান করছি, তাঁরা একটি যবন উপদ্রুত গ্রাম থেকে পলায়ন করে এসেছেন—এই গ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো গ্রামে, ঐ প্রকার পলায়নপর লোকেদের আগমনের সংবাদ কি আপনার জানা আছে?

দাসীটি দ্বারান্তরাল থেকে এবার বাইরে এলো। বললো, না জানা নেই তেমন লোকের সংবাদ—কিন্তু যবনরা কি সত্যই গ্রাম লুণ্ঠন আরম্ভ করে দিয়েছে?

মনে হলো, সেবিকাটি একেবারে অন্তঃপুরবাসিনী নয়। জগৎ সংসারের বহুবিধ বিষয় তার জানা। সে বললো, আপনি বরং মন্দিরের ভিতরে এসে কথা বলুন। মন্দির বলেই ভাববেন না যে এ স্থান নিরাপদ। এ স্থানেও গূঢ়পুরুষদের দৃষ্টি আছে।

কি অদ্ভুত কথা। সে বিস্ময় মানে, এই দেবমন্দিরের উপরও কেন দৃষ্টি রাখবে গূঢ়পুরুষেরা!

যুবতীটির মুখপানে দৃষ্টিপাত করা যায় না। বসন্তদাসের দৃষ্টি বার বার নত হয়ে আসছিলো। দৃষ্টি যে লগ্ন হয়ে থাকতে চায় গ্রীবায়ে, গ্রীবাদেশে, বক্ষে। এ তো বড় যন্ত্রণা। কৃষ্ণাকে দেখে তো এমন মনে হয়নি। সে নিদারুণ বিব্রত বোধ করে। সেবিকাটি তখনও বলছিলো, ক্রোশ দুই দূরে বিল্বগ্রাম। সেখানে সামন্ত সুধীমিত্র একটি বাসুদেব-মন্দির নির্মাণ করছেন। তাঁর ধারণা, ঐ মন্দিরই হবে এতদঞ্চলের ধর্মীয় পীঠস্থান। তিনি মনে করেন, আমরা সূর্যোপাসকরা অন্তরে সদ্ধর্মী—সূর্যদেবতার পূজা করলেও। এবং এই মন্দির নাকি সদ্ধর্মীদের মিলিত হবার গোপন স্থান। এই সন্দেহের কথাটি তিনি প্রচারও করছেন।

মন্দিরদাসী আরও সংবাদ জানে। বললো, কেবল আপনাদের গ্রামেই নয়—আরও কয়েকটি গ্রামে ঐ প্রকার কাণ্ড ঘটেছে।

পূর্বে প্রতি পক্ষকালে দু'দশজন ভিক্ষু এসে এই মন্দিরে রাত্রিযাপন করতো, এখন তারা কেউ আসে না। পক্ষকাল পূর্বে এক যোগীর সঙ্গে দু'টি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক এই মন্দিরে রাত্রিযাপন করে গেছে—পরিচয় জানায়নি। তবে আমার সন্দেহ, তারা কোনো আক্রান্ত গ্রামের লোক।

দীর্ঘ আলাপ, বসন্তদাস ক্রমে সহজ হয়ে উঠলো। কথা বললো নানান প্রসঙ্গে। শেষে উঠলো, আমি এবার যাই।

সে কি, কোথায় যাবেন? দ্বিপ্রহরের তো বিলম্ব নেই, মন্দিরের প্রসাদ আছে, আহারাদি সম্পন্ন এখানেই করুন।

বসন্তদাস রীতিমতো সঙ্কোচ বোধ করে। এতো অল্প সময়ের পরিচয়—এই পরিচয়ে কি আতিথ্য গ্রহণ করা উচিত? সে সবিনয়ে মস্তক আনত করে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলো। ঐ সময়

যেন নারী কণ্ঠে আদেশ শুনলো। হ্যাঁ আদেশই বলতে হবে। দ্বারে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে রমণীটি। বলছে, আপনি মন্দিরে প্রবেশ করে দেবতাকে অপমান করতে চান?

অপমান! কী বলে এই উন্মাদিনী? সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চায়।

নিশ্চয়ই অপমান! মন্দিরদাসীর কণ্ঠে যেন ক্রোধ শাণিত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ স্বরে সে বলে, পূজার প্রসাদ প্রত্যাখ্যান কি দেবতার অপমান নয়?

বসন্তদাস অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সত্যই কি তার আচরণে কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে? মন্দিরদাসীর মুখপানে দৃষ্টি তোলে সে এবং বিভ্রান্ত বোধ করে। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেলেও রমণীর চক্ষু দু'টিতে ক্রোধ কোথায়? বরং দেখতে পায় সেখানে কৌতুকের অস্পষ্ট একটি আভা কম্পমান।

যাক, তবে এ কৌতুক, অন্য কিছু নয়—স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বসন্তদাস। তার ভয় হচ্ছিলো। না জানি কী ক'রে বসে রহস্যময়ী এই মন্দিরদাসী। সে কৃতাঞ্জলি হয়ে বিনয়সহকারে জানালো, উত্তম কথা ভদ্রে, আমি আপনার কথামতোই কাজ করবো।

এখানেই আপনি বিশ্রাম নিন। আদেশটি উচ্চারণ ক'রে রমণীটি তৎক্ষণাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দ্বার পথে অন্তর্হিত হয়।

মন্দিরের গর্ভগৃহটি অন্ধকার। সেখানে দিবানিশি প্রদীপ জ্বলে, কিন্তু বাহিরের অংশে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। মন্দিরচূড়ার গঠন কৌশলে সম্ভবত কোনো ব্যবস্থা করা আছে যাতে বাইরের আলোক মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। বসন্তদাস একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠদেশ এলায়িত করে বসে ছিলো। ঐ সময় মন্দির গাত্রের একটি চিত্রণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ধাতুমূর্তিটির গঠন কিরূপ তা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবে অনুমান, সপ্তাশ্ববাহী রথে আকাশমণ্ডল পরিক্রমণরত সূর্যদেবের মূর্তিটিই এই মন্দিরের বিগ্রহ। কিন্তু মন্দির গাত্রে এ কিরূপ অলংকরণ? তার বিস্ময় জাগে। একদিকে একটি বৃক্ষ অপরদিকে সকিরণ সূর্য, সেই সঙ্গে একটি সর্প বৃক্ষের কাণ্ডটি বেষ্টন করে আছে। বৃক্ষ, সূর্য এবং সর্পের এমন একত্র যোজনা তো সে পূর্বে কোথাও দেখেনি! সে মন্দির গাত্রে হাত রাখে—অসম্ভব শীতল বোধ হয়। তার মনে হয়, কাল যেন সংহত শিলীভূত ও স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে এই স্থানে। তার স্মরণ হয়, বালিগ্রামের অবলোকিতেশ্বর মন্দিরটির গাত্রেও এইরূপই শীতলতা অনুভব করেছিলো সে।

অংশুমান নিকটে এলে সে জিজ্ঞাসা করে, ভ্রাতঃ, মন্দির গাত্রে এ কিরূপ চিত্রণ? এমন চিত্রণ তো আমি অন্য কোথাও দেখিনি।

অংশুমান চিত্রণের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, মহাশয়, এর ব্যাখ্যা আমরাও জানি না। তবে পুরোহিত বলেন যে, বহু প্রাচীনকালে সূর্যদেব এইরূপেই পূজিত হতেন—আমি শুধু এইটুকু জানি যে, এই মন্দির বহু প্রাচীন—এর অধিক আমি আর কিছু বলতে পারবো না।

মন্দিরদাসী কখনও সম্মুখে আসছিলো, কখনও অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো না যে বসন্তদাসের উপস্থিতি সম্পর্কে সে সচেতন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ইতোমধ্যে

কয়েকটি পুরুষ কণ্ঠের আলাপ শুনতে পেয়েছে সে। একবার মনে হচ্ছিলো, মন্দিরদাসী যেন কাউকে তিরস্কার করছে। কাদের সঙ্গে ঐ বাদানুবাদ সে কিছু অনুমান করতে পারেনি। সে কৌতূহলী মনকে শাসন করেছে। নিজেকেই ডেকে বলেছে, ওহে বসন্তদাস, অধিক কৌতূহলী হয়ো না, নিজের চক্রে অগ্রে তৈলদান করো, পরে অন্যের কথা চিন্তা করতে যেও।

বাহিরে রৌদ্রদগ্ধ প্রাঙ্গণে বৃক্ষছায়া কাণ্ডের নিকটবর্তী হয়ে আসছিলো। বোঝা যাচ্ছিলো দ্বিপ্রহরের আর বিলম্ব নেই। বাহিরে যে বাদানুবাদ শোনা যাচ্ছিলো, এখন আর তা নেই। বসন্তদাসের চিন্তা হচ্ছিলো, অতঃপর মন্দির ত্যাগ করে কোন পথে গমন তার কর্তব্য? সে কি বিল্বগ্রামের দিকে যাবে, নাকি যাবে সুনন্দপুরের দিকে? একটি সূত্র তার জানা প্রয়োজন। মন্দিরদাসীর কাছ থেকে শোনা সংবাদটি তাকে আশান্বিত করে তুলেছে। পক্ষকাল পূর্বে এ মন্দিরে এক যোগী পুরুষের সঙ্গে যে রমণী ও পুরুষ দু'টি এসেছিলো, তারা যদি কোনো আক্রান্ত গ্রাম থেকে পলায়ন ক'রে থাকে, তাহলে ওদের পক্ষেই শুকদেব ও মায়াবতীদের সংবাদ জানা সম্ভব। তার ধারণা, এই অঞ্চলেই কোথাও শুকদেব ও মায়াবতীরা আছে।

ঐ সময় মন্দিরের দাসী ক্ষণে ক্ষণে চত্বরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো এবং আসছিলো। কেন, সেই জানে। তবে চক্ষুতে চক্ষুতে মিলন হলেই অতীব রহস্যময় হাসি ফুটছিলো তার ওষ্ঠপ্রান্তে।

বসন্তদাসের মনে হচ্ছিলো, বাল্মিগ্রামের কৃষ্ণার চাইতেও অধিক রহস্যময়ী এই মন্দিরসেবিকাটি। কেন যে সে এভাবে তাকে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করলো, তার ধারণায় আসে না। তবে হ্যাঁ, একটি বিষয়ে সে নিশ্চিত, তীব্র আকর্ষণ এই রূপসী নারীর। যদি সে প্রগলভা হয়ে বারেক আহ্বান করে, তাহলে যে কী হবে, সে চিন্তা করতে পারে না। কারণ পুরুষের সংযমী থাকার ক্ষমতা কতটুকু সে তো তার উত্তম রূপে জানা।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র চত্বরটিতে আসন দেওয়া হয়। প্রসাদে উপচার ছিলো বহুবিধ। তবে কিছু মিষ্টান্ন এবং কয়েকটি ফল মাত্র গ্রহণ করে সে। দুগ্ধ ক্ষীরাদি স্পর্শ করে না।

মন্দিরদাসী দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলো। বললো, আপনি বোধ হয় এরূপ আহারে অভ্যস্ত নন।

কি যে বলেন, এ তো রাজভোগেরও অধিক, বসন্ত নতমুখে জানায়।

এ আপনার বিনয় ভাষণ।

কেন, বিনয় ভাষণ কেন হবে! বসন্ত রমণীর মুখপানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তোলে।

গৃহী মানুষের রুচি কিরূপ তা আমি জানি—মনে রাখবেন, এ মন্দিরে যারা প্রতিদিন আসে, তারা প্রত্যেকেই গৃহী।

হতে পারে, বসন্তদাস জানায়। কিন্তু এখন তো আমি গৃহে নেই, পথে পথে দিনযাপন করি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে দেবতার প্রসাদ পেলাম—কাল যে কী

পাবো, তার কি নিশ্চয়তা আছে কিছু, বলুন? এ মন্দিরে কি কাল আমার অবস্থান সম্ভব হবে?

মন্দিরদাসী ঐ কথায় গম্ভীর হয়। কিছু বলে না, দূর আকাশে তার দৃষ্টি প্রসারিত থাকে। ক্ষণকাল পরে সে ধীর কণ্ঠে বলে, ভবিষ্যতের কথা ভবিতব্য জানেন—বড় অনিশ্চিত আমাদের বর্তমান, আজো সামন্তপতির দুই অনুচর এসেছিলো মন্দিরে।

কেন, এখানে ওরা কী চায়? বসন্তদাস প্রশ্ন না করে পারে না।

কেন, জানেন না? মন্দিরদাসীর ওষ্ঠ প্রান্তে ঐ মুহূর্তে ক্ষীণ একটি শ্লেষের রেখা দেখা যায়। বলে, ওরা সদ্ধর্মীদের চায়, নাথযোগীদের চায়, সূর্যোপাসকদের চায়—প্রত্যেককেই ওদের সন্দেহ।

বসন্তদাসের মস্তিষ্কে হঠাৎ একটি নতুন চিন্তার উদয় হয়। সে বলে, মন্দির প্রাচীন হলেই ওদের সন্দেহ হয়—কেন, বলতে পারেন?

মন্দিরদাসীর মুখে পুনরায় ক্ষীণ হাসির রেখাটি দেখা যায়। বলে, জানি না, হয়তো প্রাকৃতজন ওদের ভয়ের কারণ—প্রাচীন মন্দিরগুলিই তো প্রাকৃতজনের সঙ্গে যুক্ত, বিষ্ণুমন্দির তো সেদিনকার ঘটনা—বৈষ্ণব আর কয়জন?

ব্যাখ্যাটি একেবারে অযৌক্তিক মনে হয় না। নতুবা প্রাচীন মন্দিরগুলিকে কেন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে? দেবীকোটের বজ্রতারা মন্দির, বালিগ্রামের অবলোকিতেশ্বর মন্দির, এবং কদম্বঘাটের এই সূর্যদেবতার মন্দির—এই তিনটি মন্দিরই প্রাচীন এবং এই প্রাচীন মন্দিরগুলিই একেকটি গোপন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র—অন্তত সামন্তপতি এবং রাজপুরুষেরা এইরূপই প্রচার করছে। এখন বোঝা যায়, কেবল সদ্ধর্মীরাই তাদের সন্দেহের পাত্র নয়। তারা সূর্যোপাসকদের সন্দেহ করছে, নাথযোগীদের সন্দেহ করছে, ব্রাত্যশ্রেণীর ডোম চণ্ডালদেরও সন্দেহ করছে—সন্দেহের আর শেষে নেই।

একটা কথা চিন্তা করেছেন? আচমন শেষে বসন্তদাস বলে।

কী কথা? মন্দিরদাসী সাগ্রহে অতিথির মুখপানে চায়।

যাদের ওরা সন্দেহ করে, সেই সন্দেহের পাত্ররা সকলে যদি একত্রিত হয়? যদি কোনো কারণে নির্যাতিত মানুষের অপমান-জ্বালা-বেদনা-হাহাকার-ক্রোধ-হিংস্রতা সমস্তই একত্রিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়? তাহলে সামন্ত মহাসামন্ত রাজপুরুষদের ভবিষ্যৎ কী হবে?

চুপ, বলবেন না—আর বলবেন না।

বসন্তদাস দেখে মন্দিরদাসীর মুখভাবে শঙ্কা ও ত্রাসের ছায়া। সে প্রায় গোপন স্বরে জানায়, সাবধান, অমন কথা ভ্রান্তিবশতও মুখে আনবেন না।

বিদায়কালে মন্দিরদাসী বললো, আপনার পরিচয় কিন্তু জানা হলো না।

তার কি আর প্রয়োজন আছে? বসন্তদাস হাসে।

ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? মন্দিরদাসীর মুখভাবে বিষাদের ছায়া নামে। বলে, যে দুষ্কালের মধ্যে আমরা পতিত হয়েছি, তাতে কিছুই বলা যায় না—এই হীনা

মন্দিরদাসীরও আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে—অবশ্য নিজ পরিচয় যদি আপনি গোপন রাখতে চান, তাহলে ভিন্ন কথা—

ঐ উক্তির পর নিজের পরিচয়দানে কুণ্ঠাবোধ থাকার কথা নয়। বসন্তদাসেরও রইলো না। সে জানালো, অধমের নাম বসন্তদাস, নিবাস আত্রেয়ী-তীরের অম্রপট্টলী—রজতপট অঞ্চলে, পিতা ক্ষেত্রকর্ম করেন, তাঁর নাম—

থাক হয়েছে, মন্দিরদাসী ছায়ার জন্য ঐটুকুই যথেষ্ট।

বসন্তদাস রমণীটির বাকপটুতায় চমকিত হয়। নাম জানতে পেরে সে ঈষৎ হাসেও। বলে, আপনি তাহলে ছায়া—কিন্তু কিসের ছায়া?

কেন, ছায়ার বঙ্কিম ভ্রূধনুতে চকিতে শর যোজিত হয়। বলে, সূর্যের ছায়া, সূর্যদেব ব্যতীত ছায়া সৃষ্টি আর কে করতে পারে, বলুন?

ছায়ার হাসি শতধারে বিচ্ছুরিত হয় ঐ কথার পর। কিন্তু বসন্তদাস হাসিতে যোগ দিতে পারে না। এ কি কৌতুক? তার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রত্যয় হতে চায় না যে ঐ ভ্রূভঙ্গী, ঐ হাস্যধারা, ঐ ভাষা, নিতান্তই কৌতুক সৃষ্টির কারণে।

অবশেষে ছায়া জানায়, আপনি যদি এ অঞ্চলে দিবস দুই অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে আশা করি, কোনো না কোনো সংবাদ অবশ্যই জানাতে পারবো।

আর হ্যাঁ, ছায়ার চক্ষু দু'টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ চমকিত হয়। বলে, আপনার রাত্রিযাপনের সমস্যা হলে স্মরণ রাখবেন, এ মন্দিরের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

এ কি আমন্ত্রণ! বসন্তদাসের বিশ্বাস হতে চায় না। মন্দিরদাসীরা কি সর্বত্রই তাকে কণ্ঠলগ্ন করার জন্য উদ্বাহু হয়ে আছে? এ কি সম্ভব? সে মনের গোপনে একটি মধুর বিভ্রান্তি নিয়ে মন্দির ত্যাগ করে।

প্রথমে বনভূমি, তারপর বিস্তীর্ণ জলাশয়, তারই পাশে নতুন গ্রাম নবপাটক। এই গ্রামে লীলাবতীরা আশ্রয় নিয়েছে—এখানে নিয়ে এসেছেন মাতুল সিদ্ধপা। মধ্যপথে তারা অবস্থান করেছিলো বিল্বগ্রামে। উজুবট থেকে পলায়ন ক'রে তারা প্রথমে বনভূমিতে প্রবেশ করে। সেখানে দিন দুই অপেক্ষা করে এই আশায়, যে নিজ গ্রামে ফিরতে পারবে। কিন্তু যখন জানা গেলো যে হরিসেনের অনুচরদল একজন যোগী, হরকান্ত এবং এক কুম্ভকারের অনুসন্ধান করছে, তখন তারা স্বগ্রামে যাওয়ার আশা ত্যাগ ক'রে উপনীত হলো

কদম্বঘাটে। ঐ স্থানের সূর্যমন্দিরে দিন দুই অবস্থান করে তারা। হয়তো আরও ক'দিন থাকতো, কিন্তু জনাকয় রাজার চর এমন উপদ্রব আরম্ভ করলো যে সে স্থানে তিষ্ঠানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। সে স্থান থেকে শ্যামাঙ্গ তাদের নিয়ে যায় বিল্বগ্রামে। তার আশা ছিলো, গুরু বসুদেব আছেন, মিত্র নীলাম্বর আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দুর্গত পরিবারটির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। সর্বাপেক্ষা বড় আশা ছিলো এই যে, গুরু বসুদেব অন্তত সুধীমিত্রকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, হরকান্ত বা সিদ্ধপা আর যাই হোন, ষড়যন্ত্রকারী নন।

কিন্তু বিল্বগ্রামে উপস্থিত হয়ে সে আশা ত্যাগ করতে হলো। গুরু বসুদেব নেই, নীলাম্বরও নেই। সিদ্ধপা তাঁর এক শিষ্যের জ্ঞাতি সুভদ্রদাসের গৃহে আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগের উপর দুর্যোগ, হরকান্ত বিল্বগ্রামেই দেহ ত্যাগ করলেন। উজুবটের সেই ভয়াবহ রাত্রিকালে তাঁর মস্তকে তরবারির আঘাত লেগেছিলো। ক্ষতটি নিরাময় হয়নি। প্রায়ই রক্তক্ষরণ হতো। শেষে ওই পরিণতি।

সামন্তপতির চর এখানেও উৎপাত আরম্ভ করলো। তারা প্রায়ই সংবাদ নিতে আসতো। যোগী পুরুষটি কে? কোন স্থান থেকে এদের আগমন? আর যুবাপুরুষটিই বা কেন এদের সঙ্গে—ইত্যাকার তাদের প্রশ্ন। সুভদ্রদাস বলতেন, যোগী পুরুষটি প্রকৃতপক্ষে যোগী নন—নিতান্তই দরিদ্র ভিক্ষাজীবী—তবে গতায়ু বৃদ্ধটি আমার মাতুল। মাতুলের সঙ্গেই যোগীটি এসেছেন। আর ঐ যুবাপুরুষটি মাতুলের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ঐ কথা ব'লে তাদের বোঝানো গেলেও, সিদ্ধপা যেমন, তেমনি শ্যামাঙ্গও বুঝছিলো যে বিল্বগ্রাম তাদের জন্য নিরাপদ নয়। সুধীমিত্র প্রজাপীড়ক না হলেও ঘোর বৈষ্ণব। ওদিকে পিপ্পলীহাট এবং উজুবটের কাহিনী দু'টি ভিন্ন আকারে এ অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছে। প্রচারণাটি এইরূপ যে, সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের প্ররোচনায় চণ্ডাল ডোম ও নিম্নশূদ্র ক্ষেত্রকররা দ্রোহ উত্থাপন ক'রে গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেছিলো—পরম সৌভাগ্য যে মহাসামন্ত হরিসেন ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন সজাগ, ফলে ঐ দ্রোহ ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কাহিনীটি ঐরূপেই সকলের জানা। সুধীমিত্র ঘর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, ধর্মরক্ষার জন্য হেন কাজ নেই যা তিনি করেন না। ভিক্ষু যোগীদের তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর চর প্রায় সর্বত্রই। চণ্ডাল ডোম হড়্ডিদের পল্লীগুলিতে তাঁর অনুচরেরা প্রায়ই ভ্রমণ করে। তেমন কোনো সন্দেহের কারণ ঘটলে তারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শোনা যায়, ইতোমধ্যে তারা কয়েকজন ভিক্ষুকে বন্দী করে নিয়ে গেছে—ঐ বন্দীদের কী পরিণতি হয়েছে, তা কেউ জানে না।

এসব সংবাদ জ্ঞাত হবার পর ঐ স্থানে কে থাকতে পারে? তাই সিদ্ধপা ভাগিনেয়ীকে নিয়ে এসেছেন এই নবপাটক গ্রামে, শিষ্য শীলনাথের গৃহে। ধীবর ও জালিকদের বাস গ্রামটিতে, সুতরাং গ্রামটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে। অন্তত সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের গমনাগমন যে ঐ গ্রামে নেই, এ বিষয়ে সামন্তপতির অনুচরেরা নাকি নিশ্চিত—এইরূপ একটি কথা পথিমধ্যেই সিদ্ধপা শুনেছিলেন। সুতরাং নবপাটক গ্রামে লীলাবতীরা দীর্ঘকালই অবস্থান করতে পারবে।

সিদ্ধপা শ্যামাঙ্গকে বলেছেন, বৎস, তোমাকেও এই স্থানে থাকতে হবে কিছুকাল, যতোদিন না লীলাবতীর একটি সদ্ব্যবস্থা হচ্ছে।

ব্যবস্থা হয়েছে, লীলাবতী অন্তঃপুরে গৃহস্থের পত্নী কন্যাদের সঙ্গে থাকবে আর শ্যামাঙ্গের স্থান হবে বহির্বাটিতে। এই ব্যবস্থা ক'রে সিদ্ধপা বিদায় নিয়েছেন। কোথায় গন্তব্য, কবে ফিরবেন, কিছুই বলে যাননি।

তবে সমস্যাও কিছু হয়নি। শীলনাথের পরিবারের সকলেই পরমাত্মীয় জ্ঞানে আতিথ্যদান করেছেন। শীলনাথ সম্পন্ন গৃহস্থ। একদিকে তাঁর ক্ষেত্রকর্ম, অন্যদিকে জালিকবৃত্তি। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপার্জন যথেষ্ট। গৃহে কত যে দাসদাসী আত্মীয়-পরিজন তা গণনা করা যায় না। শ্যামাঙ্গ কখনও কখনও ক্ষেত্র কর্মে সাহায্য করে। কখনও আবার জালিকদের সঙ্গে নৌকাযোগে মৎস্যাহরণে যায়। যখন কোথাও যায় না, তখন সে ব'সে ব'সে পুত্তলি নির্মাণ করে।

লীলাবতীর সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়, কোনোদিন হয় না। তার পিতৃশোক এখনও প্রশমিত হয়নি। যদিও সে পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়েছিলো, এমন দেখা যায়নি। পিতার মৃত্যুর পর সে অধিকতর গম্ভীর হয়েছে। কথা বলে কম। তার এই নীরবতার আবরণটি আর কেউ অনুভব করতে পারে না, কেবল শ্যামাঙ্গ অনুভব করে। সে বুঝতে পারে, লীলাবতী এখন হাসে না—তার কথায় এখন বুদ্ধিদীপ্ত বিচ্ছুরণ নেই—তার দু'চোখের চঞ্চল দৃষ্টিতে পলকে পলকে যে নতুন আলোর চমক দেখা যেতো, সেটি আর দেখা যায় না।

জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে যাবার পর সান্ত্বনার কি কিছু থাকে? শ্যামাঙ্গ মুখপানে দৃষ্টিপাত করলে সেও শ্যামাঙ্গের মুখপানে নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিপাত করে। কী দেখে, শ্যামাঙ্গ জানে না। তবে তার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আছে, এমন মনে হয়। সে জানতে চায়, কিছু বলবে লীলাবতী? লীলাবতী দক্ষিণে বামে মাথা দোলায়।

তোমার কি কথা বলতে ইচ্ছা করে না?

না, আর প্রয়োজনও কি আছে?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন। প্রয়োজন কি আছে? সত্যিই তো, কোন প্রয়োজনের কথা সে বলবে? আর থাকলেও সে কথা শ্যামাঙ্গকে কেন বলবে?

উজুবট গ্রামে আক্রান্ত হওয়ার পর সে শ্যামাঙ্গকে হাতে ধরে কুটিরের বাইরে নিয়ে এসেছিলো। বলা যায়, শ্যামাঙ্গের প্রাণ সেদিন সে-ই রক্ষা করেছে।

সেদিনকার সেই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, ধূম্রকুণ্ডলী, আর্তচিৎকার ও নরহত্যার দৃশ্যগুলির মধ্যে সে লোকটিকে দেখেছিলো তার স্পষ্ট মনে আছে—ওই মুখ বিস্মৃত হওয়া যায় না। মার মার রবে ধাবমান লোকগুলির সঙ্গে ঘাতকরূপী অভিমন্যু দাস ছুটে এসেছিলো। সে জানে না, তার উত্তোলিত তরবারির আঘাতই পিতার মস্তকে এসে পতিত হয়েছিলো কিনা। মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতা বারবার বলেছেন, মা জামাতাকে সংবাদ দিই, সে আসুক, তোকে নিয়ে যাক।

লীলাবতী মাথা কুটেছে পিতার পদপ্রান্তে। বলেছে, পিতা ও কাজ করবেন না। যদি করেন, তাহলে আমি আত্মঘাতিনী হবো।

শ্যামাঙ্গের তখন কিছুই করণীয় ছিলো না। একেবারেই নীরব থাকতো। লীলাবতী প্রশ্ন করতো, আমি কী করবো বলুন? বলুন, আমি কি সেই ঘাতকের গৃহে যাবো?

শ্যামাঙ্গ কোনো উত্তর দিতে পারতো না। তখন তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্রূপ আর অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত করতো সে শ্যামাঙ্গকে। বলতো, আপনি কেমন পুরুষ যে একটি রমণীর জীবিত থাকবার পথ করে দিতে পারেন না? তাহলে কেন ফিরে এসেছিলেন আপনি? বলুন, কোন আশা ছিলো আপনার মনে?

এই প্রকার তীব্র আক্রমণ প্রায় প্রতিরাত্রেই হতো। প্রতিরাত্রেই শ্যামাঙ্গ নীরব থাকতো। শেষে হরকান্তের মৃত্যু হলো—এবং তখন থেকেই সে নীরব। আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ নেই তার কথায়—ক্ষোভ নেই, আক্রমণ নেই। সে অন্তঃপুরে সম্ভবত শীলনাথের গৃহিণীকে গৃহকর্মে সাহায্য করে। দিনান্তে বারেক কোনোদিন দেখা হয়, কোনোদিন তাও হয় না। দেখা হলে কেবল নির্বিকার দৃষ্টি বিনিময়টুকু হয়। যেন অপরিচিত লোক দেখছে সে।

শ্যামাঙ্গ জানে না, এই অপেক্ষার শেষ কখন। সে কার জন্য অপেক্ষা করছে, লীলাবতীর জন্য কি? লীলাবতী তাকে কী দেবে, যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে? তার মনে প্রশ্ন জাগে একে একে। নাকি সে অরক্ষণীয়া এক রমণীর রক্ষকমাত্র? তার মাতুল এসে যাবে তারপর আর শ্যামাঙ্গের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। এই কি প্রকৃত অবস্থা তাহলে? পরস্পরের কাছে পরস্পরের কোনোই ভূমিকা নেই?

সে কিছুই বলতে পারে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড একটি শূন্যতা ব্যতীত কিছু নেই। তার বলার কিছু নেই, করারও কিছু নেই।

সে ইদানীং প্রায় প্রতিদিনই দু'চারটি করে পুত্তলি গড়ে। এবং প্রতিটি পুত্তলিতেই অবিকল লীলাবতী এসে ধরা দেয়। কোথাও লীলাবতী কক্ষে কলসটি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কোথাও সে কেশ পরিচর্যায় রত, কোথাও বা মেষ শাবকটিকে ক্রোড়ে নিয়ে সে আদর করছে—এই প্রকার নানান ভঙ্গি পুত্তলিগুলিতে। এগুলি সে এখনও কাউকে দিতে পারেনি। রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়েছে, এখন প্রজ্বলিত অঙ্গারে দগ্ধ করলেই ব্যবহারের উপযোগী হবে। এই জন্য সে নির্জন আম্রকাননের নিকটে একটি স্থানে অগ্নিকুণ্ড নির্মাণের আয়োজন করছিলো। কোথায় যে সংবাদ পেয়েছিলো বলা কঠিন, দ্বিপ্রহরে লীলাবতীকে সেই বিজন কাননে দেখা গেলো।

তাকে দেখে শ্যামাঙ্গ অবাক। বললো, তুমি?

হ্যাঁ, আমি—এখানে অগ্নিকুণ্ড কেন?

কিছু পুত্তলি গড়েছি, সেগুলি পোড়াবো।

কিন্তু এভাবে অগ্নি জ্বালালে গৃহস্থ রুষ্ট হতে পারেন, সে কথা ভেবেছেন?

শ্যামাঙ্গের জানা ছিলো না যে, পল্লীপ্রান্তের আম্রকাননপার্শ্বে, প্রায় সকলের অগোচরে, একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড জ্বালালেও তা অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে।

কাননভূমি নির্জন। লীলাবতী একটি পুত্তলি হাতে তুলে নিলো। দেখলো সেটি, অতঃপর সেটি রেখে পুনরায় অন্য একটি পুত্তলি তুলে নিলো, সেটিও দেখলো। সম্মুখেই শ্যামাঙ্গ অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে—সেদিকেও বার দু'য়েক দৃষ্টিপাত করলো। লীলাবতীর অবয়ব ফুটে রয়েছে পুত্তলিগুলিতে, সম্ভবত সেই কারণেই তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছিলো লজ্জা এবং অপরাধ বোধ। শ্যামাঙ্গকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার অন্তরাত্মা জ্বলে গেলো। বললো, কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তুমি বড় কৃশা হয়েছো।

কেন, স্থূলা হলে উত্তম হতো? দেখতে আরও আকর্ষণীয়া হতাম? নতুন একটি পুত্তলি গড়তেন?

শ্যামাঙ্গ কিছু বললো না।

আচ্ছা আপনি এখানে কেন রয়েছেন, বলতে পারেন?

এবারও শ্যামাঙ্গ নীরব।

সে তখন রুক্ষকেশী কৃশা রমণী মূর্তিটির মধ্যে সন্ধান করছে সোমপুর বিহারে দেখা সেই যক্ষী মূর্তিটির সাদৃশ্য। কোথায় সেই প্রগল্‌ভা তরুণীটি যার হাস্যাননে সূর্যালোক চমকিত হতো? যার কথা শুনলে হৃদয় হতো উৎফুল্ল, সে তো সম্মুখে নেই। এমন বিষাদ, এমন নিঃস্বতা কি কোনো নীরব মুখচ্ছবিতে সে দেখেছে কখনও? তার মনে পড়ে না।

শুনুন, আমি এখানে থাকবো না, হঠাৎ লীলাবতী জানায়।

কেন? কেন থাকবে না?

এখানে থাকা এবং ভদ্রপাদের পথকুক্কুরী হওয়া একই কথা।

এ তুমি কি বলছো? শ্যামাঙ্গ বিমূঢ় বোধ করে। জানতে চায়, শীলনাথ কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যোগব্রত নিয়েছি কিনা—আমাকে তাঁর সাধনসঙ্গিনী করতে চান। আগামী অমাবস্যায় শীলনাথ যোগাচারে প্রবেশ করবেন।

শ্যামাঙ্গ যোগাচারের প্রক্রিয়া কী জানে না। তবে শুনেছে, নানান ক্রিয়াকাণ্ড থাকে ঐ আচারের অনুষ্ঠানাদিতে। নারী-সঙ্গের একটি কুৎসিত ব্যাপারও নাকি ঐ আচারের আবশ্যিক অঙ্গ। সে বললো, লীলা, এবার তোমাকে মনস্থির করতে হবে।

লীলা শ্যামাঙ্গের মুখপানে চায়।

শ্যামাঙ্গ বলে, আমি এযাবৎ কিছুই বলিনি। কেননা আমার বলবার কথা ছিলো না। তোমার পিতা ও মাতুল ছিলেন। আমি যদি কিছু বলতামও, তাহলে তা গ্রাহ্য হতো না—আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা তুমিও করতে। ভাবতে, আমি লোভ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে কথা বলছি। কিন্তু এখন তোমার পশ্চাতে কেউ নেই। এখন তুমি কেবল তোমার। সুতরাং সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে বহুদূর চলে এসেছি।

আমার আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।·তবে পুরুষ মানুষ ব'লে আমি হয়তো পথে পথেই থেকে যেতে পারি। তথাপি তোমার সিদ্ধান্তটি আমার জানা প্রয়োজন—কেননা সিদ্ধান্তটি হবে প্রকৃতপক্ষে আমাদের উভয়ের। আজ যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারি আমরা, তাহলে সে ব্যর্থতার দুর্ভার গ্লানি সমস্ত জীবন আমাদের বহন করতে হবে। আমি বলি, তুমি স্বামীর কাছে চলো, আমি নিয়ে যাই। সামাজিক জীবনে তুমি স্থিতা হবে, সংসারে তোমার স্থান হবে, সে এক পথ। নতুবা চলো, আমরা এ স্থান ত্যাগ ক'রে দূর দেশে চলে যাই। আমরা দু'জনে যদি একত্র জীবনযাপন করতে চাই তাহলে দূর দেশে গমন ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই—তুমি ভেবে দেখো, অমাবস্যার এখনও বিলম্ব আছে—

হঠাৎ লীলা বাধা দেয়। তখন তার চক্ষু দু'টির ভিতরে কোমল একটি আলো ফুটে উঠেছে। বিষাদ-করুণ মুখখানিতে অস্পষ্ট হাসির ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে শ্যামাঙ্গের হাত ধ'রে বলে, অতো কথায় কি প্রয়োজন—তুমি অহেতুক অধিক কথা বলো। আজ রাত্রেই এ স্থান ত্যাগ করলে হয় না? ঐ বনের মধ্যে পথ নেই? ও পথে কি ব্যাঘ্র ভল্লুকের সংখ্যা অত্যধিক?

ঐ কথা বলেই লীলাবতী প্রস্থান করে। শ্যামাঙ্গ নির্বোধের মতো তার গমনপথে চেয়ে থাকে। এ কী ঘটলো? এ যে কল্পনারও অতীত! লীলাবতী সমাজ সংসারের কথা কি কিছুই চিন্তা করতে চায় না? পথের বিপদ আপদের বিবেচনাও কি তার নেই?

কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যাকালেই মাতুল সিদ্ধপা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বললেন, আমি পুনর্ভবার উভয় তীরের গ্রামগুলি দেখে এলাম। অবস্থা বড় বিপজ্জনক। সর্বত্রই আশঙ্কা এবং ত্রাস। দক্ষিণের এক সামন্তপতি দু'খানি গ্রাম ধ্বংস করেছেন—একখানি হড্ডিদের, অন্যখানি ডোমদের। এখন তোমাদের এ স্থানে অবস্থান করাই উত্তম।

শ্যামাঙ্গ লীলাবতীর কথাটি জানালে সিদ্ধপা গম্ভীর হলেন। এবং বললেন, বৎস, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। কেননা শীলনাথের আমি দীক্ষাগুরু। আমার যোগব্রত কঠোর সংযম এবং রিপু শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি কামাচারী নই—শীলনাথেরও হবার কথা নয়। তবু আমি গোপনে সন্ধান নিয়ে দেখবো। যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তাহলে এ স্থানে আর কোনোক্রমেই থাকা যাবে না। আর যদি তোমাদের কথা সত্য না হয়, তাহলে কিন্তু কঠিন শাস্তি দেবো তোমাকে।

মহাশয়, আমি বলেছি, কথাটি আমার নয়, আপনার ভাগিনেয়ীর, শ্যামাঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, আপনি বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।

লীলাবতী রাত্রে এসে জানায়, যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে, মাতুলের উপস্থিতিতে পলায়ন করলে ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে।

শ্যামাঙ্গ হাত ধরে, লীলা, তোমার মত পরিবর্তিত হয়নি তো?

লীলা স্থির হয় মুহূর্তের জন্য। তারপর চোখের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বলে, তুমি কি উন্মাদ হয়েছো? আমার যে আর গত্যন্তর নেই, তুমি বুঝতে পারো না?

সিদ্ধপার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়াটি ইদানীং সর্বক্ষণ থাকে। তিনি উজুবটেও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। যেমন মহাসামন্ত হরিসেন এখন রাজধানীতে। ওদিকে সামন্তপতিদের উপর আদেশ হয়েছে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজজ্যোতিষেরা নাকি বলেছেন, গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান বিপজ্জনক—রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী, এবং তা ঘটবে যবনদেরই হাতে। সুতরাং জ্যোতিষীদের বিধান, যজ্ঞ করো, যজ্ঞের মন্ত্রেই যবনের উপদ্রব দূরীভূত হবে।

একদা রাত্রিকালে অকস্মাৎ শ্যামাঙ্গকে শয্যা থেকে ডেকে তুললেন সিদ্ধপা। বললেন, চলো, তোমাকে যোগব্রত গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাকে দীক্ষাদান করবো।

শ্যামাঙ্গ কিছুই বলার অবকাশ পেলো না। একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন শ্যামাঙ্গকে। সেখানে কক্ষের মধ্যস্থলে ভূমিতে চক্র ও রেখা অঙ্কিত দেখলো শ্যামাঙ্গ। ঐ মধ্যস্থলেই ধূপ জ্বলছে, প্রদীপ জ্বলছে, কয়েকটি পদ্মফুল সেখানে, সেই সঙ্গে আবার জবা ফুলও। ঐ মধ্যস্থলেই দেখলো, বসে আছে লীলাবতী। শীলনাথ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। সে বললো, গুরুদেব, আজ রাত্রে তো কোনো শুভলগ্ন নেই, উপরন্তু জাতক জাতিকার কায়াশুদ্ধিরও একটি ব্যাপার আছে—অনুষ্ঠানটি পরে করলে হতো না?

সে চিন্তা আমার, সিদ্ধপা জানালেন। বললেন, কালযোগ ব'লে একটি কথা আছে—আর কায়াশুদ্ধির তুমি কী জানো? আমি জানি, আমি কী করছি, আমাকে শুভকার্য সমাধা করতে দাও, বাধা দিও না—এই ব'লে তিনি দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন।

শ্যামাঙ্গের কিছুই বোধগম্য হচ্ছিলো না। উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার মন্ত্র পাঠ করলেন সিদ্ধপা, তারপর নিম্নস্বরে বললেন, এ তোমাদের দীক্ষা নয়—দীক্ষাগ্রহণের জন্য সাধনা প্রয়োজন—তা তোমাদের নেই। আমি লীলাবতীর কথা চিন্তা ক'রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'রে দূর দেশে চলে যেতে হচ্ছে। এই রাত্রেই তোমরা এ গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে যাবে, যত দ্রুত সম্ভব, দূরে চলে যেও। পথিমধ্যে কোথাও বিলম্ব করবে না। পুন্ড্রনগরে উপনীত হলে তখন বুঝবে যে, আর ভয় নেই। পথিমধ্যে যদি কোথাও কোনো যবন কেন্দ্র দেখো, তাহলে সেখানে আশ্রয় নেবে।

ঐ পর্যন্ত বলেই তিনি অগ্নিতে ধূপ নিক্ষেপ করলেন। অগ্ন্যায় স্বাহাঃ বললেন কয়েকবার, তাতে কক্ষটি ধূপের গন্ধে এবং ধূমে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। শেষে দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ডাকলেন শীলনাথকে। বললেন, তোমার কে দীক্ষাপ্রার্থী আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

গুরুদেব, সে তো ভিন্ন গ্রামে থাকে।

তবু ডেকে আনো, রাত্রির শেষ যামে তার দীক্ষা হবে।

শীলনাথ চলে গেলে তিনি পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে শ্যামাঙ্গকে ডেকে বললেন, চলো, আমি তোমাদের পথে রেখে আসি।

মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতা এবং অন্ধকার। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে শ্যামাঙ্গ। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ তুমি কোথায় চলেছো শ্যামাঙ্গ? একি তোমার জীবনের

পথে যাত্রা? নাকি এই পথেই তোমার মরণ? সে পার্শ্বে সহগামিনী লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করে মৃদুস্বরে, আমরা কোথায় যাচ্ছি লীলা?

লীলা বলে, জানি না।

গ্রাম প্রান্তে উপনীত হলে সিদ্ধপা দাঁড়ালেন। ঊর্ধ্বাকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, নক্ষত্রমালা সাক্ষী, রাত্রির অন্ধকার সাক্ষী, তোমার আমার নিঃশ্বাস বায়ু সাক্ষী— শ্যামাঙ্গ, লীলাবতীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম, ওকে তুমি রক্ষা ক'রো। তোমাদের বিবাহ হবে না—কেননা শাস্ত্রের কোনো বিধান নেই যে তোমাদের বিবাহ হয়—এ বড় দুষ্কাল বৎস, জানি, তোমাদের সংসার হবে না—তথাপি আমি তোমাদের মিলিত করে দিলাম—পারলে যোগব্রত পালন ক'রো, শিব তোমাদের মঙ্গল করুন।

মাতুলকে প্রণাম ক'রে দু'জনেই দ্রুত পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হলো। জ্যৈষ্ঠ গত হয়ে আষাঢ়ের আরম্ভ এখন। কিন্তু সৌভাগ্য যে বর্ষা এখনও নামেনি। আকাশের নক্ষত্রমালা দেখতে দেখতে দু'জনে পথ অতিক্রম করে চললো। লীলাবতীর মুখে কোনো কথা নেই। বস্ত্রের অঞ্চলটি মাথায় তোলা, তথাপি বোঝা যায়, অবগুণ্ঠনবতী এই রমণী মাথা নীচু করতে জানে না। সঙ্কোচহীন একটি দৃপ্ত ভঙ্গী তার মস্তককে উন্নত করে রেখেছে। শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করলো, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ, দৃষ্টি দিগন্ত লগ্ন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ জড়তাবিহীন। একবার শ্যামাঙ্গ বললো, একটু দ্রুত চলো।

লীলাবতী মৃদু স্বরে জানতে চাইলো, কেন?

শীলনাথের লোক অনুসরণ করতে পারে।

করুক।

ক্ষুদ্র একটি শব্দ। কিন্তু শতকথা যেন সে ঐ একটি শব্দে উচ্চারণ করে।

শ্যামাঙ্গ পুনরায় বলে, লীলা, আমরা কোথায় চলেছি জানো?

ঐ কথায় মস্তক আন্দোলিত করে লীলাবতী, না। তারপর বলে, সম্ভবত মরতে।

না, কৌতুকের কথা নয় লীলা, শ্যামাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার জানা প্রয়োজন, তুমি কোথায় চলেছো—তোমার মাতুলের কথাগুলি নিশ্চয়ই শুনেছো?

না, আমার প্রয়োজন ছিলো না।

কি কাণ্ড, নারী জাতি দেখছি সত্যিই ভয়ঙ্কর! এবার শ্যামাঙ্গের কণ্ঠে ঈষৎ কৌতুক ধ্বনিত হয়।

লীলা ঐ কথায় মুহূর্তেক দাঁড়ায়। তারপর বলে, এভাবে পথে বিলম্ব ক'রো না তো! সম্মুখে আমাদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে। পূর্বাকাশে আলোকোচ্ছাস, বনকুক্কুট ডাকছে পথিপার্শ্বের ঝোপগুলিতে। একটি গোধিকা বামদিক থেকে দক্ষিণে গেলো। দিগন্তে ঐ সময় মেঘ দেখা গেলো—তবে ঐ মেঘ ঝড়েরও নয়, বৃষ্টিরও নয়। সম্মুখে একটি গ্রাম দেখা যায়। শ্যামাঙ্গ শুধালো, এখানে ক্ষণেক বিশ্রাম নেবে? না, লীলাবতী জানায়, আমি ক্লান্ত নই— পরবর্তী কোনো স্থানে বিশ্রামের কথা চিন্তা করবো।

কিন্তু আমি যে বিশ্রাম চাই? শ্যামাঙ্গের স্বরে কি কৌতুক?

তুমি দেখছি নারীরও অধম। ধিক তোমার পুরুষ জীবনে।

এই তো লীলা আবার সহজ হচ্ছে। শ্যামাঙ্গ উৎফুল্ল হয় মনে মনে। লীলাবতীর হাতখানি সে ধরে। বলে, লীলা ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখি।

তুমি আমাকে দেখবার কে? লীলার কণ্ঠে শাসন।

শ্যামাঙ্গ অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, আমাদের যে মিলিত ক'রে দিয়েছেন তোমার মাতুল।

সে তো যোগব্রতের মিলন, সংযম আচরণ করতে হবে দু'জনকেই।

হঠাৎ লীলাবতী দাঁড়ালো। পূর্বাকাশ এখন পরিষ্কার—পরস্পরের মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। বললো, শ্যামাঙ্গ, তুমি কী চাও বলো তো?

আমি তোমাকে চাই, অকপটে দাবি করে শ্যামাঙ্গ।

আমাকে চাও, অর্থ কি আমার এই দেহটিকে চাও। দেহ পেলেই তোমার চলবে?

শ্যামাঙ্গ প্রমাদ গণনা করে। কী বলতে চায় এই নারী? সে বলে, লীলা, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

উত্তম কথা, ভালোবাসো বলেই তো আমাকে চাও তুমি, তাই না? তোমার কথা আমার কাছে দুর্বোধ্য নয়। বলো, আমার এই দেহটি চাও? যদি অতীব প্রয়োজনীয় মনে করো, তাহলে নাও।

এই কথা বলে সে উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র অপসারিত করলো। শ্যামাঙ্গ দেখলো তার গ্রীবা, সুগোল স্কন্ধ দু'টি, উন্নত ও মহিমান্বিত স্তন যুগল, ক্ষীণ কটিদেশ—

বলো, আরও দেখতে চাও, তাহলে নিম্নাঙ্গের বস্ত্রও আমি অপসারিত করি।

শ্যামাঙ্গের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে আহত বোধ করে। বলে, তুমি কি আমাকে লম্পট ভেবেছো?

না, তা কেন ভাববো, লীলাবতীর কণ্ঠ অতীব সুস্থির।

তাহলে তুমি ওভাবে কেন নিজেকে অপমানিত করলে?

শ্যামাঙ্গ, তুমি কি কলহ করবে পথে? লীলাবতী বলে, আমি তোমাকে মনে স্থান দিয়েছি সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে, মনে আছে তোমার, পুনর্ভবাতীরের বটতলের উচ্চ বেদীটির কথা? আমি তারপর থেকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাকে কামনা করেছি। লম্পট মদ্যপ অথবা নির্বোধ লোক নিয়ে রমণীরা সংসার করছে না? আমিও হয়তো একদিন অভিমন্যু দাসের কাছে চলে যেতাম। কিন্তু তুমি এলে আমার সম্মুখে, আর জীবনের অর্থ আমার নিকট অন্যরূপ হয়ে গেলো। এখন আমার পূর্বজীবন বলে কিছু নেই, আমি মনে করি, সেই জীবন উজুবটেই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তুমি ব্যতীত এখন আমার কেউ নেই। আমার দেহ মন আমি সমস্তই তোমাকে দান করে রেখেছি—তবু তুমি কেন লোভী বালকের মতো আচরণ করো, বলো? প্রিয়তমাকে বক্ষলগ্ন করার এই কি সময়? এই কি স্থান?

লীলাবতীর সমস্ত সংযম ঐ কথার পর ধসে পড়ে, তার কণ্ঠ রোদনউদ্বেল হয়ে ওঠে। সে শ্যামাঙ্গের বক্ষে নিজেকে সমর্পণ করে।

এ কি দেখছে শ্যামাঙ্গ, কে এই রমণী, যে তার বক্ষে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো? সে দু'হাতে লীলাবতীকে বক্ষে ধারণ করে রাখে। তারপর ক্ষমা চায়, লীলা, ক্ষমা করো— আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি—ক্ষমা ক'রে দিও আমাকে।

সোমজিৎ লক্ষ্মণাবতীর অভিজাত পল্লী থেকে নিক্রান্ত হয়ে রাজপথ অতিক্রম করছিলেন। বার্দ্ধক্যের কারণে স্বভাবতই ঋজুতা হারিয়েছেন—যেমন দেহের, তেমনি মনেরও। তথাপি তাঁকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে রাজধানীতে আসতে হয়েছে। মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। রাজধানীতে এসে অবধি নানান জনরব শুনছেন। কেউ বলছে, বৃদ্ধ মহারাজ রাজধানীতে নেই, গঙ্গাতীরে গিয়েছেন। কেউ বলছে, তিনি অত্যধিক রুগ্ন, রাজকার্য এখন দেখেন না। এক স্থানে আবার শুনলেন, মহারাজ নাকি যবনাক্রমণ আসন্ন দেখে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করেছেন। প্রকৃত সংবাদটি যে কী, কিছুই জানবার উপায় নেই। হলায়ুধ মিশ্র তাঁর সতীর্থ ছিলেন গুরুগৃহে। সেই সূত্রে এখনও উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা রয়েছে। বর্ষকাল পূর্বেও তিনি রাজধানীতে এসেছিলেন—তখনও সাক্ষাৎ হয়েছে। এবার তিনি হলায়ুধের মাধ্যমে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের নিকটে যেতে চান। মহারাজের নিকট তিনি একটি আবেদন জানাবেন।

কিন্তু জনরবের পর জনরব শুনছেন। যদি আজ শুনলেন যে, রাজসভার এখন মান্যপুরুষ গোবর্ধন আচার্য, তো কালই আবার জানলেন, গোবর্ধন আচার্য নয়, প্রকৃত পুরুষ হচ্ছেন মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র। পরদিন আবার জানতে পারলেন—ও সমস্ত কিছুই সত্য নয়। মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন, পাণ্ডিত্যের পীড়নে ইদানীং বিরক্ত হন। এখন রাজসভার আনন্দদানকারী নট গাঙ্গোকই হচ্ছে মূল ব্যক্তি। যদি কেউ পারে, তো সেই পারবে, রাজার সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে। আর একজন আবার বললো, রাজসভার যে সংবাদ শুনছেন কোনোটিই সত্য নয়—এসব সংবাদের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। রাজসভায় কিছুই হয় না, মহারাজের অতো সময় কোথায়? আপনি বরং রানী বল্লভার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। রানী বল্লভা একে যুবতী, তায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। রাজা যা-কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা শয্যাতেই, বিশ্রাম গ্রহণকালে।

জনরবগুলির ভিত্তি যে কী, এবং কেন যে ঐ প্রকার একের-পর-এক জনরবের জন্ম হচ্ছে, তার কোনো ব্যাখ্যাই কেউ তাঁকে দিতে পারলো না। না তাঁর কন্যা, না জামাতা।

রাজপথটি প্রশস্ত। অপরাহ্ণের রৌদ্র এসে পতিত হয়েছে অট্টালিকাসমূহের প্রাচীর গাত্রে। পথচারীদের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট নয়। সম্ভবত গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতাই কারণ। আষাঢ়-মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজ সংসারকে ঝলসিত করে দিচ্ছে। অনুমান হয়, দুই চারিদিনের মধ্যেই বৃষ্টি হবে। সোমজিৎ বুঝলেন, শীঘ্রই তাঁকে স্বগ্রামাভিমুখে যাত্রা করতে হবে—নতুবা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে পথে কষ্টের সীমা থাকবে না।

দুই পার্শ্বে গৃহাঙ্গনের বৃক্ষছায়ায় বিশ্রামরত নগরবাসীদের দেখতে দেখতে চললেন সোমজিৎ। সম্ভবত গন্তব্যের নিকটে এসে গিয়েছেন। জলসিক্ত বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছেন দেহে। গঙ্গাতীরেই তো চতুষ্পাঠীটির অবস্থান বলে শুনেছেন। চক্রায়ুধ মিশ্র প্রতিষ্ঠিত এই নব চতুষ্পাঠীটি ইতোমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে, জামাতা কেশবাচার্য এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তিনিই হলায়ুধের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন। হলায়ুধ নাকি প্রতি পক্ষে একটি অপরাহ্ণ এ স্থানে অতিবাহিত করেন। আজই সেই দিনটি, এবং অপরাহ্ণকালও সমাগত। কষ্ট হচ্ছে তাঁর দ্রুত পদক্ষেপণ করতে।

কন্যা সরস্বতী বলেছিলো, পিতঃ, ঐ দীর্ঘপথ পদব্রজে যাবেন না, আমি একটি দোলার ব্যবস্থা করে দিই।

সোমজিৎ সম্মত হননি। সহাস্যে বলেছিলেন, মাতঃ ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করো যে, আমি যেন একবারই মানুষের স্কন্ধে উঠি,—বারংবার ওঠা নামায় এ বৃদ্ধের বড় কষ্ট হবে।

অপরাহ্ণকাল বলেই চতুষ্পাঠীটি নীরব। ইতস্তত কয়েকজন স্নাতককে দেখা যাচ্ছে। বালক ও কিশোরের দল যে কোথায়, বোঝা যাচ্ছে না। বৃহৎ চতুঃশালা সম্মেলক-গৃহটির পর বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। মধ্যে একদিকে দু'টি বকুল বৃক্ষ, অন্যদিকে দু'টি চম্পক। বৃক্ষলতা, পুষ্প ও পত্র-পল্লবে স্থানটি স্নিগ্ধ ও মনোরম। কেশবাচার্য দ্বারেই ছিলেন। জানতে চাইলেন, আপনি কি বৃক্ষতলে উপবেশন করবেন, না অলিন্দে?

বৃক্ষতলেই বসি, কি বলো? সোমজিৎ হাসলেন।

একটি তরুণ ব্রাহ্মণ সম্মুখে এসে প্রণাম করলে সোমজিৎ অবাক হলেন। বললেন, এটিকে যেন পরিচিত মনে হচ্ছে?

সেকি, মনে নেই আপনার? এ তো আমার অনুজ, মাধব—এবার স্নাতক হলো।

দীর্ঘায়ু হও বৎস। তুমি দেখছি দিব্য যুবাপুরুষটি হয়ে উঠেছো। তোমার কী ভালো লাগে—ন্যায় না স্মৃতি? নাকি ব্যাকরণ?

আজ্ঞে না, আমি কাব্যানুরাগী।

তা বটে, এই বয়সে কাব্যেই তো শিক্ষার্থীর অনুরাগ থাকে—কী পাঠ করছো এখন?

তরুণটির মুখে সলজ্জ হাসি দেখা গেলো। বললো, আমার বানভট্ট, ভবভূতি, দণ্ডী এঁদের ভালো লাগে। তবে এখন জয়দেব পাঠ করছি।

সে কি। সোমজিৎ অবাক হলেন। জয়দেব গোস্বামী কি তাঁর গীতগোবিন্দ সমাপ্ত করেছেন? তার পুঁথিও কি প্রস্তুত হয়ে গেছে? জানতে চাইলেন, তোমরা সম্পূর্ণ পুঁথি পেয়েছো?

আজ্ঞে না, কবি স্বয়ং আমাদের কাছে অংশে অংশে দিচ্ছেন এবং সেই অনুক্রমে আমরা লিপি প্রস্তুত করছি।

ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন সোমজিৎ। রাঢ়ের সেই যুবকটি—পীত ধটিকা পরিধানে, উৎকলবাসীদের মতো মস্তকোপরি প্রকাণ্ড স্থূল শিখাটি, উপবীতখানিও রজ্জুসদৃশ—সেই গ্রাম্য যুবকটি একদা সকলের মন জয় করে নিলো। ঐ কবিসভায় সোমজিৎও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর শ্লোকও প্রশংসিত হয়েছিলো। কিন্তু জয়দেবের শ্লোকাবলীর মতো নয়। তথাপি অনেকের মত সোমজিতেরও সন্দেহ ছিলো। তারও মনে হয়েছিলো, ঐ পদ চলবে না—একেবারেই প্রাকৃতগন্ধী। কিন্তু চললো—রাজসভা সাদরে গ্রহণ করে নিলো জয়দেব গোস্বামীকে।

জয়দেব বুঝি তোমাদের অত্যন্ত প্রিয়? সোমজিৎ তরুণটির মুখোপরি দৃষ্টি রাখলেন।

আজ্ঞে, তরুণ মাধবাচার্য পুনরায় সলজ্জ মুখখানি নমিত করে। তারপর বলে, তবে প্রাকৃত পদাবলী বোধ হয় আমার অধিকতর প্রিয়।

কেন? সোমজিতের ভ্রূ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দেখা যায়, কেশবাচার্যের দৃষ্টিও আর সরল নেই।

ঐ প্রকার ভ্রূকুটি কুটিল প্রশ্ন হওয়াতে মাধব প্রথমে অপ্রস্তুত, পরে শঙ্কিত হয়। অনুমান করে, তার কথায় সম্ভবত বয়োজ্যেষ্ঠ দু'জনই আহত হয়েছেন। সে অনুমতি প্রার্থনা করে। বলে, আমার কাজ আছে, অনুমতি দিন, আমি যাই।

তরুণটি প্রস্থান করলে সোমজিৎ মন্তব্য করলেন, এই তাহলে তোমাদের বিদ্যাদান। রুচি তো দেখছি ক্রমেই প্রাকৃত হয়ে যাচ্ছে—এ তো ঠিক নয়।

কেন, পিতঃ, গৌড়ীয় রীতিও তো একটি রীতি।

হ্যাঁ, এক প্রকার রীতি—কিন্তু সে রীতি অক্ষমের, আর্যত্বের তোমরা আর কিছু রাখলে না।

ঐ সময় দূরে দ্বারদেশে রাজপ্রহরীদের দেখা গেলো। পরে দেখা গেলো, একখানি দোলা। হলায়ুধ মিশ্র আসছেন।

নিকটে এসেই হলায়ুধ বাল্যবন্ধুকে উদ্বাহু হয়ে আলিঙ্গন করলেন। হলায়ুধ এখনও শক্তিমান—দেহ ঋজু, বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মতো। কপালে চন্দন-লেখা, শিখাগ্রে পূজার পুষ্প, উপবীতখানি শুভ্র—সমগ্রদেহে পৌরুষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সোমজিৎ বললেন, তুমি দেখছি সেইরূপই আছো।

হ্যাঁ, বলতে পারো, হলায়ুধ বলেন,—তবে এ কৃতিত্ব আমার নয়, ব্রাহ্মণীর—তিনি যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকি।

কিন্তু আমি কিরূপ বৃদ্ধ হয়েছি দেখেছো?

ও কিছু নয়, দেহ দেখে কিছুই বোধগম্য করা যায় না, অন্তরটি বৃদ্ধ না হলেই হলো। ক্ষণপরে পুনরায় হলায়ুধ বলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা কি জানো?

কি, সোমজিৎ কৌতূহলী হন।

নিজের নিকট কিছুই না রাখা, নিজেকেও না রাখা। নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দাও, দেখবে যথার্থ যত্ন হচ্ছে, এবং তোমার দিনও অতিবাহিত হচ্ছে দায়হীন আনন্দের মধ্য দিয়ে।

কৌতুকালাপে কিছুক্ষণ গেলে সোমজিৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। বললেন, হলায়ুধ, তুমি রাজপুরুষ, তোমার কাছেই আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি, যদি আমার আবেদনটি তোমার অনুমোদন লাভ করে, তাহলে আমি সেটি মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের পাদপদ্মে নিবেদন করতে চাই।

হলায়ুধ গম্ভীর হলেন। সোমজিৎকে তিনি বাল্যকাল থেকে জানেন। সকল ব্যাপারেই সে গভীর এবং গুরুপ্রশ্ন ব্যতীত অযথা চিন্তা করে সময় ব্যয় করে না। হলায়ুধ বললেন, তোমার আবেদনটি কী, সেইটি আগে বলো।

ঐ কথার পরও সোমজিৎ ইতস্তত করেন। তিনি নিশ্চিত নন হলায়ুধ কতখানি আগ্রহী হবেন শুনতে। তথাপি তিনি আরম্ভ করলেন—

তুমি জ্ঞাত কিনা জানি না, পুনর্ভবাতীরে আমাদের অঞ্চলে হরিসেন অত্যন্ত প্রতাপশালী সামন্তপতি। সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের গমনাগমন লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো—বিশেষত অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে তাদের হৃদ্যতা হয়ে উঠেছিলো নিবিড়। ডোম রমণীরা কেমন হয় নিশ্চয় শুনেছো। তারা যেমন শিথিল-শাসনা তেমনই উচ্ছৃঙ্খল, তাদের এই স্বভাব প্রায় সর্বত্র। ঐ অঞ্চলে পিপ্পলী হাট নামক একটি হাট আছে। ঐ হাটে একদা হরিসেনের অনুচর বজ্রসেন কয়েকটি কুলটা ডোম রমণীকে শাসন করতে যায়। ফল হয় ভয়াবহ, হাটের ক্ষিপ্ত মানুষ বজ্রসেন ও তার দুই অনুচরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে—তাদের দেহ এমনই ছিন্নভিন্ন করে দেয় যে তাদের পরিচয় উদ্ধার করাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সামন্ত হরিসেন ঐ ঘটনার প্রতিশোধ নেন—এবং সেই প্রতিশোধটিও ভয়ঙ্কর। ঐ পিপ্পলী হাটেই কয়েকদিন পর বিশাল এক জনসমাবেশে একটি কুলটা ডোম রমণীর মধ্যদেশে অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তার দুই শিশুপুত্রকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। একটি সদ্ধর্মী ভিক্ষুকে ঐ স্থানেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।

হলায়ুধ মিশ্র শুনছিলেন। বললেন, এ যে দেখছি একেবারেই পাশবিক কাণ্ড।

হ্যাঁ, পাশবিক কাণ্ডই বলতো পারো। সোমজিৎ পুনরায় বলতে থাকেন, কিন্তু হরিসেন সেখানেই নিরস্ত হননি। আমাদের নিজগ্রাম উজুবটের উত্তরপাটক পল্লীটি হরিসেনের অনুচরদের হাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বহু শিশু, নারী ও বৃদ্ধ নিহত হয়। এবং আশ্চর্য কাণ্ড কি জানো, ঐ আক্রমণের মুহূর্তেই পল্লীটি পুনরপি আক্রান্ত হয় অন্য আর একদল অশ্বারোহী সেনাদল দ্বারা। শোনা যায়, তারা পশ্চিম দেশাগত এবং জাতিতে যবন।

কোনদিক থেকে আগমন এবং কোথায় প্রস্থান, তার কিছুই জানা যায়নি। তবে প্রকৃত কথা এই যে, উজুবট গ্রামের উত্তরপাটক পল্লীটি একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

হলায়ুধ মিশ্র সংবাদটি শুনে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, তুমি যবন সেনাদলের কথা কী জানো, তাই বলো।

না হলায়ুধ, আমি ও বিষয়ে কিছুই জানি না, সোমজিৎ জানান। বলেন, এবং ও বিষয়ে আমি কিছু বলতেও আসিনি। যে কারণে আমি রাজধানীতে এসেছি সেটি শুনতে হবে তোমাকে। পিপ্পলী হাট ও উজুবটে ঘটনা দু'টি ঘটে যাওয়ার পর থেকে সমগ্র অঞ্চলটি হয়ে রয়েছে সন্ত্রস্ত। গ্রামবাসী কেউ গৃহে রাত্রিযাপন করে না। কোনো রাজ-পুরুষকে দেখামাত্র মানুষ শত হস্তেন দূরাৎ পলায়ন করে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গৃহীদের গৃহে দাসদাসী নেই। ভূমি কর্ষিত হয় না, বীজ উপ্ত হয় না, শস্য কর্তনের লোক নেই—এক ভয়ানক অবস্থা সর্বত্র। এমতাবস্থায় মহারাজের কিছু করা উচিত। যদি তিনি তাঁর সামন্তদের শাসন না করেন, তাহলে ঐ অঞ্চলগুলিতে মানুষ থাকবে না। তাই আমার আবেদন, মহারাজ তাঁর সামন্ত হরিসেনকে আদেশ দিন, যেন তিনি প্রজাপীড়ন না করেন—ঐ প্রকার দুষ্কর্ম যেন আর না হয়।

পণ্ডিত, কত ধান্যে কত তণ্ডুল যদি বুঝতে! হলায়ুধ হাসতে হাসতে বললেন। জানালেন, তোমার কথা আমি মহারাজের গোচরে আনতে পারি—এমনকি তোমাকেও আমি রাজসভায় নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু মনে হয় না, তাতে তোমার লাভ হবে। প্রথমত, সামন্তদের রাজা শাসন করবেন না—কারণ, বহিঃশত্রু রাষ্ট্রের দ্বারদেশে উপনীত। দ্বিতীয়ত, সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের আচরণ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং বিষয়টি শ্রবণ ক'রে মহারাজ যখন মন্ত্রীদের অভিমত চাইবেন তখন মন্ত্রীদের তো যুক্তিসঙ্গত অভিমত দিতে হবে। বলো, কে তখন অযৌক্তিক অভিমতটি দেবে? বিশেষত একজন সামন্তপতির বিরুদ্ধে যেখানে অভিযোগ। উঁহু, অসম্ভব।

সোমজিৎ উপাধ্যায় হলায়ুধ মিশ্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। দেখছিলেন, পিপ্পলী হাটের ঘটনাটি বর্ণনার সময় হলায়ুধ ঈষৎ আন্দোলিত হলেও যখন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আসছে, তখন তিনি অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি যুক্তির প্রশ্ন তুলছেন, সম্ভাব্যতা অনুমান করছেন, এবং ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর ঘটনাবলীর নায়কদের শাস্তি না দিয়ে বরং সমর্থন করতেই অগ্রহী।

তিনি হতাশ হলেন। বললেন, শোনো হলায়ুধ, আমি জানি না, যবন জাতি সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত। আপাতত তাদের শত্রু বলেই বিবেচনা করতে হবে। অপরদিকে সদ্ধর্মী বৌদ্ধদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন এই দুই শত্রুর মধ্যে কি একটির সঙ্গে মিত্রতা করা যায় না? বৌদ্ধরা এদেশবাসী, তাদের সঙ্গে আমাদের বহু সাদৃশ্য, দেশাচারে লোকাচারে আমরা ভিন্ন নই। কিন্তু যবন জাতি একেবারেই বহিরাগত। তারা এলে ধর্ম যাবে, কুল যাবে, জাতি যাবে। সেই সমূহ পতন থেকে দেশ ধর্ম ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য কি সদ্ধর্মীদের সঙ্গে মিত্রতা করা যায় না?

তুমি বৌদ্ধ পাষণ্ডদের সাথে মিত্রতা করতে বলছো? হলায়ুধ সন্দেহান্বিত দৃষ্টিপাত করেন।

হ্যাঁ, চিন্তা করে দেখো, তাহলে তোমার ধর্ম রক্ষা পাচ্ছে, জাতি রক্ষা পাচ্ছে, রাজ্য রক্ষা পাচ্ছে—তুমি নিজে রক্ষা পাচ্ছো। আমার এই আবেদনটি তুমি রাজার কাছে নিবেদন করো।

তুমি উন্মাদ সোমজিৎ, হলায়ুধ উঠে বসলেন। বললেন, তুমি বিলক্ষণ উন্মাদ! রাষ্ট্র কি একজন ব্যক্তির ইচ্ছায়, ক্ষণিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে চলে? আজ ইচ্ছা করলে আর অমনি সদ্ধর্মী বৌদ্ধরা তোমার বন্ধু হয়ে গেলো? সদ্ধর্মী ভিক্ষুরা আর্য ধর্মের শত্রু, এ আজকের কথা নয়—বহুযুগ পূর্ব থেকেই এই শত্রুতা হয়ে আসছে। তুমি দেখো চিন্তা করে, ঐ ধর্মে স্বর্গ নরক নেই, যাগ যজ্ঞ নেই, বলিউপচার নেই, ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ নেই, একেবারেই তৃণমূলে যে অন্ত্যজ থাকে, যারা যথার্থই তৃণভোজী—এ হলো তাদের ধর্ম। এদের প্রধান দেবতা শূকর পালকের গৃহে খাদ্যগ্রহণ করেছে, তুমি চিন্তা করতে পারো? তুমি আমাদের আর্য ধর্মের কথা ভাবো, এ ধর্ম উচ্চশ্রেণীর। আর্যত্বের অর্থ হলো শ্রেষ্ঠত্ব—এর কৌলীন্য ভিন্ন প্রকার—এর দানধ্যান আছে, উৎসব আছে, মেধযজ্ঞ আছে, স্বর্গ-নরক আছে, এ ধর্ম কর্মফলে বিশ্বাস করে এবং মনে করে না যে, সকল মানুষ সমান হতে পারে। সুতরাং মূলেই রয়েছে বিরোধ। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় বৌদ্ধশক্তি বিনষ্ট করা গেছে—আজ আর কোথাও বৌদ্ধশক্তি বলতে কিছু নেই। কিন্তু আজ যদি তুমি তাদের প্রশ্রয় দাও, তাদের সঙ্গে মিত্রতা করো, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছো? চণ্ডাল হড়ডি ক্ষেত্রকর ইত্যাদি সকল ব্রাত্যজন হয়ে উঠবে স্বেচ্ছাচারী, তোমার দাসদাসী বলে কেউ থাকবে না, সামন্তপতিদের ধনৈশ্বর্য গৃহ সংসার সমস্তই লুণ্ঠিত হয়ে যাবে। কোট্টপাল নেই, মন্ত্রী নেই, সেনাপতি নেই, সামন্ত নেই, প্রহরী নেই, কী ভয়ানক অবস্থা হবে, কল্পনা করতে পারো?

দীর্ঘ বক্তৃতা প্রায়। সোমজিৎ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শেষে বললেন, তোমার সঙ্গে তর্কে নামার ইচ্ছা আমার নেই। বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের সঙ্গে মিত্রতা করলে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে—এ আমার বিশ্বাস হয় না হলায়ুধ। এদেশে বৌদ্ধ ও সনাতন উভয় ধর্মের সহাবস্থান ছিলো—সে তো মাত্রই শতাব্দ দুই পূর্বের ঘটনা। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু কই, তাঁদের কালে তো ব্রাহ্মণ নিগ্রহের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। বরং সকল ধর্মের লোক সহাবস্থান করতো। সনাতনধর্মী ব্রাহ্মণ যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো সদ্ধর্মী ভিক্ষুও।

শুনতে শুনতে হলায়ুধ মিশ্র বিস্ময় মানেন, এ কী কথা সোমজিতের মুখে? এই বয়সে এসে কি লোকটার চিন্তায় বিকৃতি দেখা দিয়েছে? বিরক্তি বোধ করলেন তিনি। বললেন, সোমজিৎ, এসব বিতর্ক কেন তুলছো? আমি বুঝতে পারছি না, এসব শুধুই তর্ক, না এসব কথা তোমার মনের। আজ যদি তুমি বলো, তখনও ব্রাহ্মণ ছিলো, ধর্ম ছিলো, তাহলে তো তোমার সঙ্গে তর্কই বৃথা। যদি তখন এদেশে ব্রাহ্মণই ছিলো, তাহলে

সনাতনধর্মীদের দীক্ষাদানের জন্য তোমার আমার পূর্বপুরুষদের এদেশে কেন আনা হয়েছিলো? আজ নিজের অতীতকেই বিস্মৃত হতে চাও, এই তোমার ধর্মরক্ষা! ধিক তোমার পাণ্ডিত্যে!

সোমজিৎ আহত হলেন। বুঝলেন, হলায়ুধ তাঁর কথা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন, কোনো সাহায্যই তিনি করবেন না। তবু শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন, রুষ্ট হয়ো না হলায়ুধ, আমি তোমার সুহৃদ, তোমার কাছে যদি অন্তরের কথা প্রকাশ না করি, তাহলে কার কাছে করবো? আমার মনে হয়, ধর্ম জাতি উভয়ই এখন সংকটাপন্ন। যদি বিহিত না করা হয়, তাহলে সমস্তই ধ্বংস হবে। এতোকাল যা করা হয়েছে তা ভুল। তাতে বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘৃণা, সন্দেহ ও প্রতিহিংসার ভাব লালিত হয়ে এমন আকার ধারণ করেছে যে এখন পরস্পর প্রত্যেকেই শত্রু। এ না করে আমরা যদি প্রীতির কথা বলি, সহাবস্থানের কথা বলি, মিলনের কথা বলি—তাহলেই তো ঘৃণা দূর হয়, সন্দেহ যায় ও প্রতিহিংসার অবকাশ থাকে না। চিন্তা করে দেখো তুমি। বস্তুকণা বিচ্ছিন্ন হলে তার একরূপ আর ঐ বস্তুকণাই ঘনসংবদ্ধ হলে তার অন্যরূপ। আজ যদি এমন হয় যে, যবনাক্রমণের বিরুদ্ধে রাজার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জও প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে, তাহলে এই যবনদের আক্রমণ আর কয়দিন? তুমি মহামন্ত্রী, আমার কথাটি বিবেচনা করে দেখো। অন্তত রাজসভায় আমার প্রস্তাবটি দিয়ে দেখো।

হলায়ুধ মিশ্র উঠলেন। অহেতুক অনেক বিলম্ব হয়েছে। এই প্রকার প্রলাপ শুনতে হবে, তিনি কল্পনাও করেননি। তবু বললেন, বন্ধু সোমজিৎ, রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তুমি অহেতুক মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করছো, ওতে কোনো ফল হবে না। আর জেনো, ব্যক্তির ইচ্ছায় কিছুই হয় না—সমস্তই হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। আর এও জেনো, কর্মফল থাকবেই—দাসও থাকবে, প্রভুও থাকবে। প্রভু যে শাসন করে, সে যেমন কর্মফল, দাস যে শাসিত হয়, সেও তেমনি কর্মফল। যবনদের আগমনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই বা কী করবে—যা ভবিতব্য তাই হবে। এও কর্মফল বলতে পারো। আমার বিশ্বাস, যবনদের আগমনে ধর্ম বলো, জাতি বলো, সমাজ বলো, কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা যদি এদেশ জয় করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের এদেশ শাসন করতে হবে। সামন্ত বলো, মন্ত্রী বলো, সেনাপতি বলো, এমনকি গ্রামপতি বীথিপতি বলো—এদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কি রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব? সুতরাং অহেতুক তোমার দুশ্চিন্তা। যবনরা যদি আসে, তখনও দেখবে তাদের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সদ্ভাব করছে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে। নীচ যে, সে সর্ব অবস্থায় নীচই থাকবে।

সোমজিৎ উঠলেন। হলায়ুধ মিশ্রের কথা শুনে ক্ষীণ হাসি ফুটলো তাঁর মুখে। বললেন, মনে হচ্ছে যবনদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য রাজধানীর লোকেরা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে?

হলায়ুধ স্থির করেছেন পুরাতন বন্ধুর উপর কুপিত হবেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, বিদ্রূপ ক'রো না সোমজিৎ। যবনেরা কীরূপ শক্তি ধরে তা কি জানো? দৈহিক, শাস্ত্রিক,

আধ্যাত্মিক সকল বলেই তারা অধিকতর পারঙ্গম। একটি যবন সাধুপুরুষকে দেখলাম, একটি মৃত বালককে মন্ত্রবলে জীবিত করে দিলো। তুমি কল্পনা করতে পারো, তিনটি বন্য ব্যাঘ্র নিমেষে বশীভূত হয়ে গেলো ঐ সাধুপুরুষটির সামান্য একটি ইঙ্গিতে। এদিকে রাজ-জ্যোতিষীরা গণনা করে যা দেখেছেন, তাতে মঙ্গল কিছুই দেখা যাচ্ছে না মহারাজের জন্য। এমতাবস্থায় যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস, ওতেই কাজ হবে।

সোমজিৎ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হলায়ুধের কথা শুনছিলেন। তাঁর বিশ্বাস হতে চাইছিলো না যে ঐ প্রকার কথা বলতে পারে হলায়ুধ মিশ্রের মতো লোক। তিনি ভেবেছিলেন, জিজ্ঞাসা করবেন, ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হয়েছে কি না—আর সেই আখ্যান গ্রন্থখানির কি হলো, যেখানি তিনি গত বৎসর আরম্ভ করেছিলেন। আরও জানার ইচ্ছা ছিলো, বল্লাল রচিত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থখানি মহারাজ সমাপ্ত করছেন বলে তিনি শুনেছিলেন, গ্রন্থখানির রচনা কি সমাপ্ত হয়েছে? কিন্তু হলায়ুধের কথা শুনে ঐ সকল প্রসঙ্গ আর তুললেন না। তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। তাঁর তখন মনে হচ্ছে, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেন দেবের মহামন্ত্রীর কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কী ঘটবে, তা যেন সমস্তই জানা হয়ে গেছে সবার—এবং সেই সঙ্গে কার কি করণীয় তা-ও যেন স্থির করে রেখেছে প্রত্যেকে।

সোমজিৎ ক্লান্তপদে চতুষ্পাঠী থেকে নিক্রান্ত হলেন। কেশবাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, পিতঃ আপনি পদব্রজে যাবেন?

তিনি কিছুই বললেন না জামাতার প্রশ্নের উত্তরে।

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। রাজপথে এখন বহু লোক। বিপণীগুলিতে তৈলদীপ জ্বালানো হচ্ছে। দূরে কোনো এক মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শোনা গেলো। সোমজিৎ ক্লান্ত পদক্ষেপে ধীরগতিতে পথক্রমণ করছিলেন। একটি ভবনের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন ভবনটির সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি জনসমাবেশ। একটি লোককে পরিচিত মনে হলো। মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছেন। লোকটি নিকটে এসে প্রণাম করলে চিনলেন—সামন্ত হরিসেনের অনুচর উল্লাসদত্ত। বললেন, তুমি এখানে?

হ্যাঁ মহাশয়, উল্লাস জানায়, আমাদের প্রভু রাজধানীতে এসেছেন।

সোমজিৎ দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত ক'রে বলেন, তিনি কোথায়?

লোকটি ইতস্তত করে ক্ষণেক। শেষে বলে, উনি ঐ ভবনে এসেছেন। আপনি কি সাক্ষাৎ করবেন?

কে থাকে ওখানে, কার ভবন ওটি?

লোকটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, আপনার যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে বলুন।

সোমজিৎ বুঝলেন, হরিসেন কোথায় এসেছে সেই সংবাদটি তাঁর অনুচর গোপন রাখতে চায়। বললেন, সংবাদ গোপন রেখে কি হবে, আমি মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তোমার প্রভুকে বলে দিও, তাঁর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, তিনি যা করছেন, তা-ই এখন করণীয় সকলের।

লোকটি প্রায় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখে সোমজিৎকে। তারপর জানায়, না মহাশয়, আপনি যা ভাবছেন তা নয়—ঐ ভবনে কোনো রাজপুরুষ থাকেন না, ওটি নগর নটিনী বিদ্যুৎপ্রভার ভবন। আপনি কি অভ্যন্তরে যাবেন?

সোমজিৎ কী বলবেন ভেবে পান না। লোকটির কি হ্রস্ব দীর্ঘ কোনো জ্ঞানই নেই? বললেন, না বৎস, আমি বৃদ্ধ লোক, দেখতেই পাচ্ছো—

তাতে কি? লোকটি সলজ্জ হাসি হেসে জানায়, এখানে বহু বৃদ্ধ রাজপুরুষ আসেন। বিদ্যুৎপ্রভার নৃত্য দেখলে জীবনে ভুলতে পারবেন না।

সোমজিৎ আর বাক্য ব্যয় করলেন না। না, আর কিছু জানবার বা বুঝবার নেই। লোকমুখে এবং জনরবে যা শুনেছিলেন, সবই সত্য। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, ব্যস্ত আনন্দ আর ব্যসনে। রাজকর্ম কী, প্রজাপালন কী, যুদ্ধবিগ্রহ কী,—এ সকল বিষয়ে কারও কোনো চিন্তা নেই। উত্তম লক্ষ্মণাবতী, তিনি মনে মনে বললেন, উত্তম রাজ চক্রবর্তী পরম ভট্টারক ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলতিলক মহারাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণ সেন দেব, সমস্তই উত্তম, কারোই কিছু করণীয় নেই—না তোমার, না তোমার অনুচরদের। ভবিতব্য তোমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা-ই ঘটবে, বৃথাই আমরা চিন্তা করে মরি।

সন্ধ্যার পর রাত্রির প্রথম প্রহরে বসন্তদাস মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ায়। অধিকক্ষণ দাঁড়াতে হয় না—একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে পশ্চাতে এসে বলে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মন্দিরের পার্শ্বে সংকীর্ণ পথ। সেই পথ দিয়ে যেতে হয় মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে। দেখা যায়, মন্দিরের পশ্চাতেও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেখানেও একটি ক্ষুদ্র কুসুমিত উদ্যান—এবং ঐ উদ্যান সংলগ্ন পাশাপাশি কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে ঘৃতদীপ জ্বলছিলো। কক্ষটির দ্বার উন্মুক্ত করে লোকটি বললো, ভিতরে যান, ছায়াবতীর আসতে বিলম্ব হবে, আপনি এখানেই বিশ্রাম নিন।

লোকটি অন্য কেউ নয়, দীপের আলোয় দেখা গেলো, সে অংশুমান। প্রকোষ্ঠের চারিদিক দৃষ্টিপাত করে নিলো বসন্তদাস। প্রকোষ্ঠটি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর। দেওয়ালগাত্রে দীপস্থান, শয়নবেদীটি সামান্য নীচু, এক কোণে একখানি কাষ্ঠাসন, তাতে একখানি অজিন পাতা। দেখে মনে হয়, এ প্রকোষ্ঠে সম্মানিত ব্যক্তিরাই অবস্থান করেন। অংশুমান বললো, রাত্রে আপনি এখানেই আহার করবেন, ছায়াবতীর অনুরোধ।

অংশুমান ঐ কথাটি জানিয়ে প্রস্থান করে। বসন্তদাসের অদ্ভুত লাগছিলো সমস্ত ব্যাপারটি। আজই পরিচয় এবং ঐ স্বল্প পরিচয়েই ছায়াবতী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মন্দিরে রাত্রিযাপনের জন্য। সে কিছুই অনুমান করতে পারে না। সত্যই কি কোনো সংবাদ দিতে পারবে ছায়াবতী? নাকি শুধুই রাত্রিযাপনের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ? তার জীবনে যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে, ঈশ্বর জানেন।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয় দেখতে দেখতে। এক সময় অংশুমান ফলাহারাদি সম্মুখে এনে রাখে। বলে, আপনি আহার করে বিশ্রাম নিন। ছায়াবতী সম্ভবত প্রত্যূষে আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

এ যে অতিথিকে আমন্ত্রণ করে এনে তার মুখের উপর সশব্দে দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা! হাসি পায় বসন্তদাসের। ছায়াবতীর সম্ভবত এটি এক প্রকারের রসিকতা। পুরুষকে চঞ্চল করে কৌতুক উপভোগ করার যে একটি সহজাত প্রবণতা ছলনাময়ী নারীর থাকে, সম্ভবত সেই প্রবণতার বশেই ছায়াবতী তাকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছে এবং অন্তরাল থেকে দারুণ কৌতুক উপভোগ করছে। উত্তম কথা ছায়াবতী, সে মনে মনে বলে, তোমার ক্রীড়নক হতে আমার আপত্তি নেই, দেখি, তোমার কতক্ষণ এবং কতো প্রকারে ক্রীড়ামত্তা থাকতে পারে। সে ঘৃতদীপটি ফুৎকারে নির্বাপিত ক'রে শয্যায় দেহ স্থাপন করে।

কিন্তু নিদ্রা আসে না। আজ সে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে সন্ধান করে এসেছে। প্রকাশ্যে তো কিছুই বলা যায় না। পান্থশালায়, নয়তো মন্দিরপ্রাঙ্গণে অথবা বটবৃক্ষতলে অপেক্ষা করতে হয়। যদি কোনো মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, তখন সন্তর্পণে তার কাছে প্রশ্নটি করতে হয়। তবে একটি বিষয়ে সে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছে—আর তা হলো এই যে, পূর্বতীরে যোগীদের দু'একজনকে যদি বা দেখা গেছে—ভিক্ষু একজনকেও নয়। ভিক্ষুদের উপর কোনো রাজকীয় নির্দেশ আছে কি না কে জানে। যদি ফল্গুগ্রাম অথবা বালিগ্রামের মতো অবস্থা এখানেও হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে চিন্তার কথা। চিন্তা নিজের জন্য নয়। চিন্তা ছায়াবতী এবং অংশুমানের জন্য।

শুনে এসেছে, বিল্বগ্রামের সামন্তপতি সুধীমিত্র পরম বৈষ্ণব এমন একটি আকাশচুম্বী বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছেন, যে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন। তিনি প্রজাবৎসল, সনাতন ধর্মীরা এতো সুখে জীবনযাপন করে যে ধর্মদ্বেষী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখলেই তাদের দূর দূর শব্দে বিতাড়ন করে।

হঠাৎ মনে হয়, বাহিরে কার যেন পদশব্দ। সে উৎকর্ণ হয়। এ কি সেই বালিগ্রামে অবলোকিতেশ্বর মন্দিরের মতো অবস্থা হলো না কি? হঠাৎ যদি এখন সেইরূপ কোনো গ্রন্থিছেদকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

না, পদশব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। বোধ হয় আদৌ পদশব্দই নয়। রাত্রির কোনো মার্জার সম্ভবত অলিন্দে পতিত হয়েছিলো।

আবার শব্দ হয়। এবার রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাত। অগত্যা বসন্তদাসকে উঠতে হলো। দ্বার উন্মোচন করবে কি না দু'মুহূর্ত চিন্তা করলো। শেষে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, বাহিরে কে?

মহাশয় কি নিদ্রিত? নারীকণ্ঠের মৃদু ডাক। প্রথমে সে উত্তর দিলো না। দ্বিতীয়বার যখন ডাকটি পুনরায় শোনা গেলো, তখন সে জানতে চাইলো, কে আপনি?

আমি ছায়াবতী, দ্বার খুলুন।

বসন্তদাস দ্বার উন্মোচন করলে ছায়াবতী কক্ষে প্রবেশ করে। অন্ধকারে বার দুই দু'জনের শরীর স্পৃষ্ট হয়। কিন্তু বসন্তদাস সংযম ত্যাগ করে না। ছায়াবতীকে মনে হয় পরিশ্রান্ত, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলো সে। বসন্তদাস বললো, আমি দীপ জ্বালি, আপনি বসুন।

কেন দীপ জ্বালাবার কি প্রয়োজন? কথা তো অন্ধকারেই হতে পারে।

বসন্তদাস আমূল কম্পিত হয়। সত্যই কি এই নারী তার প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়েছে? সে বললো, ভদ্রে অন্ধকারে তো কিছুই বোধগম্য হয় না, যার সঙ্গে কথা বলছি, তার মুখ না দেখলে কি নিশ্চিন্তে কথা বলা যায়, বলুন?

ছায়াবতী হাসে মৃদু। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু শোনা যায় হাসিটি। বলে, দীপ জ্বালবেন না—বরং দ্বার মুক্ত করুন, বাহিরে চন্দ্রালোক আছে, তাতে কাজ হবে।

দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করতেই বাহিরের চন্দ্রালোক ভিতরে প্রবেশ করে। কৃষ্ণপক্ষের ভগ্নচন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্না। কিন্তু তাতেও ছায়াবতীকে দেখা যায়। তার দেহে বাসকসজ্জার বেশ। সে মনে মনে প্রমাদ গণনা করে। বলে, বসন্তদাস, তোমার ললাটলিপি খণ্ডাবে কেমন করে?

শয্যায় আসন নিয়েছিলো ছায়াবতী। সে ডাকলো, এখানে এসো, পাশে বসো—আর অনুগ্রহ করে গ্রাম্য ষণ্ডের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার ক'রো না, মৃদু স্বরে কথা বলো।

বসন্তদাসের ইতস্তত বোধ হচ্ছিলো। ছায়াবতী তার ইতস্তত ভাব দেখে তিরস্কার করে। বলে, তুমি যে দেখছি অনভ্যস্ত বালকের মতো আড়ষ্ট হয়ে রইলে। ভয় পেয়ো না হে সাধুপুরুষ, তোমার সংযমের প্রাচীর ভঙ্গ করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই—আমি এমনিতেই বড় ক্লান্ত—আর এ বাসকসজ্জাও তোমার জন্য নয়। এটি ইতোমধ্যেই উচ্ছিষ্ট হয়ে রয়েছে। তুমি অতিথি, দেবতাতুল্য, উচ্ছিষ্ট দিয়ে তোমার পূজা করবো, এ কি হয়?

শোনো, বসন্তদাস পার্শ্বে উপবেশন করলে ছায়াবতী পুনরায় বলতে আরম্ভ করে, সংবাদ পেয়েছি, তোমার আত্মীয়রা সুনন্দগ্রামে অবস্থান করছেন। বৃদ্ধ শুকদেব, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা এবং অপর একজন প্রৌঢ় একত্রে আছেন। আশ্রয়দাতা এক ক্ষেত্রকর গৃহস্থ। প্রত্যেকেই সুস্থ। চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওদিকে উজুবটের অবস্থা এখন শান্ত, হরিসেন এখন রাজধানীতে। তবে মনে ক'রো না যে তুমি নিরাপদ। তোমার নাম গূঢ় পুরুষেরা জানে। তোমাকে যদি পায়, তাহলে অবশ্যই বন্দী করবে। তোমার ঐ স্থানে গমন নিষিদ্ধ।

বিস্ময়ে বসন্তদাসের বিমূঢ়াবস্থা হয়—এ নারী কি দৈবজ্ঞ নাকি। এতো সংবাদ সে কীভাবে সংগ্রহ করলো? একেবারে মায়াবতীর পিতার নাম পর্যন্ত বলে দিচ্ছে। সে বললো, ভদ্রে, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো জানি না—আপনি আমাকে স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত করলেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ভগবান ইতোমধ্যে আমার প্রচুর মঙ্গল করেছেন, ছায়াবতী হাসে। বলে, এতো মঙ্গল করেছেন যে তা রাখবার মতো আমার স্থান নেই—এখন তুমি আমাকে কিছু সংবাদ দাও দেখি, বলো, যবনেরা কি সত্য সত্যই গ্রাম লুণ্ঠন করছে?

কেন, আপনি কি যবনদের ত্রাতা এবং দয়ালু জ্ঞান করেন?

না, তা নয়, ছায়াবতী বলে, আক্রমণকারী বহিরাগত সৈন্যদলের আচরণ সর্বত্রই এবং সর্বদাই একরূপ হওয়ার কথা, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি বলেই আমার ধারণা। কিন্তু কেউ কেউ যে বলছিলেন, যবন জাতি এলে প্রকৃতিপুঞ্জ রক্ষা পাবে, সামন্তপতিদের অত্যাচার দূর হবে, রাজানুচরদের প্রতাপ দমিত থাকবে—সেই জন্যই কিঞ্চিৎ আশা হচ্ছিলো, হয়তো বা এই যবন জাতির আচরণ অন্যরূপ হবে—এখন দেখছি, আমার পূর্বধারণাই সত্য, আমি যাই।

ছায়াবতী উঠে দাঁড়ালে বসন্তদাস বললো, আমার একটি কৌতূহল আছে।

বলো।

আপনি কেন এই গোপনতা অবলম্বন করেছেন—প্রকাশ্যে কি এসব কথা বলা যেতো না?

না হে নাগর, তা বলা যেতো না, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসিতে বেপথু হয় ছায়াবতী। বলে, প্রণয় ভাষণ কি প্রকাশ্যে সম্ভব? না তাতে আনন্দ আছে? আমি যে তোমার প্রণয় প্রার্থিনী হে, তা কি বোঝোনি?

হাসির উচ্ছ্বাস দমন করে যখন স্বাভাবিক হলো ছায়াবতী তখন সে আবার অন্য রমণী। বললো, বসন্তদাস, একটা কাজ করে দেবে?

বলুন, কী কাজ?

পুন্ড্রনগরীর একটি সংবাদ চাই। নিরঞ্জন আমার ভ্রাতা, বাল্যকাল থেকে নিরুদ্দেশ—শুনেছি, সে সদ্ধর্মীদের সঙ্গে থাকে এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে, যদি পারো, সংবাদটি আমাকে এনে দিও।

ছায়াবতীর কথা শুনে বসন্তদাসের মনে একইসঙ্গে নানান প্রশ্নের উদয় হয়। মন্দিরদাসীরও তাহলে ভ্রাতা থাকে, এবং সেই ভ্রাতার জন্য আবার উৎকণ্ঠাও থাকে? এমন তো কখনও শোনেনি সে। উপরন্তু সংবাদ সংগ্রহের জন্য সে কি উপযুক্ত ব্যক্তি?

বললো, আপনি নিজেই তো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন—আপনার মতো কি আমি পারবো?

ছায়াবতী নীরব থাকে কয়েকমুহূর্ত। তারপর বলে, তার সংবাদ তো আমি পেয়েছি—কিন্তু সে আমার সংবাদ পাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।

বসন্তদাস স্বীকৃতি দান করে। বলে, যদি আমি তার সাক্ষাৎ পাই, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে আপনার কথা বলবো।

ছায়াবতী আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর বলে, আমি যাই এবার, রাত্রি হয়েছে।

আর হ্যাঁ, শোনো, ছায়াবতী পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, কাল প্রভাতে যখন পূজারম্ভে লোকসমাগম হবে, তখন মন্দির ত্যাগ ক'রো, পূর্বে বা পরে নয়। আমার দুই প্রেমিক প্রায় সর্বক্ষণই মন্দিরের উপর দৃষ্টি রাখে।

ছায়াবতী অন্ধকারে ছায়ার মতোই অদৃশ্য হলো। বসন্তদাস দ্বারের বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার অবাক লাগছিল, অদ্ভুত রহস্যময়ী এই নারী। কেন যে অমন কৌতুক করে, বোধগম্য হয় না। তবে অস্পষ্ট অনুমান হয়, তার জীবনে কোথাও একটি গভীর বেদনা রয়েছে। সে যখন হাসে, তখন মনে হয়, সে হাসি কান্নারও অধিক। আর কি মমতাময়ী! বসন্তদাস তার কেউ নয়, অথচ তার নিরাপত্তার জন্য কতই না চিন্তিত। সে ছায়াবতীর উদ্দেশে মনে মনে প্রণতি জানালো।

কৃষ্ণার কথা মনে পড়লো ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেও এক মন্দিরদাসী, মাত্র এক রজনীর জন্য এসেছিলো তার জীবনে। কিন্তু ঐ একটি রজনী দুরপনেয়ভাবে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে তার স্মৃতিতে। কৃষ্ণার সঙ্গে কি আর কোনোদিন দেখা হবে না? তাকে কি প্রাণ দিতে হয়েছে শেষাবধি? সে জানে না, প্রকৃত সংবাদ কেউ দিতে পারেনি। মিত্রানন্দকে সে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে—যেদিন শেষ সাক্ষাৎ হলো উজুবটে, সেদিনও। কিন্তু না, মিত্রানন্দ কোনো সংবাদই জানে না।

সে আর এক কাহিনী—যে কাহিনী তাকে মিত্রানন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, যে কাহিনীর মধ্য দিয়ে, বলা যায়, তার জন্মান্তর হয়েছে। সে নিজেকে প্রশ্ন করে, বসন্তদাস, তুমি কি এমন ছিলে?

দেবীকোট মেলায় যখন বৃদ্ধটিকে সমাধিস্থ ক'রে বসন্তদাস যে স্বর্ণ ও মণিখণ্ডগুলি পায়, সেগুলি ক্রমে তার কাছে হয়ে ওঠে দুর্ভার। সে জানতো, ঐ সকল মণিমাণিক্য যদি বিক্রয় করতে হয়, তাহলে পুণ্ড্রনগরীতে যেতে হবে। সেই চিন্তাক্রমে সে যাত্রাও করেছিলো পুণ্ড্রনগরী অভিমুখে। সেই সঙ্গে আবার পথিমধ্যে ধনী বণিকের সন্ধানেও

ছিলো তৎপর। তবে সমস্তই সাবধানে। নিজের কাছে যে মূল্যবান কিছু আছে, তা সে কখনই প্রকাশ হতে দেয়নি।

পথিমধ্যেই সাক্ষাৎ হয় এক বৃদ্ধ সুবর্ণবণিকের সঙ্গে। বণিকটি বৃদ্ধ এবং সজ্জন। তিনি বসন্তদাসকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। সেখানে বসন্তদাস একটি হীরকখণ্ড বৃদ্ধকে দেখায়। জানতে চায়, এর প্রকৃত মূল্য কত হতে পারে, বলবেন?

বৃদ্ধ প্রথমত বিমূঢ় হয়ে যান। পরে হীরকখণ্ডটি হাতে নিয়ে মনোযোগসহকারে পরীক্ষা ক'রে বলেন, মহাশয় যদি বিক্রয় করতে চান, তাহলে আমি দুইটি পর্যন্ত দীনার দিতে পারি।

ঐ কথা শুনে বসন্তদাস প্রমাদ গণনা করে। কী কাণ্ড দেখো, যেটি ক্ষুদ্রতম, তারই মূল্য দুই দীনার! এখন তার নিকট মণিমাণিক্য আছে, এই সংবাদটি প্রচারিত হলেই হয়েছে। আর দেখতে হবে না, দস্যুহস্তে মৃত্যু একেবারে অবধারিত। সে জানায়, মহাশয়, এই মণিটি আমি আপনার কাছে বিক্রয় করছি—কিন্তু এই ক্রয়-বিক্রয়ের কথাটি আপনাকে গোপন রাখতে হবে, আমি এইরূপ আরও কয়েকটি মণি আপনার কাছে বিক্রয়ের আশা রাখি।

বয়সে বৃদ্ধ হলেও বণিকটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মণিমাণিক্যাদি যেমন চেনেন, তেমনি চেনেন মানুষকেও। বসন্তদাসকে বললেন, মহাশয়, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনাকে আমি যে মূল্য দিয়েছি সেটি প্রচার করলে বিপদ কি শুধু আপনার? আমার নয়? আপনি নিশ্চিন্তে অন্য হীরকগুলি নিয়ে আসবেন—সমস্তই আমি ক্রয় করবো।

বসন্তদাসের একেকবার লোভ হচ্ছিলো হীরকগুলি বাহির করে। কিন্তু আবার ভয়ও হচ্ছিলো। সে নিজেকে সংযত রাখলো। এবং জানতে চাইলো, মহাশয়, যদি এমন হয় যে পুণ্ড্রনগরীর বণিকেরা অধিক মূল্য দিতে চাইলো, তখন কি হবে?

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, মহাশয়ের বোধ হয় সন্দেহ হচ্ছে যে কম মূল্য পেয়েছেন। কিন্তু বৃদ্ধের একটি কথা মনে রাখবেন, ভুলেও যেন মণিমাণিক্যাদি নিয়ে পুণ্ড্রনগরীর বণিকদের কাছে যাবেন না। গেলে সর্বনাশ হবে, তারা দস্যু লুণ্ঠকদের পোষকতা করে। আপনি আমার কাছে না আসুন, অন্যত্র যান, কিন্তু কখনই ঐ পুণ্ড্রনগরীর বণিকদের কাছে যাবেন না। প্রকৃত ধনী বণিকেরা কি এখন আর প্রকাশ্যে বণিকবৃত্তি করতে পারে? দেখছেন না, স্বর্ণ বণিকেরা কীভাবে রাজপুরুষদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। এখন প্রকৃত বণিক নেই—যারা আছে, তারা প্রতারক, নয়তো লুণ্ঠক।

বৃদ্ধের কথা যে অমূলক নয় তা বসন্তদাস অপেক্ষা অধিক আর কে জানে। সে কৌতূহলী হলো। বললো, আমি না হয় বণিকদের কাছে গেলাম না, কিন্তু আপনি ঐ মণিমাণিক্যাদি নিয়ে কি করবেন? নিশ্চয়ই আপনাকে বিক্রয় করতে হবে।

বৃদ্ধ ঐ কথা প্রসঙ্গেই সেদিন ফল্গুগ্রামের সামন্তপতি শ্রীনাথবর্মণের সংবাদ জানান। দশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে গেলে ফল্গুগ্রামে উপনীত হওয়া যাবে। ঐ ফল্গুগ্রামের সামন্তপতি শ্রীনাথবর্মণ বিলাসী, ব্যসনপ্রিয় এবং ধনী। মণিমাণিক্য সংগ্রহের উৎসাহ তাঁর প্রবল।

নামের সঙ্গে 'গ্রাম' শব্দটি যুক্ত থাকলে কি হবে, ফল্গুগ্রাম সমৃদ্ধ জনপদ। এই জনপদে ক্ষুদ্র একটি জয়স্কন্ধাবার বর্তমান। নিকটবর্তী সমৃদ্ধতর জনপদ বালিগ্রাম, সে স্থানের জয়স্কন্ধাবারটি বৃহত্তর। বসন্তদাস ফল্গুগ্রামে উপনীত হয়ে নিজের বণিক পরিচয়টিই প্রচারিত করে।

শ্রীনাথবর্মণের সম্মুখীন হয়ে বসন্তদাস প্রণাম জানিয়ে বলে, মহারাজ, আমি দূর দেশ থেকে এসেছি, আপনার খ্যাতি ও মহিমা বহুদূর বিস্তৃত—তদুপরি আপনার সৌন্দর্য বোধ ও সুরুচির পরিচয় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত—আমি সেই কারণেই সামান্য কিছু সামগ্রী নিয়ে এসেছি—আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলে আমি নিজের বণিকজীবন সার্থক মনে করবো।

শ্রীনাথবর্মণ প্রথমে বস্ত্র দু'খানি দেখলেন। দেখে বললেন, তুমি দেখছি প্রকৃতই রুচিবান লোক হে, বস্ত্র দু'খানি তুমি আমাকে দিতে পারো।

গন্ধাসবের আধার দু'টি শ্রীনাথবর্মণের হাতে দেওয়া হলে তিনি একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেন। বলেন, অহো! কী সুগন্ধ! পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ কি এই প্রকার হয়? তুমি যে আমাকে অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখালে হে!

অতঃপর একটি হীরকখণ্ড তাঁর সম্মুখে রাখলো বসন্তদাস। হীরকখণ্ডটি অত্যধিক দ্যুতিময়। নিজ হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন সামন্তপতি। মনে হলো, চিন্তা করলেন কিছু। তারপর জানতে চাইলেন, আর কি আছে তোমার দেখি?

প্রভু যা দেখছেন, এই-ই আমার সম্বল, অধিক কোথায় পাবো—ক্ষুদ্র বণিক আমি—এসব পণ্যের কিরূপ মূল্য তা তো আপনার অবিদিত নয়।

হুঁ, শ্রীনাথবর্মণ অর্ধশায়িত অবস্থা থেকে দেহটিকে সামান্য তুললেন। বললেন, বাকপটুতাতে দেখছি কম যাও না। কিন্তু ঐ বাকপটুতা অন্যত্র প্রদর্শন ক'রো—এখন যা আছে, বাহির করো, আমি দেখবো।

বসন্তদাসের ইতস্তত ভাব দেখে শ্রীনাথবর্মণ দু'জন প্রহরীকে ডাকলেন। আদেশ করলেন, দেখো তো এই দুর্বিনীত লোকটার কাছে আর কি কি আছে?

ঘোর বিপদ সম্মুখে। বসন্তদাস আর বাক্যব্যয় না করে কটিবন্ধের স্থলীটি উন্মোচিত করে সমুদয় দ্রব্যাদি ভূমিতে সামন্তপতির পদপ্রান্তে রাখলো।

শ্রীনাথবর্মণ কিছু বললেন না। প্রথমে হীরক খণ্ডগুলি হাতে তুলে নিলেন। তারপর এক দুই করে স্বর্ণখণ্ডগুলি গণনা শেষ হলে বললেন, নিলাম হে বণিক, সমস্তই নিলাম।

ঐ কথা ব'লে আসন থেকে উঠে তিনি অন্তঃপুরের দিকে পদক্ষেপণ করলেন। বসন্তদাসের মনে হলো, তার যথাসর্বস্ব চলে যাচ্ছে। সে কাতর কণ্ঠে বললো, প্রভু মূল্য কখন পাবো?

অ, মূল্য—না? শ্রীনাথবর্মণ ফিরলেন। পুনরায় আসনে উপবেশন করে বললেন, নাম কি?

আজ্ঞে বসন্ত।

ফল্গুগ্রাম থেকে বালিগ্রামের দূরত্ব অধিক নয়—দুই প্রহরের পথ। বালিগ্রাম সমৃদ্ধতর জনপদ—এ স্থানের জয়স্কন্ধাবারটি বৃহত্তর। এটি নির্মিত হয়েছিলো বৈরী সমতট এবং কামরূপের উপর গৌড়াধিপের দৃষ্টি রাখার জন্য। এখন বৈরী কেউ-ই নয়, সুতরাং সেনাবাহিনীর তৎপরতাও সেরূপ নয়। তারা নগরে ভ্রমণ করে এবং আনন্দস্ফূর্তিতে কালযাপন করে। পথিপার্শ্বের বিপণীগুলিতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত ক্রয়-বিক্রয় চলে। ভগবান বিষ্ণুর বিরাটাকার মন্দিরটিতে লোকজনের গমনাগমনের বিরতি নেই। শৌণ্ডিকালয়গুলিতে মাদকপায়ীদের সোল্লাস চিৎকার প্রায় সর্বক্ষণই শোনা যায়। অর্থাৎ জনপদটি যথার্থই সজীব এবং প্রাণময়।

বসন্তদাস মহাসামন্ত শক্তিবর্মণের প্রাসাদে প্রবেশের কোনো ব্যবস্থাই করতে পারে না। প্রতিদিন প্রাসাদদ্বারে যায়, প্রহরীদের অনুনয় বিনয় করে এবং ব্যর্থ হয়। প্রতিদিনই এই ঘটনাক্রমে দ্বাররক্ষীরা বিরক্ত হয়ে উঠলো। একদা এক প্রৌঢ় রক্ষী কাছে ডেকে নিয়ে বললো, বৎস, তুমি অহেতুক নিজের বিপদ সৃষ্টি করছো, মহাসামন্তের গূঢ়পুরুষেরা তোমার আচরণে সন্দেহান্বিত হয়ে উঠেছে। আমি বলি কি, তুমি মঙ্গলমতে বিদায় হও, যদি একবার তাদের হাতে বন্দী হও, তাহলে কিন্তু তারা পিতৃনাম বিস্মরণ করিয়ে তবে ছাড়বে।

কিন্তু বসন্তদাসের সংকল্প টলে না। বলে, মহাশয়, তবে কি সুবিচার পাবো না? এদেশে আমাকে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে?

লোকটি বিরক্ত হয়ে চলে যায়। বলে, তোমার মঙ্গলের জন্যই সৎ পরামর্শ দিলাম, এখন তোমার অভিরুচি—যা উত্তম বিবেচনা মনে হয়, তাই করো।

সে রাত্রিযাপন করতো একটি প্রাচীন মন্দিরের অতিথিশালায়। মন্দিরটি পরিত্যক্ত-প্রায়। অবলোকিতেশ্বরের বিগ্রহটি অবশ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু বিগ্রহের পূজা হতো কি না বলা কঠিন। কয়েকজন ভিক্ষু ও শ্রমণকে কখনও কখনও দেখা যেতো, কিন্তু তাদের যে কী কাজ, তা কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না।

পান্থশালাটির অবস্থা আরও শোচনীয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে মনে হতো যেন বা গুহায় প্রবেশ করেছি। দ্বিপ্রহরেও সেখানে রাত্রির মতো অন্ধকার এবং সেই সঙ্গে বহুকালের প্রাচীন একটি শীতল ভাব। একাকী সেখানে দিবসকালেও অবস্থান করা যেতো না। অধিকক্ষণ অবস্থান করলে মনে হতো, যেন প্রাচীরের কঠিন শীতলতা সজীব প্রাণটিকে পিষ্ট করতে আসছে। তাই সে রাত্রিকালে নিদ্রার সময়টুকু ব্যতীত প্রায় সর্বক্ষণই বাহিরে অতিবাহিত করতো।

তবে শয়নকালে প্রতিদিনই অনুভব করতো, কক্ষে সে একাকী নয়, আরও দু'একজন উপস্থিত আছে। তারা কে, কখন আসে, কখন যায়—কিছুই তার পক্ষে জানা সম্ভব হয় না।

একদা রাত্রে, প্রথম যামই হবে তখন, হঠাৎ তার নিদ্রা ভঙ্গ হলো। অনুভব করলো কে একজন তার কটিবন্ধটি মোচন করতে চাইছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিলো না,

তবে অনুমান করলো, পান্থশালাটি গ্রন্থিছেদকদেরও নিদ্রার স্থান। অন্য সময় হলে কি করতো বলা কঠিন। কিন্তু তখন তার অবস্থা মরিয়া। সামান্য কিছু অর্থ আছে সঙ্গে। ঐ অর্থটুকু চলে গেলে তাকে প্রকৃত অর্থেই পথে বসতে হবে। সে বিলম্ব করলো না, ক্ষিপ্রগতিতে লোকটিকে ধরাশায়ী করে তার বক্ষে দেহভার এবং গলদেশে দু'হাত রেখে জানতে চাইলো, কে তুই বল—কেন তুই আমার কটিদেশে হাত দিয়েছিস? শীঘ্র বল, নতুবা এই তোর শেষ!

লোকটির কণ্ঠ থেকে বিচিত্র স্বর নির্গত হচ্ছিলো। বললো, আমাকে ছেড়ে দিন মহাশয়, এমন কাজ আর কখনও করবো না, অপরাধ মার্জনা করুন। আমি বড় ক্ষুধার্ত, ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায় আমি এই দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি—আপনি আমার প্রভু। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—দয়া করুন।

লোকটির সমস্ত কথাই মিথ্যা। সে ক্ষুধাকাতর নিশ্চয়ই নয়—ক্ষুধাকাতর মানুষ অমন শক্তিমান হয় না—আর তখন হাত দু'টি গলদেশে রাখা ছিলো মাত্র, তাতে শ্বাস রুদ্ধ হবার কথা নয়। একেকবার ইচ্ছা হচ্ছিলো, দু'হাতের মুষ্টিতে গলাটি পিষ্ট করে। কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা করে বিরত হলো। সে চায় না, তাকে নিয়ে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি হোক আর তাতে কোনো রাজপুরুষের দৃষ্টি তার উপর পতিত হোক। লোকটি নানান কথা বলে যাচ্ছিলো। তার কথায় জানা গেলো, ঐ স্থানে আরও দু'জন গ্রন্থিছেদক রাত্রিযাপন করে। আজ তাদের উত্তম উপার্জন হয়েছে বলে শৌণ্ডিকালয়ে স্ফূর্তিতে মত্ত। শুধু তারই মন্দভাগ্য, নতুবা এমন হয়? বিদেশী পথিক যে এরূপ সাহসী আর শক্তিমান হবে, তা জানলে, কোন শ্যালক এই কাজ করতে আসে। সে মিনতি ক'রে বললো, মহাশয়, আমি আপনাকে পিতা ডাকছি, আপনি আমাকে চলে যেতে দিন—আমি আর কদাপি এমন কাজ করবো না।

বসন্তদাসের মনে হলো, লোকটি সরল এবং কিঞ্চিৎ রসিকও। সে তার বক্ষ থেকে নেমে বসলো। লোকটি পারতো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পলায়ন করলো না। বললো, আমার চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্য যে আপনার মত দয়ালু লোকের হাতে পড়েছিলাম, মহাশয় যে এমন মার্জার-চক্ষু, রাত্রিকালেও দেখতে পাবেন, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

গৃহস্থ নয়, পথিক নয়—ভিক্ষু কিংবা যোগীও নয়, এই দূর দেশে যে লোকটির সঙ্গে তার আলাপ হচ্ছে সে একজন গ্রন্থিছেদক। উত্তম বসন্তদাস—নতুন স্থানে এসে অত্যন্ত উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে হৃদ্যতা হচ্ছে তোমার। এই না হলে কপাল? সে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

গ্রন্থিছেদকের কাছে অনেক সংবাদ। যেমন, এই স্থানের লোকেরা বহিরাগতদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সাবধান। গূঢ়পুরুষ প্রায় সর্বত্রই আছে। বিশেষত যেদিন মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ প্রাসাদের বাহিরে আসেন, সেদিন প্রায় সকলেই তটস্থ থাকে। বহিরাগত ভিক্ষু যোগী ইত্যাদি দেখলেই নগরবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কেননা ভিক্ষু এবং যোগীরাই নানান অনর্থের মূল। কোথায় যে কোন নিরীহ গৃহস্থকে বিপদাপন্ন করবে তার স্থিরতা নেই।

ভিক্ষু যদি এতোই পরিত্যাজ্য হয়, তাহলে এই মন্দির তো থাকবার কথা নয়—বসন্তদাস মন্তব্য করে।

প্রশ্ন শুনে গ্রন্থিছেদক হাসে। বলে, না মহাশয়, আপনার ধারণা ভুল—এই মন্দির থাকবারই কথা। যদি মন্দিরটি না থাকতো, তাহলে মহাসামন্ত একটি বৌদ্ধ মন্দির এখানে নির্মাণ করতেন। এও তাঁর একটি কৌশল। এই মন্দিরটি আছে বলেই সদ্ধর্মীদের উপর সহজে দৃষ্টি রাখতে পারেন। এই তো দিন কয় পূর্বের কথা। চারিদিকে হৈ হৈ রব। প্রহরীর দল পথে পথে ধাবমান। কি ব্যাপার? না একজন ভিক্ষুকে পাওয়া যাচ্ছে না। গূঢ়পুরুষদের কাছে সংবাদ ছিলো, এক ষড়যন্ত্রী ভিক্ষু নাকি নগরে প্রবেশ করেছে—তার কাছে নাকি রয়েছে একখানি গোপন পত্র। নগরের সমস্ত ভিক্ষু ও যোগীদের বন্দী করা হলো, কিন্তু দেখা গেলো, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি নেই। সে এক বিষম কাণ্ড, নগরবাসীর গৃহে গৃহে চললো অনুসন্ধান। এবং দেখা গেলো, শেষ পর্যন্ত সমস্তই নিষ্ফল।

বসন্তদাস যা শুনছিলো তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি আবার আতঙ্কজনকও। বহিরাগত ব্যক্তি হওয়াতে তার শঙ্কিত হওয়ার কথা কিন্তু সে অধিকতর কৌতূহল বোধ করছিলো। জানতে চাইলো, এই ভিক্ষুরা কী চায় বলতে পারো?

মহাশয়, ও বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ, লোকটি জানায়। অতঃপর বলতে থাকে, তবে জনরব শুনেছি, তারা নাকি দ্রোহ উত্থাপন করতে চায়। ক্ষেত্রকর এবং অন্ত্যজদের সঙ্গে তাদের সবিশেষ মিত্রতা। অবশ্য আমার ধারণা তারা নির্বোধ, পিপীলিকার পক্ষ উদ্‌গয়ের মতো ব্যাপার আর কি! না হলে শস্ত্রধারী সুশিক্ষিত কুশলী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ডোম আর ক্ষেত্রকরেরা যুদ্ধ করতে পারবে, এই ধারণা কারও হয়?

সে ঐ কথার পর উঠলো। বললো, মহাশয়, আমি যাই, কিছু উপার্জনের সন্ধান করি—উদরে ক্ষুধা থাকলে নিদ্রা দেবী নিকটে আসতে চান না।

বসন্তদাস লোকটিকে দুই কুড়ি কড়ি দান করলে সে অভিভূত হয়ে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলো। তারপর বললো, মহাশয়, একটা কথা বলি আপনাকে—এ অধমকে অর্থ দান করলেন, এ বড় উত্তম কথা—কিন্তু সাবধান, এরূপ দয়া সর্বত্র প্রদর্শন করবেন না, বিপদ হবে।

কেন, বিপদ হবে কেন? বসন্তদাসকে অবাক হতে হয়।

বিপদ অন্য কিছুতে নয়, লোকটি জানায়, কোট্টপালের অনুচরেরা এ নগরীতে ভয়ানক তৎপর। ধনী পথিকের সর্বস্ব আত্মসাৎ করার কৌশল তাদের মতো আর কেউ জানে না—সুতরাং সাবধান।

গ্রন্থিছেদক দুই পদ অগ্রসর হয়েও ফিরে এলো। বললো, আর একটি কথা—আপনার মঙ্গলের জন্য বলি, যা শুনলেন সে বিষয়ে কোনোরূপ কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। করলে সে আর এক বিপদ।

তুমি কি আবার এ স্থানে আসবে?

না মহাশয়, আজ মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ সপারিষদ প্রাসাদের বাহিরে এসেছেন—রাত্রিকালে বিষ্ণুমন্দিরে পূজা, ওদিকে আবার শৌল্কিকালয়ের দ্বার সমস্ত রাত্রি মুক্ত থাকবে—সুতরাং বুঝতেই পারছেন—

গ্রন্থিছেদক চলে গেলে বসন্তদাস পুনরায় শয়ন করলো। আশা, এবার নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবে। কিন্তু নিদ্রা আর আসে না—কেবলই ঘুরে ঘুরে গ্রন্থিছেদকের কথা স্মরণ হয়। কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে, মহারাজ শক্তিবর্মণ কি তাহলে শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন? বৃহৎ কোনো যুদ্ধবিগ্রহ কি আসন্ন হয়ে উঠেছে?

সে পূর্বে কখনও এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা করেনি। দেবীকোট মেলায় তিব্বতী ভিক্ষু দলটি এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী রাজসেনাদের দেখে তার মনে চিন্তার উদয় হয়েছিলো প্রথম—কিন্তু ঐ চিন্তা নিতান্তই কৌতূহলাচ্ছন্ন। যবন বৃদ্ধটিও আলাপ প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন—কিন্তু তখনও তার কাছে ব্যাপারটি নিজের জীবন-সংলগ্ন বলে মনে হয়নি। এখন হচ্ছে—বারংবার মনে হচ্ছে, কি কুক্ষণেই না তার আলাপ হয়েছিলো যবন বৃদ্ধটির সঙ্গে। যদি না হতো, তাহলে আজ তার এই অবস্থা হয়? না জানি এরপরও কোনো দুর্দশা তার ভাগ্যে আছে। ঐ রত্নগুলির সদগতি করতে এসেই না তার এখন এমন দুর্দশা।

তৃষ্ণা বোধ হওয়ায় সে উঠলো। বাহিরেই কূপ, সে কূপস্থলের দিকে চললো।

হঠাৎ নারী কণ্ঠের আলাপ তার শ্রবণে আসে। দু'টি নারী-স্বর ঐ কূপস্থলের দিক থেকেই আসছে—সে দূর থেকেই নারীমূর্তি দু'টিকে দেখতে পায়। তার অবাক লাগে, এখন রাত্রিকাল, এই সময়ে মন্দিরকূপে নারীর আগমন কেন? এই ক্ষুদ্র নগরীর নারীরা কি এতোই অসূর্যম্পশ্যা যে গভীর রাত্রি ব্যতিরেকে জলাহরণ করতে পারে না? সম্মুখে দৃষ্টিপাত করতেই সে পুনরপি দেখতে পায়, অদূরে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত এবং সেই দ্বারপথে একজন রমণী নিক্রান্ত হয়ে আসছে। সে নিজেকে বৃক্ষতলে অন্তরাল করে।

অর্ধাঙ্গ চন্দ্রটি তখন মন্দিরশীর্ষে আরোহণ করেছে। তার আলোকে কূপস্থলের সমস্তটাই দৃশ্যগোচর। দেখা গেলো, পুরুষটি মন্দিরেরই একজন ভিক্ষু। রমণীরা কে, সে অনুমান করতে পারে না। তবে দেখলো, তিন রমণীই যুবতী এবং রূপসী।

ভিক্ষুটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, কি সংবাদ বিভাবতী, তুমি নাকি ভয় পেয়েছো?

ভয়, বিভাবতী সম্ভবত মৃদু হাস্য করে। বলে, বিভাবতী যদি ভয় পায়, তাহলে অনাথ মিত্রানন্দের কি দশা হবে প্রভু?

না, অর্হৎ, বিভাবতীর এক সঙ্গিনী জানায়, সে ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়, তবে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন—আমরা মিত্রানন্দকে আর রাখতে পারছি না, প্রতিদিনই বিপদাশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, মহাসামন্তের চরেরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

এই রমণীরা কারা? আর এই ভিক্ষুটিই বা কে? বসন্তদাস কিছুই অনুমান করতে পারে না। শুধু এটুকু বুঝলো যে কিছু একটা অতীব গোপন ব্যাপারের সঙ্গে এরা যুক্ত।

একেকবার মনে হচ্ছিলো, এসব ষড়যন্ত্রমূলক ব্যাপার—এসব তার শোনা উচিত নয়—এই মুহূর্তেই তার এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ঐ সঙ্গেই আবার এও মনে হচ্ছিলো, আহা রমণী এতো সুন্দর হয়! এমন তো পূর্বে কখনও দেখিনি। ঐ মুহূর্তে রমণী-কণ্ঠের মাদকতা তার কর্ণে মধুবর্ষণ করছিলো। চন্দ্রালোকেও রমণীদের দেহরেখা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। সূক্ষ্ম চীনাংশুকে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত হলেও সুগোল স্কন্ধ, বঙ্কিম গ্রীবা, পীবরোন্নত বক্ষ, ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব, নিতম্ববেষ্টিত রত্নখচিত মেখলায় বিম্বিত চন্দ্রালোক—সমস্তই সে দেখতে পাচ্ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো, এরা কি রাজপ্রাসাদের কন্যা ও বধূ? নাকি স্বয়ং রাণী আর তাঁর দুই সহচরী? সে কিঞ্চিৎ আবিষ্টও হয়ে পড়েছিলো। একইসঙ্গে ভীতি ও কৌতূহল, রহস্য ও সৌন্দর্য, চন্দ্রালোকের মায়া এবং মধ্যরাত্রির নির্জনতা—সমস্ত একত্রে মিলিত হয়ে বিচিত্র একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিলো তার মনে। স্থানকালের চেতনা প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিলো ঐ সময়।

ফলে যা ঘটবার তা-ই ঘটলো। কখন যে সে বৃক্ষতলের অন্ধকার থেকে বাহিরের চন্দ্রালোকে এসে দাঁড়িয়েছে নিজেই জানে না। হঠাৎ সে একইসঙ্গে তিনটি কণ্ঠের অনুচ্চ চিৎকার শুনলো, কে, কে ওখানে?

ভিক্ষুটি ছুটে এলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলো তিন যুবতী।

কে তুমি?

আমি পথিক, এই পান্থশালায় রাত্রিযাপন করি।

এই স্থানে কেন? মধ্যরাত্রে এই স্থানে কি করছিলে তুমি?

ভিক্ষুটির উত্তেজিত অবস্থা দেখে বসন্তদাস সবিনয়ে জানায়, অর্হৎ, আপনি উত্তেজিত হবেন না, আমি জলপানের নিমিত্ত এই স্থানে—

চুপ করো, কোনো কথা নয়।

ভিক্ষু বসন্তদাসকে কোনো কথা বলতে দিলেন না। ইঙ্গিতে মন্দিরদ্বারের দিকে নির্দেশ করে বললেন, চলো।

মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার সময় এক তরুণী বসন্তদাসের সঙ্গে স্পৃষ্ট হয়—ক্ষণিকের স্পর্শমাত্র, কিন্তু তাতেই তটিনীকূলে মৃদু তরঙ্গাঘাতের শব্দের মতো অস্পষ্ট হাসি ছলকিত হলো। পশ্চাতে আবার মৃদু শাসনও শোনা গেলো। এক রমণী বললো, ওলো কৃষ্ণা, এতো হাসি কেন? হাসলে কাঁদতে হয় জানিস তো?

হ্যাঁ জানি, সময় হোক, কাঁদবো।

স্থান-কাল কিছুরই বিবেচনা নেই, কেবল কৌতুক। গুহাপথের মতোই পথ, অন্ধকারে নিজের হাত পর্যন্ত গোচরে আসে না। কিন্তু তথাপি কৌতুকের যেন শেষ নেই।

অবশেষে আলোর সন্ধান পাওয়া গেলো। ভিক্ষু যে প্রকোষ্ঠটিতে সবাইকে নিয়ে গেলেন, সেটি সম্ভবত তাঁর নিজেরই বসবাসের স্থান। এক পার্শ্বে শয়নবেদী, প্রাচীর গাত্রে দীপস্থান, সেখানে প্রদীপ জ্বলছিলো ঐ প্রদীপের আলোকে পরস্পরকে স্পষ্টভাবে দেখার

সুযোগ হলো। বসন্তদাসের মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সত্যই পথিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ অর্হৎ, এখন আমি পথিক ব্যতীত অন্যকিছু নই, আত্রেয়ী তীরে আমার নিবাস, পিতা হেমন্তদাস, ক্ষেত্রকর্ম করেন।

তা এ স্থানে আগমনের কারণটি বলো।

বসন্তদাস তখন তার প্রতি শ্রীনাথবর্মণের আচরণের কাহিনীটি বর্ণনা করে। বর্ণনা সমাপ্ত হলে জানতে চায়, বলুন আপনারা, আমি কি ন্যায় বিচার আশা করতে পারি না?

তার কথা শুনে ভিক্ষুটি হাসেন। বলেন, বৎস, ন্যায় কাকে বলে সেটি জানা থাকলে তবে না বিচার হবে?

ক্ষণেক পরে বলেন, যাক সে কথা, এখন বলো, এই নগরীতে তোমাকে কে জানে?

আজ্ঞে না, এ নগরীতে কেউ আমাকে জানে না।

তুমি যে গোপন চর নও, তার নিশ্চয়তা কি?

আজ্ঞে নিশ্চয়তা আমি এবং আমার কথা, এই মাত্র বলতে পারি—আর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তুমি আমাদের কথা শুনেছো?

বসন্তদাস মুহূর্তেক ইতস্তত করে, সত্য কথা বলবে কিনা। তারপর সহজ স্বরে ব'লে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

কিছু বুঝতে পেরেছেন? এবার রমণীদের একজন জানতে আগ্রহী হয়।

বসন্তদাস পূর্ণদৃষ্টিতে রমণীটির মুখপানে চেয়ে দেখে। অত্যন্ত পরিপূর্ণা যুবতী এই রমণী, আর দেহকান্তি যে কি অপরূপ, তা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। রমণীটির মুখপানে দৃষ্টি রেখে সে অকপটে স্বীকার করে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি যে মিত্রানন্দ নামক কোনো এক ব্যক্তিকে আপনারা লুক্কায়িত রেখেছেন, কিন্তু এখন আর রাখতে পারছেন না—মহাসামন্তের চরেরা আপনাদের সন্দেহ করছে।

অকপট ঐ স্বীকৃতির পর কেউ-ই কথা বলে না, কিছুক্ষণ। শেষে তিন রমণীর মধ্যে যে সুন্দরীতমা, সে বললো, শুনুন, আপনাকে আমি মহাসামন্ত শক্তিবর্মণের কাছে নিয়ে যাবো—আপনার পণ্যসামগ্রী উদ্ধার হবে কিনা বলতে পারি না, আপনি যাবেন?

বসন্তদাস সাগ্রহে সম্মত হয়, অবশ্যই যাবো।

তাহলে একটি শর্ত আছে।

বলুন কি শর্ত? বসন্ত এবার রমণীটির মুখের উপর তার পূর্ণ দৃষ্টি রাখে।

আপনি আমাদের অতিথি হবেন কয়েকদিনের জন্য—গোপন কিছু নয়, আপনি নিজ পরিচয়েই আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন, তবে আমাদের এই মন্দিরে আগমন, মিত্রানন্দ প্রসঙ্গ, অথবা যা শুনেছেন—কিছুই অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। আপনার প্রিয়তমা রমণীর কাছেও নয়—মনে করবেন, আজ রাত্রের ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি—পারবেন?

বসন্তদাস এবার অন্য দুই রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। কৃষ্ণা সম্ভবত শ্যামাঙ্গীর নাম, আর সুন্দরীতমা রমণীটি বোধ হয় বিভাবতী। সে লক্ষ্য ক'রে দেখে, প্রত্যেকের মুখ গম্ভীর। বুঝতে পারে, গম্ভীর হলে রমণী মুখ সত্যিই মলিন হয়। ক্ষণকাল পূর্বেও সকলের মুখে কৌতুকোজ্জ্বল ভাব লক্ষ্য করা গেছে। সে ভিক্ষুর মুখে দৃষ্টিপাত করে বলে, অর্হৎ, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সাধু—আমার অবস্থাটি নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। দেখুন, আমি এদেশের বিষয়ে কিছুই জানতাম না—আজ রাত্রেই এই পান্থশালায় এক গ্রন্থিছেদকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তার মুখেই শুনলাম যে এদেশে বৌদ্ধ সদ্ধর্মীরা রাজরোষে পতিত হয়েছে, তারা নাকি এদেশে দ্রোহ উত্থাপন করতে চায়। এখন দেখছি, তার কথা অমূলক নয়। এমতাবস্থায় আমি কোনো প্রকার বিপদে পতিত হতে চাই না—যদি আমার পণ্যাদি উদ্ধারের আদৌ কোনো আশা না থাকে, তাহলে অহেতুক এ স্থানে আমি কেন থাকবো? রাত্রি প্রভাত হলেই আমি চলে যাবো—আমাকে আপনারা অনুমতি দিন।

শুক্লা, এ পথিক দেখছি বড়ই চতুর—বিভাবতীর চটুল মন্তব্য বসন্তের শ্রবণে আসে।

হ্যাঁ, আমারও মনে হয়, একেবারে গভীর জলের মৎস্য, শুক্লা তৎক্ষণাৎ নিজ মত ব্যক্ত করে।

মন্তব্য দু'টি শুনে বসন্তদাস হাসে। বলতে পারতো যে অবস্থাগুণে সকলেই চতুর হয়। কিন্তু কিছুই না বলে সে পুনরায় অনুমতি চায়, অর্হৎ, আদেশ করুন, আমি এবার যাই।

ওলো কৃষ্ণা, পথিককে তুই আমন্ত্রণ কর না, ও যে চলে যায়। সুন্দরীতমা বিভাবতীর কৌতুকস্বর এবার মাদকতাময়।

বসন্তদাস হাস্যাননা বিভাবতীর মুখপানে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে। দুকূল উত্তরীয় ঈষৎ বিস্রস্ত, কণ্ঠের মুক্তামালা উন্নত বক্ষশয্যায় একবার উঠছে একবার নামছে। মুখে সে কিছুই বলে না। ভিক্ষুককে প্রণাম ক'রে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

কিন্তু অন্ধকার অলিন্দে এসে উপনীত হতে না হতেই ডাক শুনতে পায়, পথিক কি নিদ্রার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন?

না, শেষ পর্যন্ত আর পারেনি, বসন্তদাসের এখনও স্পষ্ট স্মরণ হয়। বিভাবতী নয়, শুক্লা নয়, কৃষ্ণাই এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন। বলেছিলো, আপনাকে আমাদের বিশ্বাস নেই, তাই চক্ষুরান্তরাল করবো না—আপনি আমাদের হাতে বন্দী।

কী ভেবেছিলো তারা, বসন্তদাস জানতে পারেনি, তবে তার অনুমান, কৃষ্ণার কথা একেবারেই কৌতুকের ছিলো না। সম্ভবত তাদের আশঙ্কা ছিলো যে সে রাজপ্রহরীদের হাতে বন্দী হলে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দেবে। সে জন্যেই তাদের চেষ্টা, যাতে সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে এবং তুষ্ট থাকে।

বসন্তদাসের ততক্ষণে প্রত্যেকের পরিচয় জানা হয়ে গেছে। তিনজনই বিষ্ণু মন্দিরের দাসী এবং তিনজনই নর্তকী। রাত্রির তখন মাত্রই মধ্য যাম। শুক্লা, কৃষ্ণা উভয়েই চঞ্চল

হয়ে উঠেছিলো। একজন বিভাবতীকে স্মরণ করিয়ে দিলো, ওদিকে বিলম্ব হয়ে না যায়, চলো, শীঘ্র যাই।

মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসছিলো না, হয়তো ওদিকে ততক্ষণে পূজা সমাপ্ত হয়েছে।

কৃষ্ণা নিকটে এসে বললো, চলো হে ক্ষেত্রকর, এবার বন্দীশালায় চলো।

আম্রকাননের মধ্য দিয়ে পথ, সম্ভবত এই পথেই তারা গমানগমন করে। ভিক্ষু ব্রজানন্দ তাদের সঙ্গে এলেন কানন পর্যন্ত। বিদায়কালে বললেন, মিত্রানন্দকে আজ রাত্রেই নগর ত্যাগ করতে বলবে—আজই সুযোগ।

পথিমধ্যে তিন সখীর পরামর্শ হয়। সিদ্ধান্ত হয় কৃষ্ণা বসন্তদাসকে নিয়ে গৃহে যাবে এবং বিভাবতী শুক্লাকে নিয়ে যাবে প্রথমে মন্দিরে, তারপর গৃহে। গৃহে ফিরতেই হবে—কারণ পূজা শেষে মহাসামন্ত বিভার গৃহে যাবেন।

কাজটি বিপজ্জনক, কিন্তু ঐভাবেই তারা ভিক্ষু ব্রজানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। যেদিনই রাত্রে মন্দিরে পূজার বৃহৎ আয়োজন হয়, সেদিনই তারা পূজার আয়োজন সমাপ্ত ক'রে অন্য দুই সেবক ও দাসীকে মন্দিরে রেখে দর্শনার্থী নারীপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। ঐভাবেই তারা মন্দিরের বাহিরে যায় এবং কাননের মধ্য দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে অবলোকিতশ্বরের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়। বোঝা যায়, তাদের এইভাবে গমনাগমনের ব্যাপারটি লোকচক্ষুর অগোচরেই ঘটে চলেছে। বসন্তদাস অনুমান করে মাত্র, প্রত্যক্ষ কিছুই সে দেখে না। তার অনুমান, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভয়ানক কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত এই মন্দিরদাসীরাও। তার অবাক লাগে। মন্দিরদাসীদের আচরণ এমন কেন? দেশে যদি সত্য সত্যই দ্রোহ উত্থিত হয়, তাহলে এদের তো লাভালাভ কিছু নেই, তাহলে এরা কেন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত? বিভাবতী, কৃষ্ণা ও শুক্লার আচরণ সে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না।

মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ বিভাবতীর গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে অন্যান্য সহচরদের বিদায় দিলেন। সঙ্গে রাখলেন দুই বয়স্যকে। মন্দির থেকে এলেও তাঁর পদক্ষেপ স্থির নয়। থেকে থেকেই স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার করছিলেন।

বিভা প্রস্তুত হয়েই ছিলো, সে রাজপুরুষদের সমাদরে কোনো ত্রুটি রাখে না। শক্তিবর্মণ বিভাবতীকে দেখে বললেন, সখী বিভু, তোমাকে যে মন্দিরে দেখলাম না?

মহারাজ সম্ভবত লক্ষ্য করেননি, আমার বেশ তখন অন্যরূপ ছিলো।

ও, তাই হবে তাহলে—ওহে তোমরা দেখেছিলে?

বয়স্য দু'জন ইতস্তত করে বার দুই। তাদের বোধগম্য হচ্ছিলো না কোন উত্তরটি প্রভুর অভিপ্রেত। একজন বললো, না মহারাজ, দেখিনি—অন্যজন বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, দেখেছি।

দু'জনের দুই প্রকার উক্তিতে হা হা অট্টরবে হেসে উঠলেন শক্তিবর্মণ। বললেন, ওহে, দেখছি তোমাদের দু'জনেরই বিভ্রম, কিন্তু বিভ্রম কিসে? দৃষ্টিতে না জিহ্বায়?

দাসী পুষ্পমালা রেখে গিয়েছিলো। শক্তিবর্মণ মালাগুলি দেখলেন হাতে নিয়ে। একখানি মালা এক বয়স্যের গলায় দিয়ে বললেন, নাও হে মর্কট, এটিকেই মুক্তামালা জ্ঞান করো।

অল্পক্ষণ পরই সঙ্গীত আরম্ভ হয়। শুক্লার গীতটিতে ছিলো বিষাদময় ভাব—একটি শুকপক্ষীর পিঞ্জর ত্যাগ করে পলায়নের কারণে নায়িকার যে বেদনা ও বিরহ, তাই সে বার বার গেয়ে প্রকাশ করছিলো। শক্তিবর্মণ বিরক্তি বোধ করেন। গীতের মধ্যস্থানেই বলে উঠলেন, রমণীর রোদন শুনতে আসিনি আমরা—বিভু কোথায়—আমরা যে নৃত্য দেখবো ব'লে এসেছি।

অচিরেই বিভাবতী নৃত্য আরম্ভ করলো। এই কলায় সে অসাধারণ পারদর্শিনী। যৌবনে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কয়েকজন নৃত্যপটিয়সী মন্দিরদাসী আনয়ন করেছিলেন কান্যকুব্জের দক্ষিণাঞ্চল থেকে, বিভাবতীর মাতামহী তাঁদেরই একজন। মন্দিরদাসীদের পিতৃপরিচয় থাকে না—কিন্তু বিভাবতীর মাতা জানতেন তাঁর পিতৃপরিচয় কী, এবং বিভাবতী নিজেও জানে নিজ পিতার পরিচয়। সে যা-ই হোক, দৌহিত্রীর নৃত্যকলা শিক্ষা হয়েছে মাতামহীর কাছে। সুতরাং বিভাবতীর নৃত্য দেখবার মতো। শক্তিবর্মণ নৃত্য দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তিনি মধ্বাসব পান করে পাত্রের পর পাত্র শূন্য ক'রে দূরে নিক্ষেপ করছেন আর প্রমত্ত স্খলিত কণ্ঠে হা হা রবে অট্টহাসি হাসছেন। কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে দুই বয়স্যের উপর ঢলে পড়ছেন। ওদিকে তখন নৃত্য উঠেছে তুঙ্গে—বয়স্য দু'জন মহাসামন্তকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু শক্তিবর্মণ কি আর স্থির থাকার লোক? তিনি অট্টরবে হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে স্থির থাকতে বলছো কেন হে, জানো না, শৃঙ্খলিত ও স্থির থাকে ভারবাহী পশুরা! শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করলে কি কেউ শৃঙ্খলা রক্ষক হতে পারে? সম্ভব নয় হে, অনুশাসন শৃঙ্খলিত সন্ন্যাসী কি এই অপ্সরা রমণীর নৃত্যলীলা উপভোগ করতে পারবে? পারবে না। সদ্ধর্মী ভিক্ষু আর পাষণ্ড যোগীদের দ্রোহদমনও কি সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষে সম্ভব? বলো?

শক্তিবর্মণ তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে উল্লাসে হাসিতে একেবারে ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছেন তখন। সম্মুখে নৃত্য হচ্ছে কিন্তু সেদিকে তাঁর মনোযোগ নেই। নানান কথা তাঁর মনে উদিত হচ্ছে এবং সেগুলি তিনি বলে যাচ্ছেন একে একে।

বয়স্যদের ডেকে বললেন, ওহে বলীবর্দ, বলো দেখি, ক্ষাত্রতেজ কিসে উদ্দীপ্ত হয়?

বয়স্যটি বিপাকে পতিত হয়। পিতৃপুরুষের জন্মে সে এমন প্রশ্ন শোনেনি। অপ্রতিভ হয়ে সে বলে, মহারাজ, ক্ষাত্রতেজের কথা বলছেন? শুনেছি ময়ূর মাংস ভক্ষণে ....

কুক্কুর, তুমি প্রকৃতই একটি কুক্কুর হে—কেবল খাদ্যের দিকে মন তোমার। পারবে বলতে? হা হা হা—পারবে না হে, পারবে না—শুনে রাখো, ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপ্ত হয় রণে ও রমণে।

ওদিকে বিভাবতীর নৃত্য সমাপ্ত হয়েছিলো। সে নিকটে এলে কোমলস্বরে ডেকে বললেন, অয়ি সখী বিভু, তুমি সেই নৃত্যটি দেখাবে? সেই যে কেশব বাসনা লক্ষ্মী মন্থন শেষে সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসছেন, হাতে তাঁর অমৃতভাণ্ডটি?

বিভাবতী প্রণাম জানিয়ে সহচরীদের নির্দেশ দিলো। তারপর আরম্ভ করলো সেই নৃত্যটি। স্বভাবতঃই সে মুদ্রা এবং তালে নতুন ভুবন সৃষ্টি করতে পারতো, তায় তখন রাত্রির মধ্যযাম এবং প্রদীপালোকের মায়ালোক। উপরন্তু আসবমত্ত দর্শকদের দৃষ্টি মদিরাতুর—ফলে চোখের সম্মুখে নানান বিভ্রম সৃষ্টি হতে লাগলো। দ্বারান্তরালে বাদিকা সুললিতার হাতে ছিলো মৃদঙ্গ এবং নীলাঞ্জনার হাতে বীণা। দৃশ্য এবং শ্রব্য উভয়ের এমন সুসমঞ্জস মিলন কদাচিৎ ঘটে। আরক্ত নেত্রে মহাসামন্তপতি এবং তাঁর সহচর দুই বয়স্য যা দেখতে লাগলেন, তাতে ভাবলেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় বসে আছেন।

প্রদীপালোকের সম্মুখে কে একজন অন্তরাল সৃষ্টি করলো, তাতে আলোহীন অন্ধকারবিহীন একটি মায়ালোক জন্ম নিলো। অদৃশ্যে কোথায় যেন তখন অস্ফুট মৃদঙ্গের শব্দ হচ্ছে। যেন আলো অন্ধকারে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন। সাগর-মৃত্তিকা-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত সমগ্র চরাচরে গভীর, ধীর, অথচ প্রাণময় ওঙ্কার নাদটি সবে আরম্ভ হয়েছে, এমন মনে হলো। সেই অন্ধকারের বুকে রত্নখচিত মুকুটটি প্রথমে দেখা গেলো, তারপর লক্ষ্মীর বিদ্যানন, শেষে পূর্ণ দেহাবয়বটি। মেনকা কি এমন যৌবনধন্যা ছিলো? নাকি ইনি উর্বশী? রম্ভার কটিদেশ কি এরূপ ক্ষীণ ছিলো এবং নিতম্ব এমন গুরুভার? বয়স্যরা চক্ষু কচালিত করলো। সূক্ষ্ম চীনাংশুকের অন্তরাল থেকে লক্ষ্মীর উরুদেশের যেটুকু সৌন্দর্য নৃত্যের প্রতিটি তালের সঙ্গে ঝলকে ঝলকে গোচরে আসছিলো তাতে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হওয়া ছাড়া দর্শকদের গত্যন্তর ছিলো না। গভীর জলদেশের স্থিরতায় প্রথমে কম্পন, তারপরে যেন কলরোল জেগেছে। মন্থিত সমুদ্রের জলরাশিতে নয়, বিষ্ণুবাসনা লক্ষ্মীর যৌবনময় দেহবল্লরীতেই যেন বিপুল উচ্ছ্বাস এবং ফেনায় কলরোল উন্মথিত হচ্ছে। এই ঘটনা কি মর্ত্যের? দর্শকেরা বলতে পারবে না। ক্রমে লক্ষ্মী তাঁর কক্ষে সুবর্ণ কলসটি নিয়ে স্মিত হাস্যে স্থির হলেন।

অর্থাৎ এতক্ষণে দেবীর পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো। দীপাধারের ঘৃত প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এখন আর আলোছায়ার বিভ্রম নয়। উজ্জ্বল আলোক লক্ষ্মীর দেহত্বকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে—পরিপূর্ণ উরুদেশ, ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব ও প্রমত্ত জঘন মানবী দেহে বিন্যস্ত হয়ে ক্রমে যেন দর্শকদের চোখের সম্মুখে একটি স্পর্শাতীত বাসনার মূর্তি হয়ে উঠলো। দর্শকরা বিভ্রান্ত। কেউ নিঃশ্বাস ত্যাগও করে না—কি জানি, যদি এই স্বপ্নঘোর ভেঙে যায়?

কিন্তু প্রকৃতই কি স্বপ্নঘোর? বিভাবতী স্বপ্নঘোর সৃষ্টি করতে চায়নি, তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে ধীর পদক্ষেপে এক সময় নিকটে এসে সুবর্ণ কলসের অমৃত ঢেলে পানপাত্রগুলি পূর্ণ করে দিলো।

নৃত্য শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনও কক্ষের মধ্যে রেশটির গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে—মৃদঙ্গ ও বীণার মূর্চ্ছনা তখনও কক্ষের চারিদিকে কম্পমান—ঐ সময় বিভাবতীর মুখে কথা ফুটলো—মহারাজ, লক্ষ্মীর অমৃত পান করুন।

ও হ্যাঁ, সম্বিত ফিরলো যেন প্রত্যেকের। শক্তিবর্মণ ডেকে বললেন, ওহে অমৃত পান করো—অমর হবার এই-ই সুযোগ।

অতঃপর স্বল্প কিছু কথা, কয়েকমুহূর্তের উল্লাস এবং বিভাবতীকে নিকটে পাওয়ার জন্য উদ্বাহু আহ্বান—এই পর্যন্তই। অর্ধদণ্ডকালও অতিক্রম হয়নি, দেখা গেলো, বিশালাকার তিন ষণ্ডই ভূমিতে লুণ্ঠিত—তাদের নাসিকা গর্জনে পৃথিবী থরথর কম্পমান।

ঔষধি ক্রিয়ায় সম্ভবত কাণ্ডটি ঘটে থাকবে, বসন্তদাস অনুমান করে। সে সমস্ত প্রক্রিয়াটি দ্বারান্তরাল থেকে প্রত্যক্ষ করছিলো—কৃষ্ণাও ছিলো নিকটে উপবিষ্টা। শক্তিবর্মণ পপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রমোদ কক্ষে প্রবেশ ক'রে প্রদীপগুলি নির্বাপিত করতে থাকে। শুক্লার কণ্ঠস্বর শোনা যায় ঐ সময়, সে বাহিরের প্রহরীদের ডেকে বলছে, মহারাজ নিদ্রাগত হয়েছেন—তোমরাও বিশ্রাম নিতে পারো।

ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব ত্রস্ত ব্যস্ত দেখা যায় তিনজনকেই। একজন মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন সে এক রহস্য, আর তৎক্ষণাৎ কোথায় যে চলে গেলেন সে আরেক রহস্য। কৃষ্ণা ঐ মুহূর্তে বলে যায়, পলায়ন করবেন না, আমি এক্ষুনি আসছি।

স্বল্পক্ষণ পরই সে ফিরলো। মুখে বিজয়িনীর হাসি। বললো, এবার চল হে পথিক, তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

পশ্চাতে শুক্লা কটাক্ষ করে। ওলো দগ্ধাননা রাক্ষুসি, রাত্রি কিন্তু অধিক নেই, ওকে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও ঘুমোতে দিস।

ঐরূপ সংলাপ বিলক্ষণ উত্তেজক। কিন্তু বসন্তদাসের মনে ভয় ছিলো। মনে হচ্ছিলো, এক সর্বনাশা খেলায় মত্ত হয়েছে ঐ তিন রমণী। তাদের সান্নিধ্য পরিহার করতে না পারলে বিপদ অনিবার্য। তাদের কৌতুকালাপের ইঙ্গিতগুলি তাই অযথা নষ্ট হচ্ছিলো। কৃষ্ণা তো একবার বলে বসলো, কি হে ক্ষেত্রকর, কর্ণে কি জল পশে না? বলো না, তোমার বধূটি বালিকা, না যুবতী?

তাকে নিজ কক্ষে নিয়ে যায় কৃষ্ণা। তারপর দ্বার অর্গলবদ্ধ করে। বসন্তদাস তখন শঙ্কিত, তবে কি সত্য সত্যই একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সে? কিন্তু কিছুই করণীয় ছিলো না তার। তবু সে বললো, আপনারা আমাকে কেন ভুল বুঝছেন, আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না আমার দ্বারা, বিশ্বাস করুন।

কৃষ্ণা উত্তরীয়খানি হেলাভরে দূরে নিক্ষেপ করলে সে অধর দংশন ক'রে নিজেকে সংযত করে। কিন্তু যখন হাত ধরে কৃষ্ণা আহ্বান করে, এসো, শয্যায় এসো, তখন আর তার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হয় না। বলে, কেন আমাকে প্রলুব্ধ করছেন, আমি আপনাদের কোনো কথাই কোথাও প্রকাশ করবো না—বিশ্বাস করুন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করলাম, কৃষ্ণার ওষ্ঠদ্বয়ে ঐ সময় হাসি বিলোলিত হয়। বলে, বারংবার এক কথা বলার কি প্রয়োজন, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি, এসো শয়ন করি, রাত্রি যে চলে যায়।

তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, কৃষ্ণা এভাবে নিজের অবমাননা ক'রো না। কিন্তু কথাটি ঐ ভাষায় সে বলতে পারে না। বললো, ভদ্রে, দক্ষিণাদানের কোনো সামর্থ্যই আমার নেই—আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

ঐ কথায় কৃষ্ণার ভ্রূযুগল ক্ষণিকের জন্য তীক্ষ্ণধার হয়ে ওঠে। পরক্ষণে সে স্মিতহাস্যে জানায়, মন্দিরদাসী সর্বদা দক্ষিণার প্রত্যাশা করে না হে নির্বোধ ক্ষেত্রকর, তাদের প্রণয়ও হয়।

না ভদ্রে, আমি বিশ্বাস করি না, বসন্তদাস জানায় উত্তরে। বলে, প্রণয় অতো সুলভ নয়, এতো অল্পকালের প্রণয় সেই প্রকার গভীর হতে পারে না, যাতে দু'জনে একত্রে শয্যাগ্রহণ করা যায়—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, আমি লম্পট নই।

কী যে হয় কৃষ্ণার, বোঝা যায় না। সে তার বিশাল চক্ষু দু'টি মেলে ধরে বসন্তদাসের দৃষ্টির সম্মুখে। কী দেখে, ভগবান জানেন—তারপরই ওষ্ঠে ভারী ক্ষীণ একটি হাসি ফুটিয়ে বলে, না হে ক্ষেত্রকর, আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি—ঐ পর্যন্ত বলে সে হাত ধরে বসন্তদাসের। তারপর বলে, আত্রেয়ীতীরের পুরুষ, মানুষই—অন্যকিছু নয়।

না, আবার আপনি ভুল বুঝলেন, বসন্তদাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। বলে, পৌরুষ বিচারের প্রশ্ন নয় এটা—আর সে বিচারও আপনারা করছেন না—বরং আমি দেখছি, আপনারা আমাকে এমনভাবে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করতে চান, যাতে আমি আপনাদের কোনো গোপন কথা কখনও প্রকাশ করে না দিই। আমি বলি, আপনার এই প্রণয়পাশের প্রয়োজন নেই, নিশ্চিত থাকুন, আমি কখনই কিছু বলবো না—

হয়েছে হে বাক্যবাগীশ ক্ষেত্রকর, অধিক কথা ব'লো না—এসো ক্ষেত্রকর্ম করো।

কৃষ্ণা তখন কৌতুকে, কপট ক্রোধে এবং লীলাবিলাসে এমন হয়ে উঠেছে যে, সাধ্য কি বসন্তদাসের তাকে নিরস্ত করে। সে দেখে, প্রগলভা মন্দিরদাসী প্রেমদানে উন্মুখ হলে পুরুষ বড়ই অসহায়।

এবং রাত্রির ঐ শেষ যামে বসন্তদাসকে কৃষ্ণার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ যখন চক্ষুরুন্মীলন করলেন, তখন সকাল। নগরীর কর্মকোলাহল শোনা যাচ্ছে। প্রথমে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। চিন্তা করলেন, তিনি কোথায়? তাঁর পূর্ব রাত্রির কথা স্মরণ হলো—কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনাটি স্মরণ করতে পারলেন না।

মস্তক আন্দোলন করলেন কয়েকবার। যদি ঘোর কাটে—কিন্তু কাটলো না ঘোর। শরীরময় মেদুর একটি অবসাদ, প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে শিথিলতা। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কক্ষের বাইরে অলিন্দের চত্বরে পদচারণা করলেন কয়েকবার। অদূরেই একটি আম্রকানন—সেখানে বৃক্ষ শাখায় পীতবর্ণ পক্বাম্র দুলতে দেখলেন। বৃক্ষতলের প্রহরীটিও তাঁর দৃষ্টিতে এলো। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। তিনি পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বয়স্য দু'জন তখনও নিদ্রিত। একজনের নাসিকা গর্জনে তখনও কক্ষটি প্রকম্পিত হচ্ছে। তাকে পদাঘাত করে বললেন, ওহে নাসিক্যানন্দ, তোমার বাদ্য কি থামাবে? ভূকম্পনে ধরণী যে রসাতলে গেলো।

বয়স্য দু'জন জাগ্রত হয়ে উঠে বসলে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে—প্রাসাদে চলো।

ওদিকে তখন প্রাতরাশের ব্যবস্থা হয়েছে। শূলপক্ক ময়ূর, মৃগমাংস, পলান্ন, পক্ক আম্র, পনসকোষ, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিয়ে ষোড়শোপচার আয়োজন। মধুকাসবের স্বর্ণকলসটি যথাস্থানেই রাখা হয়েছে।

আহার যখন শেষ পর্বে, ঐ সময় বিভাবতী তার প্রার্থনা নিবেদন করে। বলে, মহারাজ, অনুমতিদান করলে এক হৃতসর্বস্ব বণিককে আপনার পদপ্রান্তে আনি, সে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

শক্তিবর্মণ শূলপক্ক ময়ূরমাংস চর্বণ করছিলেন। বললেন, আরে অধিক বিনয়ের কি প্রয়োজন—যাও, নিয়ে এসো তোমার বণিককে।

বসন্তদাস তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়, মহারাজের জয় হোক।

কি হে বণিক পুত্র, সংবাদ কি তোমার?

বসন্তদাস তখন নিজ পরিচয় জানিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। শক্তিবর্মণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শেষে বলেন, সমস্তই বুঝলাম, তুমি এখন কী চাও?

প্রভু, আমার পণ্যসামগ্রীর প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করি।

রে মূর্খ, তা কি হয়, শক্তিবর্মণ প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন। যেন কোনো বালকের অবাস্তব আবেদন শুনছেন। অতঃপর বলেন, সামন্ত হচ্ছেন রাজার প্রতিভূ, তাঁর কাজ রাজকার্যের সমতুল্য। রাজার গৃহীত সামগ্রীর কি প্রত্যর্পণ হয়? তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা করো।

মহারাজ তাহলে অনুগ্রহ করে আমার পণ্যাদির মূল্য পরিশোধ করার জন্য আদেশ দিন।

বসন্তদাসের কথা শুনে মহাসামন্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তিনি চর্বণে বিরত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন বসন্তদাসকে। মনে হয় যেন বহুকষ্টে নিজেকে আত্মস্থ করছেন। তারপর বলেন, তুমি দূরের লোক—অধিকন্তু পথিক এবং বিভাবতীর আশ্রয়ে আছো, তাই রক্ষা পেলে, ভবিষ্যতে কদাপি এরূপ বাক্য উচ্চারণ করবে না, সামন্ত বা মহাসামন্ত কারও প্ররোচনায় আদেশ প্রদান করেন না—কথাটি স্মরণ রেখো, এখন যাও।

বসন্তদাসের কিছুই বোধগম্য হচ্ছিলো না, এরূপ উষ্মার কারণ কি! সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। একজন বয়স্য বলে উঠলো, কি হে বণিক পুত্র, কর্ণে কি জল প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে?

মহাসামন্ত বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। বিভাবতীকে বললেন, কে এই বণিক? এ কেন তোমার গৃহে?

ঐ সময় একজন লোক এসে তাকে কিছু বললে—তিনি বিলম্ব করলেন না। আহার ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছুই না বলে বিভাবতীর গৃহ ত্যাগ করলেন।

মহাসামন্ত বিদায় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতী চঞ্চল হয়ে উঠলো। বসন্তদাসকে বললো, আপনি কেন ঐ কথা বললেন? এখন কী হবে কে জানে, মহাসামন্তের রোষ ভয়ানক, আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন।

কেন, কি হয়েছে, ইত্যাকার প্রশ্ন করতে পারতো। কিন্তু দেখলো, ঐসব প্রশ্ন শোনার মতো মানসিক অবস্থা কারও নেই। ওরা তিনজনই নিদারুণ বিচলিত। বিভাবতী বারবার বলছে, গত রাত্রে মিত্রানন্দকে স্থানান্তরিত করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম—আজ আবার এ কোন বিপদ সৃষ্টি করলেন আপনি, কেন ওকথা বলতে গেলেন?

বসন্তদাস কিছু বলতে পারে না। সমস্ত অপরাধ যেন তার একার। সে বিভ্রান্ত বোধ করছিলো। প্রকাণ্ড এক অপরাধের ভার নিয়ে কি সে পলায়ন করবে, না সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে রাজরোষের সম্মুখীন হবে। সে শেষে জানালো, আমার কারণে আর চিন্তিত হবেন না—আমি চলে যাচ্ছি।

ঐ সময় কৃষ্ণা এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, তুমি চলে যাচ্ছো, কিন্তু আমরা? আমরা কোথায় যাবো?

তোমাদের তো কোনো দোষ নেই, অপরাধ আমি করেছি, যদি শাস্তি দেয়—আমাকে দেবে।

এই তোমার বুদ্ধি! জানো, শক্তিবর্মণের চরেরা কত প্রকার উৎপীড়নের প্রক্রিয়া জানে? তুমি জানতেও পারবে না, কখন তুমি সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিয়েছো—আর সকল সংবাদ যদি তারা জানতে পারে, তাহলে আমাদের কি দশা হবে ভাবো তো?

বসন্তদাসের ক্রোধ হয় ঐ কথা শুনে। বলে, ষড়যন্ত্র করলে তার শাস্তি হবে না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শাস্তি হবে, তার জন্য আমরা প্রস্তুতও—কিন্তু তুমি? নিষ্কৃতি পাবে কি? তুমিও নিষ্কৃতি পাবে না—এই সামন্তরাই তোমার সর্বস্ব অপহরণ করেছে। তোমার কোনো অপরাধ ছিলো না, তথাপি তুমি অপহৃত হয়েছো। নিরপরাধ হলেই যে তুমি রক্ষা পাবে—এমন নিশ্চয়তা কি কেউ তোমাকে দেবে?

না, দেবে না, বসন্তদাসকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বারবার একই প্রশ্ন সে করে, আমি তো কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নই—আমি তো কোনো প্রকার দ্রোহের উত্থান সমর্থন করি না, তথাপি কেন আমি পলায়ন করবো?

কৃষ্ণার দু'চোখে অগ্নি স্ফুরিত হয়। বলে, এই তোমার পৌরুষ? নির্বোধ, একাকী, দায়হীন—বিদ্রোহ যদি হয়, তা'হলে তা হবে কার জন্য, আমার জন্য? বলো? আমাকে কী দেবে সেই উপপ্লব? আমরা মন্দিরদাসী, আমাদের গৃহ নেই, সংসার নেই, ভবিষ্যৎ নেই—তথাপি আমাদের মনে হয়েছে, অনাচারের অবসান হওয়া প্রয়োজন, অত্যাচার দূর হওয়া উচিত, মানুষের অপমান এবং লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। যদি আমাদের নিষ্ফল জীবন মানুষের জন্য কল্যাণময় ভবিষ্যৎ এনে দিতে পারে, তাহলেই মনে করবো জীবন আমাদের সার্থক হয়েছে। কল্যাণ ও মঙ্গলময় সেই ভবিষ্যৎ আমাদের হবে না, হবে

তোমাদের, যাদের গৃহ আছে, সংসার আছে—তথাপি আমরা মনে করবো, আমাদের জীবন জগতের কাজে লাগলো।

বসন্তদাস শুনছিলো। কৃষ্ণার প্রতিটি কথা তার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। একেকবার স্মরণ হচ্ছিলো বিগত রাত্রির কথা। এ কোন রমণী, এ কি গত রাতের সেই কামবিলাসিনী মন্দিরবারাঙ্গনা? যার কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় ছিলো না? নাকি এ অন্য কোনো তেজস্বিনী নারী। স্বয়ং আদ্যাশক্তি কি আশ্রয় নিয়েছেন এই সুন্দর রমণী দেহের ভিতরে? পরিশেষে সে বিগত রাত্রির মতোই আত্মসমর্পণ করলো। বললো, উত্তম কথা, আমি নগরী ত্যাগ করছি এবং সেই সঙ্গে তোমাদের সংসর্গও।

তুমি বড় নিষ্ঠুর হে ক্ষেত্রকর! কৃষ্ণা সহাস্য মন্তব্য করেছে তারপর। নিজ কক্ষে নিয়ে গিয়েছে। দু'টি সুবর্ণ মুদ্রা কটিবন্ধে বেঁধে দিয়েছে। বলেছে, তুমি মঙ্গলদ্বীপ গ্রামে যাবে, দক্ষিণে নয়, বামে নয়—একেবারে স্থির পশ্চিমে—মঙ্গলদ্বীপে তুমি দিবানাথের গৃহে আশ্রয় নেবে, যদি সেখানে মিত্রানন্দকে পাও, উত্তম, যদি না পাও, তাহলে দিবানাথের পরামর্শ মতো অন্যত্র যাবে।

সর্বশেষে কৃষ্ণা দু'হাত ধরে মুখপানে দৃষ্টিপাত করেছে। বলেছে, ওহে, আত্রেয়ী তীরের ক্ষেত্রকর, এক রাত্রির সাক্ষাতেও মন্দিরদাসী প্রণয়ীকে হৃদয়দান করতে জানে—এখন বিশ্বাস হয় সে কথা?

দারুণ হাসছিলো তখন কৃষ্ণা। আর ঐ একটি প্রশ্নই বারবার করছিলো, বিশ্বাস হয় না তোমার? বলো, বিশ্বাস হয় না?

বসন্তদাস ঐ কথার উত্তর দিতে পারেনি। উত্তরের ভাষা তার জানা ছিলো না। শুধু দু'হাতে আকর্ষণ করে কৃষ্ণার সীমন্তে একটি চুম্বন এঁকে দিয়েছে।

ঐ তার শেষ সাক্ষাৎ।

এবং ঐ শেষ সাক্ষাৎই তাকে যুক্ত করে দিয়েছে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। ঐ বিদায় যেন বিদায় নয়, বন্ধন। তারপর সে একাকী নয়। জগতের নানান প্রসঙ্গ এখন তার চিন্তা-ভাবনার বিষয় হয়ে যায়। তার বণিক জীবনের মৃত্যু ঘটেছে ফল্গুগ্রামে, বালিগ্রামে হয়েছে তার অন্ত্যেষ্টি এবং ঐ অন্ত্যেষ্টির পর আরম্ভ হয়েছে তার নতুন জীবন। সে জানে না, এই নতুন জীবনের কী নাম—কিন্তু সে একটি গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিটি মুক্তির। সীমারেখা থেকে মুক্তি, গণ্ডিরেখা থেকে মুক্তি, স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্তি—এবং এইভাবে ঘৃণা থেকে, সংকোচ থেকে, হীনমন্যতা থেকে ক্রমাগত একের পর এক মুক্তি।

অবশ্য এই গভীর তাৎপর্যময় উপলব্ধিটি স্পষ্ট হয়েছে অনেক পরে। তবে তার সূচনা ঐদিন, যেদিন সে বালিগ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে আসে।

বালিগ্রাম ত্যাগ ক'রে সে মঙ্গলদ্বীপে যায়, সেখানে তার জন্য যেন অপেক্ষা ক'রে ছিলেন দিবানাথ, তাঁর আশ্রয়েই সাক্ষাৎ হয় ভিক্ষু মিত্রানন্দের সঙ্গে।

বসন্তদাসের মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনে নবীন ভিক্ষু মিত্রানন্দ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিঃসংকোচে বলে, মহাশয়, আপনি সর্বনাশ করেছেন—আপনার শাস্তি হওয়া উচিত।

তীব্র উৎকণ্ঠা তখন বসন্তদাসের মনে, কলহে প্রবৃত্তি ছিলো না। তথাপি বলে, মহাশয় অহেতুক ক্ষিপ্ত হচ্ছেন, আপনি ভিক্ষু, ক্রোধ আপনাতে শোভা পায় না।

ঐ কথায় মিত্রানন্দ সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বলে, ক্রোধের এখনই আপনি কি দেখেছেন, ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন—অপেক্ষা করুন।

ভ্রাতঃ আমি তো বুঝলাম না আমার অপরাধ কোথায়! বসন্তদাস বিনয় ত্যাগ করে না।

আপনি তিনটি তরুণীর সর্বনাশ করেছেন, মিত্রানন্দ তীব্রস্বরে বলে, আমাদের মহান একটি কার্য-সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন, তথাপি বলছেন, আপনার অপরাধ নেই? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।

কিন্তু আমি তো তাঁদের কিছু করতে বলিনি—তাঁরাই আমাকে আমন্ত্রণ করে গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চুপ করুন, লোভী, লম্পট, মিথ্যাচারী!

বসন্তদাস দেখলো, এ ভারী অদ্ভুত কাণ্ড। ক্রোধে মিত্রানন্দের একেবারে হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। সে বললো, মহাশয়, আপনার মুখে সংযম আনুন, না হলে আমিও অসংযমী হয়ে উঠতে পারি।

মিত্রানন্দ আরও কী বলতো কে জানে! ঐ সময় দিবানাথ মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এ কী করছেন আপনারা—ছি-ছি—বিপদে মানুষকে ধীরস্থির থাকতে হয়, আপনারা ধৈর্যহারা হয়ে যদি কলহ করতে থাকেন, তাহলে লাভ কার হবে? এখন না আপনাদের উচিত বিপর্যয় কতখানি হয়েছে সেইটি জানা, আর তা না করে আপনারা কলহে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

এ কথায় মিত্রানন্দের যেন সম্বিৎ হয়। সে নত মুখে ঐ স্থান ত্যাগ করে। দিবানাথ জানালেন, আমি এখনই নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করছি—সংবাদ নিয়ে আসি—প্রকৃত ঘটনা কী।

দিবানাথ প্রত্যাগমন করলেন সন্ধ্যাকালে। জানালেন, বিভাবতী ও শুক্লা প্রাসাদে বন্দিনী—শত পীড়নেও তারা কোনো কথা প্রকাশ করেনি—আর কৃষ্ণার কোনো সংবাদ নেই, কেউই তার সংবাদ জানে না।

আরও সংবাদ এই যে, মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, নগরীর গৃহে গৃহে সন্ধান করা হচ্ছে—মিত্রানন্দ এবং বসন্তদাসকে চাই—সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

কৃষ্ণার সংবাদ নেই শুনে বসন্তদাস বিচলিত হয়। কৃষ্ণার মুখখানি সে বিস্মৃত হতে পারছিলো না। তার উচ্ছল হাসি, কপট ক্রোধের ভ্রূ-ভঙ্গি, তার প্রগাঢ় আলিঙ্গন, তার আশ্লেষ গভীর চুম্বন এবং অশ্রু উদ্বেলিত অথচ হাস্যমুখরিত বিদায় জ্ঞাপন—সমস্তই বারংবার তার মনে পড়ছিলো। কে জানে, হয়তো শক্তিবর্মণের অনুচরেরা এতোক্ষণে তার দেহটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যাকাশের উজ্জ্বল তারকাটির দিকে দৃষ্টি রেখে

সে উচ্চারণ করে, কৃষ্ণা ক্ষমা ক'রো—আমি তোমার অক্ষম প্রণয়ী, তোমাকে রক্ষা না করে আমি পলায়ন করে এসেছি।

মিত্রানন্দ সন্ধ্যাকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলো। তার চিন্তা ভিন্ন। তার চিন্তা হচ্ছিল, বিপুল একটি উপপ্লব কি সত্যই আসন্ন? দাসত্ব ও লাঞ্ছনা থেকে মানুষ কি মুক্তি পেতে চলেছে? মনের আকাঙ্ক্ষা কি এখন বিশ্বাসে পরিণত হবার পথে? না হলে ঐ তিনটি মন্দিরবাসী যুবতী কেন বিপজ্জনক সহযোগিতাদান করতে এসেছিলো?

মিত্রানন্দের কষ্ট হয় বিভাবতী ও তার সহচরী তরুণী দু'টির জন্য। আবার সেই সঙ্গে আশাও গভীরতর হয়। মনে হয়, ঐ তিন মন্দিরবাসীর আত্মাহুতি মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত করে আনছে।

সে বসন্তদাসের কাছে যায়। বসন্তদাসের মুখে বিষাদের ছায়া দেখে বলে, মিত্র বসন্ত, দুঃখ করবেন না—যুদ্ধ আরম্ভ হলে আঘাত তো আসবেই—মনে করুন, এ সেই প্রকারেরই একটি আঘাত।

বসন্তদাস জানায়, আমি তো যুদ্ধ চাইনি, কোথায় যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কিছুই জানি না—আমি সাধারণ মানুষ। কৃষ্ণাদেরও কি যুদ্ধ প্রয়োজন ছিলো? আমি বুঝি না ভিক্ষু মিত্রানন্দ, কেন এই দ্রোহ উত্থাপনের প্রস্তাবনা, এতে তো মৃত্যু এবং ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছুই আমি দেখছি না।

মিত্রানন্দের সন্দেহ হয়, তবে কি এই লোকটি তাদের কাজের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন, কোনো সংবাদই জানে না? তাহলে দিবানাথের গৃহেই বা তার আশ্রয় কেন হলো? সে নিশ্চিত হতে পারে না।

তথাপি সে বলে, বসন্তদাস, আমি জানি না, আপনি কী চিন্তা করেন। কিন্তু নিজের জীবনের কথা কখনও ভেবেছেন? আপনার, আপনার পিতার, আপনার পিতামহের? মনে হয় না কি আপনি পুরুষানুক্রমে দাস? সামন্তপতির দাস, কায়স্থের দাস? আপনার কি ভগবান আছে? আপনি ভগবানের পূজা করতে পারেন? চণ্ডালদের কথা চিন্তা করুন, ডোম হড্‌ডিদের কথা চিন্তা করুন। নিম্নশূদ্রে কত বর্ণ ভেবে দেখেছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ, একে অপরের ওপর লাঞ্ছনা করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে। আপনি কি লুণ্ঠিত হননি, বলুন? সামন্তপতি যে আপনার সমস্ত কিছু অপহরণ করলো, তার প্রতিকার কোথায়?

মিত্রানন্দের কথায় বসন্তদাসের প্রত্যয় হয় না। তার মনে হয় না যে এতো সরলভাবে প্রশ্নগুলি করা যায়। সে বলে, এভাবে প্রশ্ন করলে তো সমাধান পাওয়া যাবে না। রাজপুরুষ অত্যাচারী হলে রাজার কাছে যেতে হবে—সে জন্য দ্রোহের প্রয়োজন নেই। আর শ্রেণীর কথা বলেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র এক হতে পারে কখনও? ভগবান যদি কারও জন্য শূদ্র জন্ম নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে শূদ্রের কাজই তার কর্তব্য। সে কেন ব্রাহ্মণের কাজ করতে যাবে? সকলেই কি রাজা হয়? যার সৌভাগ্য ভগবান নির্দিষ্ট করে দেন সে-ই রাজা হয়। মনে করুন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও সেইরূপ।

আপনি যুক্তির কথা বলুন—আপনি তো দেখছি বিশ্বাসের কথা বলছেন?

না যুক্তি আমারও আছে, বসন্তদাস জানায়। বলে, সৎকার্য যে করে, সৎ জীবন যে যাপন করে, জ্ঞানালোচনা করে, যে মানুষকে পথ নির্দেশ করে, সে মানুষকে আমি শ্রেষ্ঠ বলবো না? ব্রাহ্মণ তো সেই বিচারেই শ্রেষ্ঠ। নীচ-স্বভাব যে, হীন যে, যার মুখে সর্বদা মিথ্যা ভাষণ, যে তস্কর—সেই লোক এবং ব্রাহ্মণ এক হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আমারও সেই কথা, মিত্রানন্দ স্বীকার করে। বলে, শ্রেষ্ঠমানব তার গুণে, জন্মে নয়, কুলক্রমে নয়। যদি কোনো ব্রাহ্মণ লুণ্ঠন করে, হত্যা করে, আপাদমস্তক যে লম্পট, তাকে আমি ব্রাহ্মণ কেন বলতে যাবো? বাস্তবে আমরা কী দেখি, বলুন? সকল ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করে? ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য প্রজা পালন, সে কি প্রজা পালন করে? আবার দেখুন, আপনি পুরুষানুক্রমে সৎ জীবনযাপন করলেও ব্রাহ্মণ হতে পারবেন না।

বসন্তদাস তথাপি সংশয়মুক্ত হতে পারে না। বলে, মিত্রানন্দ শ্রেণীভেদের এ বিধান সনাতন—হঠাৎ পরিবর্তন করতে চাইলেই পরিবর্তন হবে না। সদ্ধর্মী বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণব্রাহ্মণ ভেদ লুপ্ত করতে পারেনি।

এই প্রশ্নে সদ্ধর্মীরা দুর্বল, মিত্রানন্দ জানে। তাই সে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণ প্রশ্নে ভগবান তথাগতের কথা স্মরণ করে। তার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণব্রাহ্মণে যে ভেদ করে, সে প্রকৃত সদ্ধর্মী নয়। সেই একই কথা সে বসন্তদাসকে জানালো, বললো, মানুষের অপমান যদি কোনো সদ্ধর্মী কখনও সমর্থন করে, তাহলে বুঝবেন, সে সদ্ধর্মী নয়।

সে না হয় হলো, বসন্তদাস এবার সহজ হয়। বলে, ধরে নিলাম দ্রোহের পতাকা উত্থাপিত হলো, রাজাও হলো নতুন—কিন্তু তারপর? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির আধিপত্য না থাকলেও অন্য কোনো শ্রেণীর আধিপত্য যে থাকবে না—তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? তথাগত ধর্ম তো সর্বত্রই ছিলো একদা—সেইকালে কি সামন্ত মহাসামন্তদের দৌরাত্ম্য ছিলো না? চণ্ডাল ডোমেরা কি তখনও নিগৃহীত হয়নি? বলুন আপনি?

মিত্রানন্দ কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অবিচল। সে হাসে। বলে, প্রশ্নটা ধর্মীয়, যৌক্তিকতার নয় বসন্তদাস, প্রশ্নটা হলো মানব মুক্তির, মানব মুক্তির পথে যা অন্তরায় তা-ই অধর্ম এবং পরিত্যাজ্য—আমাদের এই দৃষ্টিতে সমগ্র বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে।

বসন্তদাস বিভ্রান্ত বোধ করে। বলে, আপনি যা বলছেন তা আমার ধারণায় আসে না। মুক্তি কথাটি তো বিপজ্জনক—কোন বন্ধন থেকে মুক্তি সেটার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি বিধিমালা আপনার থাকতে হবে—তার অর্থ আর একখানি অর্থশাস্ত্র। মানব মুক্তি তো বায়বীয় ব্যাপার হয়ে থাকলে চলবে না। এবং তখনই আপনার কার্যক্রমের ভিত্তিটি লোকে পেতে চাইবে—সেখানেই আসে ধর্ম এবং শাস্ত্র। বলতে হবে, আপনার ধর্ম কি প্রকার—বলতে হবে, সমাজ কি প্রকার—বলতে হবে, ধন ব্যবস্থা কি প্রকার—মিত্রানন্দ, তাই বলছিলাম, যত সরল ও সহজভাবে আমরা প্রশ্নগুলি তুলছি—এগুলি এত সহজ ও সরল নয়।

আপনি কি তাহলে বিশ্বাস করেন, যে ব্যবস্থা এখন প্রচলিত, তাতেই মানুষ সুখী হবে? তাতেই জীবনের বিকাশ ধারা প্রবাহিত হবে? মিত্রানন্দ এবার স্পষ্ট উত্তর চায়।

না, আমি প্রচলিত ব্যবস্থায় তুষ্ট নই, বসন্তদাস জানায়। বলে, আমি জানি এই ব্যবস্থা আমার ধনার্জনের পথ উন্মুক্ত রাখেনি, আমাকে বিদ্যার্জন করতে দেয়নি—এমনকি, আমার মতো একজন সাধারণ মানুষও যে নিরুপদ্রব সংসার জীবনযাপন করবে, তারও কোনো সুযোগ সৃষ্টি করেনি—আমি প্রচলিত ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করতে চাই—কিন্তু এও আমি জানতে চাই যে, পরিবর্তে আমি কী পাবো।

মিত্রানন্দ হাসে। বলে, জীবনের প্রক্রিয়ায় পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস হবে বন্ধু, নতুন সৃষ্টি হোক অথবা না হোক।

না, তা সম্ভব নয়, বসন্তদাস জানায়, শূন্যতায় জীবন বিধৃত থাকে না।

তাহলে কি বলতে চান, তৃতীয় কোনো শক্তির আগমন ঘটবে? যার মধ্য দিয়ে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র সর্বত্র নতুন বিন্যাসের সূচনা হবে?

বসন্তদাস সচকিত হয়, এ কোন কথা বলছে মিত্রানন্দ? তাঁর মনে ঐ তৃতীয় শক্তির কথাটি বিদ্ধ হয়ে যায়। সে আর কিছু বলে না। মিত্রানন্দের মুখপানে চায়। লক্ষ্য ক'রে দেখে, সেখানে দুরভিসন্ধির কোনো ছায়াপাত দেখা যায় কিনা। দেখে, কোনো ছায়া নেই মিত্রানন্দের মুখে। সহজ, স্বচ্ছ, তপশ্চর্যায় শান্ত পবিত্র একখানি মুখ। তবু অস্বস্তি বোধ হয় তার। এবং তখন সে জানতে চায়, ভিক্ষু মিত্রানন্দ, সত্য সত্যই কি তৃতীয় শক্তির কথা আপনারা চিন্তা করেছেন?

না বসন্ত, সে কথা আমি জানি না, বিশ্বাস করুন। তবে আমার মনে হয়, বর্তমান ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত—না হলে জীবনের বিকাশ অসম্ভব। আমরা মানুষকে স্বপরিচয়ে উত্থিত হতে বলছি, নতজানু দাসত্বের জড়তা থেকে মুক্ত হতে বলছি—আমি এই পর্যন্ত জানি—এর অধিক আমার জানা নেই।

মিত্রানন্দ একখানি গোপন পত্র বহন করছে। পট্টিকেরা রাজ্যের যুবরাজ রণবঙ্কমল্লদের রচিত ঐ পত্রখানি তুলে দিতে হবে মহাভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দের হাতে। তিনি এখন কোথায় সে সংবাদটিও জানা নেই। পুণ্ড্রবর্ধনে গেলে তবে জানা যাবে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারে এখনও অবস্থান করছেন, না জগদ্দল মহাবিহারে প্রস্থান করেছেন। ঐ পত্রের বিষয় কী তা সে জানে না। সে বাহক মাত্র, পত্রের বিষয় তার জানবার কথা নয়। তবে এটুকু সে অনুমান করতে পারে যে রণবঙ্কমল্লদের তাঁর নিজস্ব কোনো অভিমত জানিয়েছেন। ভিক্ষু শুদ্ধানন্দ যে সংবাদ অথবা প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন তারই প্রত্যুত্তরে এই অভিমত। এই অভিমত বিচার করেই ভিক্ষুসংঘ সিদ্ধান্ত নেবে। কী সিদ্ধান্ত হতে পারে তাও সে অনুমান করতে পারে না। তবে নিজে যখন ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে, তখন অবশ্যই জানতে পাবে কী সিদ্ধান্ত হলো শেষ পর্যন্ত। সে অস্থির হয় না।

বালিগ্রামে মন্দিরদাসীদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে তা জানবার জন্য দিন দুই অপেক্ষা ক'রে অবশেষে মিত্রানন্দের সঙ্গে বসন্তদাস যাত্রা করলো। এবার গন্তব্য

পুণ্ড্রনগর, সে স্থান থেকে সংবাদ নিয়ে মিত্রানন্দকে যেতে হবে জগদ্দল অথবা বিক্রমশীলা আর বসন্তদাস যাবে স্বগৃহে।

আর কোনো ঘটনা ঘটেনি পথিমধ্যে। বিলম্বও হয়নি। পথিমধ্যে দুই বন্ধুর আলাপ হয়েছে জগতের নানান বিষয় নিয়ে। ক্রমে বন্ধুত্ব হয়েছে গাঢ়—সম্বোধন নেমে এসেছে তুমিতে। বসন্তদাস এখন অন্য মানুষ। গৃহ ত্যাগের সময় যে বসন্তের মনে চিন্তা ছিলো কি উপায়ে সে ধনী বণিক হবে, এখন সেই বসন্তের মনে ভিন্ন চিন্তা। তার দৃষ্টি এখন মানবজীবনের লাঞ্ছনা, অপমান এবং দাসত্বের দিকে। মনে এখন জ্বালা ও বেদনা। সেই সঙ্গে আর একটি নতুন ভাব জন্ম নিয়েছে মনে। অসহায় মানুষ দেখলে সে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও করুণার্দ্র হয়ে ওঠে।

অবশেষে, দীর্ঘ পথ পরিক্রমা ক'রে, প্রায় অর্ধ-বর্ষকাল শেষে, বসন্তদাস পত্নী মায়াবতীর কাছে প্রত্যাগমন করলো।

কিন্তু আমরা জানি, বসন্তদাস যুবতী স্ত্রী মায়াবতীর বাহুবন্ধনে বাঁধা থাকতে পারেনি। কেননা তার স্বল্পকাল পূর্বে ঘটেছিলো পিপ্পলী হাটের ঘটনা। ফলে বসন্তদাসের গৃহীর জীবনযাপন আর হলো না। ভয়ানক দুষ্কাল তাকে তাড়িত করছে—তার সাধ্য কি যে সে গৃহ-সুখের আস্বাদ ভোগ করবে।

পথ যে দীর্ঘ তা অনুমানে জানা ছিল। কিন্তু তা যে এতো দীর্ঘ কল্পনা করেনি কখনও। প্রথমে পদব্রজে, অতঃপর গো-শকটে। শেষে নৌকায়। অপরিচিত জনপদ, কেউ প্রশ্ন করে না, তোমাদের সম্পর্কটি কি? প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? লীলা প্রায় দেহলগ্ন হয়ে বসে। অবগুণ্ঠনটি দীর্ঘ করে নববধূর মতো, আর সর্বক্ষণই প্রায় নীরব সে। চকিতে কখনও মুখখানি দেখা গেলে, কিংবা তার মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও কিছুই বোধগম্য হয় না। ফলে সকলেই সরল অনুমানটিই করে। মনে করে, নববধূ স্বামীগৃহে চলেছে।

তবে বিপদ হয়েছিলো আত্রেয়ী তীরের একটি গ্রামে। সেদিন ছিলো গ্রামের হাট। ক্ষুদ্র পান্থশালাটিতে স্থান ছিলো না। মন্দিরেও স্থান পাওয়া গেলো না। মহাসমস্যা, কোথায় রাত্রিযাপন করে। এদিকে রাত্রি গভীরতর হচ্ছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি ইত্যাদির ভারে দেহ আর চলে না। এমন সময় পান্থশালার প্রৌঢ় অধিকারীটি ডাকলেন। বললেন, আপনারা আমার গৃহে চলুন, সেখানে আপনাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হবে।

ব্যবস্থাটি অভাবিতপূর্ব, বহির্বাটির একটি সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ পাওয়া গেলো—এমনকি তৈল প্রদীপটি পর্যন্ত। ফলাহারের উপকরণাদি তারা সঙ্গে বহন করে—সুতরাং আহার পর্ব সহজেই সমাধা হলো। তারপরই নিদ্রা চাই। কিন্তু শয্যা মাত্র একখানিই এবং তা এতোই ক্ষুদ্র যে একাধিক লোকের, স্বামী স্ত্রী না হলে, স্থান সংকুলান অসম্ভব। পূর্বে এমন অবস্থা হয়নি। কারণ পথিমধ্যে যে দু'দিন রাত্রিযাপন করেছে সে দু'দিন লীলাবতীর স্থান হয়েছে অন্তঃপুরে। বলা যায়, দু'জনে এক প্রকোষ্ঠে রাত্রিযাপন এই প্রথম। শ্যামাঙ্গ কোনো প্রকার চিন্তা না ক'রে দ্বারের কাছে ভূমিতে লম্বমান হলো। লীলাকে শয্যাখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, তুমি ঐখানে শয়ন করো।

লীলাবতী কিছু বললো না। স্থাণু মূর্তির মতো দীর্ঘক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্যামাঙ্গ কী বলবে ভেবে পায় না। যদি সে শয্যায় শয়ন করে, তাহলে লীলাবতীর ধারণা হবে যে সে লোভী এবং সুযোগ সন্ধানী, আর যদি ভূমিতে রাত্রিযাপন করে, তাহলে লীলাবতী শয্যায় শয়ান হয়ে সমস্ত রাত্রি অস্বস্তি বোধ করবে। সে পুনরায় বললো, লীলা, তুমি শয়ন করো, রাত্রি গভীর হয়েছে।

লীলাবতী গুণ্ঠন উন্মোচন করে বলে, তুমি শয়ন করবে ভূমিতে আর আমি শয়ন করবো শয্যায়? এ কথা চিন্তা করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

এ তো মহাজ্বালা! শ্যামাঙ্গ উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি আমাকে কী করতে বলো?

তুমি শয্যায় শয়ন করো, আমি ভূমিতে থাকি।

তোমার এ ব্যবস্থাই বা আমি মানবো কেন?

শ্যামাঙ্গের এই কথায় লীলাবতী ঈষৎ কুপিতা হয়। বলে, উত্তম কথা, তুমি মেনো না—এসো, তাহলে অশ্বের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে নিদ্রা যাই।

না, তা কেন?

কেন নয়, তাহলে কি বলতে চাও দু'জনেই এক শয্যায় রাত্রিযাপন করবো? যদি ঐরূপই তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহলে বলো—আমি সেইভাবে রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্তুত হই।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মধ্যরাত্রে বাদানুবাদে শ্যামাঙ্গের প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না। তার চক্ষু দু'টি মুদিত হয়ে আসছিলো। ফলে আর সে কথা বললো না, শয্যায় নিজেকে নিক্ষেপ করলো—এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, বলা যায়, সে নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেলো।

তৈলদীপ কখন নির্বাপিত হয়েছে জানে না। গভীর রাত্রে অনুভব করলো একখানি কোমল হাত তার কেশ বিলুলিত করছে। সে নিদ্রার ভান করে রইলো। এক সময় অনুভব হলো, হাত নয়, দু'টি ওষ্ঠ তার কপাল চুম্বন করছে। এবং ঐ মুহূর্তে সে দু'বাহুতে গলদেশ বেষ্টন করে নিজের মুখখানি লীলাবতীর পরিপূর্ণ বক্ষে নিমজ্জিত করলো। শ্যামাঙ্গের ঐ আচরণে মুহূর্তের জন্য যেন বিমূঢ় হলো লীলাবতী। সজোরে নিজেকে মুক্ত করে ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, ছাড়ো আমাকে শ্যামাঙ্গ, আমাকে তুমি এভাবে প্রলুব্ধ ক'রো না।

ঐ মুহূর্তে দুই বিন্দু অশ্রু কপোলে এসে পড়লে সে চমকিত হয়। বলে, কি ব্যাপার, লীলা, তুমি কাঁদছো কেন?

রুদ্ধবাক লীলার দমিত কান্না ঐ কথার পর যেন সকল সংযমের বাধা অতিক্রম করে। সে শ্যামাঙ্গের বক্ষে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। শ্যামাঙ্গ নির্বাক। সর্বস্বহৃতা এই রমণীকে সে কী বলবে? আত্মীয়-পরিজনহীন, বর্তমান ভবিষ্যৎহীন, এই নারীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কি কোনো ভাষা রচিত হয়েছে কোথাও? সে জানে না। বারংবার সে একটি কথাই বলতে পারলো। আর তা হলো, কেঁদো না লীলা, জীবন যেভাবে এসেছে সেভাবেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে—না হলে আমাদের মরণ।

গবাক্ষ পথে চন্দ্রালোকের আভা প্রকোষ্ঠে আসছিলো। তাতে লীলার অশ্রুসিক্ত মুখখানি, উজ্জ্বল চোখ দু'টি, চন্দ্রকলার মতো কপালখানি, ভারী সুন্দর হয়ে অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠলো। কান্নায় তার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হলো বারেক, বারেক তার অশ্রুময় চোখের দৃষ্টি বাহিরের শীতল জ্যোৎস্নায় অবগাহন করলো—তারপর সে বললো, শ্যামাঙ্গ, তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাও—আমার ক্ষমতা নেই যে আমি তোমাকে গ্রহণ করি—যখনই তুমি আমার দিকে চাও, তখনই নিজেকে অপরাধী মনে হয়—কিন্তু তবু আমি নিজেকে নিঃশেষে দান করতে পারি না। কখনও দেহ উন্মুখ হয়, কখনও মন। বড় জটিল অবস্থা আমার—তুমি আমাকে ত্যাগ করো।

শ্যামাঙ্গ হাসে। বলে উত্তম কথা, ত্যাগ না হয় করলাম। অতঃপর তুমি কোথায় যাবে?

আমি জানি না, শ্যামাঙ্গ, পুনর্বার লীলার কান্না উদ্বেলিত হয়। বলে, যখনই তুমি আমার দেহে হাত রাখো, তখনই যেন মনে হয় এক লম্পট আমার দেহে হাত রাখছে। যখনই তুমি আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাও, মনে হয় তুমি দেহ সম্ভোগের পরিকল্পনা করছো। মনে হয়, কেবল ঐ একটি কারণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলেছো তুমি। বরং তুমি যদি এমন না হয়ে অন্যদের মতো হতে, যদি কোনো বাধা না মেনে আমাকে বলাৎকার করতে—তাহলে যেন ছিলো ভালো। আমি তোমাকে ভাবতে পারতাম লম্পট, লোভী এবং স্বার্থান্বেষী ব'লে, এবং তাহলে তোমাকে আমি ঘৃণা করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তুমি তা নও। তুমি এতো ভালো, মুখপানে চাইলে তোমার পদতলে নিজেকে নিবেদন করার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নিকটে গেলেই আর পারি না। তুমি যাও প্রিয়তম। আমার ললাটে যা আছে তাই হবে—আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচার করতে পারবো না।

ঐ সময় শ্যামাঙ্গ উঠে ব'সে লীলাবতীর স্কন্ধে হাত রাখে। বলে, তুমি কি উন্মাদিনী হয়েছো? এমন অদ্ভুত কথা কেন বলছো? দেখো আমার চক্ষু দু'টির দিকে। এই মুহূর্তে আমার কী ইচ্ছা করছে, জানো? ইচ্ছা করছে তোমাকে চুম্বন করি, বক্ষে পিষ্ট করি এবং তারপর প্রাণভ'রে তোমাকে সম্ভোগ করি—কিন্তু আমি তা করছি না—কারণ জানো?

কী? বলো, কী? লীলাবতীর চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্যামাঙ্গ জানায়, আমি যে তোমাকে হৃদয় দান করেছি—আমি কেন লম্পটের মতো অপহরণ করবো? প্রেম নিঃশেষে নিবেদন করার—তাই আমি অপেক্ষা করে আছি।

ব'লো না শ্যামাঙ্গ। ওভাবে ব'লো না—আমি জটিল হয়ে পড়েছি—আমাকে উন্মাদিনী জ্ঞান ক'রে ত্যাগ করো।

তবে রে রমণী, ফের ঐ কথা? হঠাৎ শ্যামাঙ্গ ক্রোধের ভান করে। বলে, দেখ্ তবে জীবন কাকে বলে—এই বলতে বলতে সে দু'বাহুতে সজোরে বেষ্টন করে লীলাবতীকে এবং তারপর তার অধরোষ্ঠে পরিপূর্ণ এবং দীর্ঘ একটি চুম্বন দান করে।

ঐ পর্যন্তই—লীলাবতীর সমগ্র অস্তিত্ব স্তব্ধ হয়ে যায়—আকাঙ্ক্ষায় না ঘৃণায় বলা দুষ্কর। শ্যামাঙ্গ আর অগ্রসর হয় না। সে শয্যায় দেহ রাখে এবং লীলাবতী তার ভূমি-শয্যায় ফিরে যায়।

পরদিন তারা শয্যা ত্যাগ করে বিলম্বে। প্রকোষ্ঠের বাইরে এসে দাঁড়ালে অধিকারীটি সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, মহাশয়ের বোধ হয় জাগরণে রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে?

শ্যামাঙ্গের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। জানতে চায়, কেন—একথা কেন বলছেন—কেন আমরা রাত্রি জাগরণ করবো?

হেঁ হেঁ হেঁ, ক্রুদ্ধ হবেন না মহাশয়, লোকটি বিনয়ে বিগলিত হতে আরম্ভ করে। বলে, সমস্ত রাত্রি আপনারা আলাপ করেছেন তো, তাই বলছি—

শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করে প্রৌঢ়টির দৃষ্টি যেমন, তেমনি হাসিটিও কদর্য। তার ক্রোধ হয়। বলে, আপনি দেখছি ছিদ্রান্বেষী—ছিদ্রপথে অন্যের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে থাকেন।

না না ওকথা বলবেন না, আমার বয়স হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন—

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, বৃদ্ধ শালিক পক্ষীর গ্রীবায় নতুন পালকের উদগম হয়েছে, শ্যামাঙ্গ নিজেকে সংযত রাখতে পারে না।

হেঁ হেঁ আপনি দেখছি রসিকও, প্রৌঢ়টির চাটুকারিতা দেখবার মতো। লীলাবতীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলে, তা ইনি কি আপনার বিবাহিতা পত্নী?

শ্যামাঙ্গ বুঝলো, লোকটি অসম্ভব ধূর্ত এবং বদ-স্বভাব। সে সংযত হলো, কে জানে, এই বদলোক কোন গোলযোগ সৃষ্টি করে। বললো, ইনি আমার সহধর্মিণী—আমরা যোগব্রতী।

হেঁ হেঁ, তাই বলুন, আমার সন্দেহ তাহলে অমূলক নয়—আপনারা যোগী। যোগ সাধনায় সঙ্গিনীর অবশ্যই প্রয়োজন, হেঁ হেঁ—তা এই কথাটা পূর্বে বললে হতো না?

কোন কথা? শ্যামাঙ্গ বিভ্রান্ত বোধ করে।

এই যে, আপনারা যোগী, আমার গৃহে রাত্রিকালে যোগ সাধনা করবেন? ছি ছি কি অনাচার। এখন আমাকে গৃহশুদ্ধি করতে হবে। দেখুন তো, আপনারা আমার কি সর্বনাশ করেছেন?

শ্যামাঙ্গ অনুমান করে প্রৌঢ়টি তাকে বিপদাপন্ন করবে। সে বললো, মহাশয়, এতো বিচলিত হচ্ছেন কেন? আমরা তো রাত্রিযাপনের জন্য অর্থ দিচ্ছিই, সেই সঙ্গে না হয় আরও কিছু অধিক দেবো।

ঐ কথায় কাজ হয়, প্রৌঢ়টি শান্ত হয়। কিন্তু তার মুখ শান্ত হয় না। তখন তার আবার অন্যরূপ বিনয়। বলতে লাগলো, আমার দোষ নেবেন না মহাশয়, গৃহশুদ্ধি আমাদের বাধ্য হয়ে করতে হয়—এ গ্রামের সমাজপতিরা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অত্যধিক তৎপর থাকেন। সামান্য ত্রুটি হলেই তাঁরা সমাজে পতিত ঘোষণা করে দেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন...

শ্যামাঙ্গ জানতে চাইলো—তা আপনারা কি শূদ্রের মধ্যেও জলাচল শ্রেণীভেদ করে রেখেছেন নাকি?

না তা করিনি?

তাহলে যোগী স্পর্শে গৃহশুদ্ধি করতে হবে কেন?

আমি তো বৈশ্য, অম্বোষ্ঠ বৈশ্য।

শ্যামাঙ্গের বিশ্বাস হতে চায় না। বলে, আপনি অম্বোষ্ঠ বৈশ্য হলে পান্থশালার রক্ষক হন কি প্রকারে?

মহাশয় আর বলবেন না, সবই সমাজপতিদের ইচ্ছা। সামাজিক যতো বিধান, সবই তাঁদের প্রয়োজনে। ব্রাহ্মণ যখন কুলবৃত্তি যজ্ঞ-যাজনাদি ত্যাগ ক'রে রাজকার্য করে, তখন কেউ তাদের দোষ দেয় না, বরং ঐ নববৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নতুন কুলের উদ্ভাবন করা হয়। ব্রাহ্মণ হয়ে যায় ব্রহ্মক্ষত্রিয়—আমার ক্ষেত্রেও ঐ প্রকার ব্যবস্থা হয়েছে আর কি! গ্রামপতি ও ব্রাহ্মণরা বলেছেন যে, তোমার পান্থশালা-রক্ষক হতে বাধা নেই। কারণ তোমার বৈদ্য পিতা যা করেন, তোমার কাজও তাই। তিনি রুগ্ন মানুষের সেবা করেন আর তুমি করবে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের সেবা—সুতরাং বাধা কোথায়? তাই অম্বোষ্ঠ বৈশ্য হয়েও আমরা পান্থশালার অধিকারী।

শ্যামাঙ্গ ততক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছে—আর এক মুহূর্ত নয় এ স্থানে। প্রৌঢ়ের কথা শেষ হলে সে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ঊর্ধ্বে তুলে বললো, আপনারা প্রকৃত কী, জানেন? আপনারা হচ্ছেন অশ্বডিম্ব—বুঝলেন? উৎকৃষ্ট এবং সুগোলাকার একটি অশ্বডিম্ব।

প্রাপ্তিটি অভাবিতপূর্ব এবং অত্যধিক। এক রাত্রির জন্য একেবারে একটি সম্পূর্ণ মুদ্রা! প্রৌঢ়টি সবিস্ময়ে নিজের প্রসারিত হস্তপানে চেয়ে থাকে। তার ধারণা হয়, লোকটি নিশ্চয়ই উন্মাদ।

পথে লীলাবতী জানায়, দেখলে তো আমাদের স্থান কোথায়? গৃহে অবস্থান করলে লোকে গৃহশুদ্ধি করে।

সে তো করবেই, যোগীদের অনেকেই ঘৃণ্য মনে করে। তুমি যোগী—এই পরিচয় ব্যতিরেকে অন্য আর কী পরিচয় দিতে পারতে?

কেন স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিলে হতো না?

শ্যামাঙ্গ হতচকিত হয়। তার ধারণা ছিলো না যে ঐ পরিচয়দানের জন্য লীলাবতী এখন প্রস্তুত! বললো, উত্তম কথা, এবার থেকে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়টিই প্রচার করবো।

করতোয়া তীরে এসে উপনীত হয় তারা এক প্রকার নির্বিঘ্নেই। নদীতীরেই একখানি গ্রাম, সেখানে কুম্ভকারদের বাস। ঐ গ্রামে সহজেই তারা স্থান পায়। প্রবীণ কুম্ভকার অবনীদাস সম্পন্ন গৃহস্থ! তাঁরই আশ্রয়, কুটিরটিও তাঁরই। অবনীদাসের লোকের প্রয়োজন ছিলো, তাই তিনি শ্যামাঙ্গকে সাদরে স্থান দিয়েছেন।

বর্ষা গত হয়েছে, শরৎ আসন্ন, তাই ব্যস্ততাও অধিক। মধুপুর গ্রামখানি পুন্ড্রনগরী থেকে মাত্রই দুই ক্রোশ। ফলে নগরীর প্রয়োজনীয় তৈজসাদি অধিকাংশই এই গ্রাম থেকে যায়।

শ্যামাঙ্গ সহজেই নিজেকে কর্মব্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত করে। বাহির থেকে মনে হয়, দম্পতিটির জীবন ভারী সুখী। নবীনা গৃহিণীটি সর্বক্ষণ সংসার-কর্মে ব্যস্ত। কখনও অঙ্গন লেপন করছে, কখনও নদী থেকে জল আনছে, কখনও রন্ধন করছে। প্রতিবেশিনীরা দেখে বধূটি নিতান্তই স্বল্পভাষিণী। প্রশ্ন ব্যতিরেকে কোনো কথাই বলে না। যদি পিতৃগৃহের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তার ক্ষুদ্র উত্তর, আমার পিতা-মাতা নেই, কেবল একজন মাতুল আছেন। শ্বশুরগৃহের কথা জানতে চাইলে বলে, তাঁরাও গত হয়েছেন, আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য। বিবাহ কতোদিন, সন্তানাদি কি একেবারেই হয়নি, দেশত্যাগ কেন করেছো—ইত্যাকার প্রশ্ন হলে সে উত্তর দেয় না, অধোমুখে নিজ কাজে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে।

দিবসকালে সে কুটিরটির দ্বার কৃচিৎ উন্মুক্ত রাখে। যখনই দেখো, তার কুটির দ্বারে অর্গল। কেন সে কুটির দ্বার রুদ্ধ রাখে নিজেও জানে না। তার অস্পষ্ট কেমন একটি ধারণা হয়েছে যে, অন্তঃপুরে কী আছে তা অন্যলোকের দৃশ্যগোচর করা অনুচিত। কিন্তু নারীর স্বভাবে যে এক প্রকার দুর্নিবার কৌতূহল আছে, সে ঐ কৌতূহল নিবৃত্ত করবে কোন্ উপায়ে? অবনীদাসের নববিবাহিতা কন্যাটি এসে যখন বলে, ভগিনী, তোমার কুটিরে চলো, নিভৃতে দু'টি কথা বলি—তখন সে বিপদে পড়ে। বহু ছলনা ক'রে সুকৌশলে সে তখন প্রভু কন্যার মনকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? মনে প্রশ্ন জাগে।

শয়নগৃহে এলে এমন কিছু দেখতো না। রাত্রিকালে তারা শয়ন করে এক শয্যায় না দু'শয্যায় এই সংবাদ দিবাভাগে আর কে জানতে পারছে? তথাপি লীলার মনে হয়, এভাবে আর কতোদিন?

শ্যামাঙ্গেরও দুশ্চিন্তা হয় একেকদিন। কেননা নিজেকে একেবারেই অপরিচিত রাখবে এমন আশা আর করা যাচ্ছে না। বিল্বমূলের এক কুম্ভকার একদা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি সামন্তপতি সুধীমিত্রের বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের সময় আমাদের গ্রামে ছিলেন না? আর একদিন একজন আগন্তুক বললো, আপনাকে তো আমি জানি, কুসুম্বী গ্রামে আপনি মনোহরদাসের গৃহে ছিলেন, আপনি কি এখনও পুত্তলি গঠন করেন?

এইভাবে হঠাৎ দু'একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আর তাতেই দুশ্চিন্তা হয়। সে অনুভব করে, পরিচয় গোপন ক'রে এক স্থানে অবস্থান করা প্রকৃতই কঠিন কাজ। যদি স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতো, পরিধানে থাকতো যোগীবেশ, তাহলে কথা ছিলো না। জীবনযাপন করবে গৃহীর অথচ স্বামী-স্ত্রী নয়, এমন নরনারীকে কোনো লোক সহ্য করবে? লোকচক্ষে এ তো চূড়ান্ত ব্যভিচার।

কথাটি সে লীলাবতীকে অন্যভাবে জানায়। সাবধান করে দেয়। বলে, নিজ গ্রামের কথা কাউকে জানাবে না, তাতে আমাদের বিপদ।

লীলাবতী শ্যামাঙ্গের মুখপানে চায়। তাহলে কি লোকের সন্দেহ হচ্ছে—তার অর্থ আবার পথে পথে ভ্রমণ! এক প্রকার অস্বস্তিতে তার মন আক্রান্ত হয়ে যায়।

ঐ অস্বস্তি ক্রমে যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী রমণীদের প্রশ্নে সে নীরব থাকে। কিন্তু ঐ নীরবতারও তো শেষ আছে। একেকদিন একেকজন একেক মন্তব্য করে। একজন বলে, হ্যাঁ লো সাধুর ঝি, তোকে কেউ দেখতে আসে না? তোর কি কোনোই আত্মীয়-পরিজন নেই? একদিন একজন দূর থেকে মন্তব্য করে—ঐ বন্ধ্যা নারীর মুখ দর্শন যেন সকালে না করতে হয় ঠাকুর। অন্য আরেকদিন শোনে, একজন অন্যজনকে বলছে, তোমার কন্যাকে ঐ বিদেশিনীর কুটিরে যেতে দিও না বাছা—আমার সন্দেহ, ওটি কামরূপ কামাখ্যার ডাকিনী যোগিনীদের কেউ, তা না হলে তার পুরুষ অমন বশ হয়?

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর নিত্যকার কলহ শুনতে পায় না কেউ—এও একটি দোষ।

অবনীদাসের মাতা তাকে নিজ পৌত্রীর মতোই জ্ঞান করেন। কুটিরে এলে নানান হাস্য কৌতুক হয়। একদিন হাত দিয়ে লীলার মুখখানি তুলে ধরে জানতে চাইলেন, হ্যাঁ লো সুন্দরী, তোর পুরুষ কেমন আদর-সোহাগ করে বল দেখি? গতরাত্রে ক'বার চুম্বন করছে তোকে? গ্রীবায় কখনও চিহ্ন অঙ্কন করেছে? হ্যাঁ লো, লজ্জা কি, এ্যাঁ?

এ প্রকার প্রশ্ন হলে লীলার সহ্য হয় না। বক্ষের ভেতরে জ্বালা ধরে। সেদিন যখন বললেন, হ্যাঁ লো, তোর পুরুষ তোকে অলঙ্কার দেয় না কেন? এই শাটিকা ব্যতীত কি তোর অন্য শাটিকা নেই? তখন সে আর সংযত থাকতে পারলো না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বেপথু কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ঐদিন রাত্রিকালে শ্যামাঙ্গকে জানালো, চলো আর এ স্থানে নয়।

শ্যামাঙ্গ কোনো প্রশ্ন করলো না। বললো, তাই চলো, আর এ স্থানে নয়।

শ্যামাঙ্গ যেন প্রস্তুত। লীলাবতী শ্যামাঙ্গের মুখপানে চায়, এ কি বিদ্রূপ, না কৌতুক? কিন্তু দেখলো, না শ্যামাঙ্গ সত্য সত্যই প্রস্তুত। তখন সে জানতে চাইলো, এ স্থানে নয়, তো কোথায়, বলো?

কোথায় তাদের স্থান হবে তা কি শ্যামাঙ্গ জানে? কোন স্থানে দু'জনের একত্র-জীবন বিকশিত হবে, প্রস্ফুটিত হবে, ফলবান হবে? না কোনো স্থানের কথা তার জানা নেই। বললো, চলো, পথই আমাদের ভবিতব্য—আর গত্যন্তর দেখি না।

লীলাবতীর কান্না উদ্বেলিত হয়। বলে, এভাবে আর কতদিন, বলো? জীবন কি পথে পথে যাপিত হয়? এমন জীবন তো আমি চাইনি—আমার যে সংসার প্রয়োজন। লীলাবতী দু'বাহু দিয়ে শ্যামাঙ্গকে সজোরে আলিঙ্গন করে রাখে আর কাঁদে। বলে, আমি তোমার জীবনে কেন এলাম—মরণ হয় না আমার?

ঐ রাত্রে কুটিরের প্রদীপালোক হয়ে ওঠে অপরূপ। ক্ষুব্ধ বেপথু এবং ক্রন্দনময় রাত্রিকে যেন ঐ আলোক নিরাবরণ করে দেয়। লীলা উন্মাদিনীর মতো বলে, তুমি ত্যাগ ক'রে যাও আমাকে। আমি তাহলে মরতে পারি। তুমি ত্যাগ না করলে যে আমার বাসনা শতবাহু মেলে জীবনকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু এ কেমন জীবন বলো, এ জীবনযাপন করা অসম্ভব, তুমি যাও শ্যামাঙ্গ, আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাও।

আলুলায়িত কেশভার, বিস্রস্তবাস আর ঐ প্রকার অবরুদ্ধ হাহাকার। শ্যামাঙ্গ লীলাকে বক্ষলগ্ন করে। পৃষ্ঠে হাত রাখে, সীমন্তে চুম্বন করে। যতোবার করে, ততোবার হাহাকার উদ্বেল হয়, রোদন উচ্ছ্বসিত হয়, ক্ষোভ তীব্রতর হয়। এবং ঐ তীব্র, ক্ষুব্ধ এবং হাহাকারময় আবেগের মধ্যেই, অত্যন্ত গভীর তলদেশে, ছিলো ভিন্ন, অনির্বচনীয়, একটি আনন্দ স্রোতের প্রবাহ। যে প্রবাহটির পরিচয় দু'জনের কেউই জানতো না। হঠাৎ প্রদীপটি নির্বাপিত হলে শিল্পী শ্যামাঙ্গের হাত দু'খানি যেন শিল্প নির্মাণ আরম্ভ করে দেয়। আহা এইভাবেই না সে লীলাবতী পুত্তলিটির সুগোল অথচ বঙ্কিম গ্রীবাটি গঠন করেছিলো, এইভাবেই না গঠিত হয়েছিলো স্তনযুগল, ক্রমে কটিদেশ, নিতম্ব, জঙ্ঘাদ্বয়। পুত্তলি নির্মাণকালের আনন্দ ঐ সময় শত গুণে তার সমগ্র অস্তিত্বকে আন্দোলিত করতে থাকে।

বাইরে উন্মথিত রাত্রি অতিবাহিত হয়। দক্ষিণে বামে দোল খায় মহাকাশের তারকামালা, অনাহত ডমরু ধ্বনির মত স্পন্দিত হয় জগতের প্রাণ স্পন্দন—আর সেই সঙ্গে লীলাবতী যেন তার অনিশ্চিত অস্তিত্বের মধ্যে একটি মূলের সন্ধান পেয়ে যায়। নিজেকে সে নিঃশেষে নিবেদন করে। তার মনে হয়, এরপরে যদি মৃত্যু হয়, তো হোক। জীবনের মর্মে কোথায় যেন সে নিজেকে প্রোথিত বোধ করে।

এক সময় দু'জনেরই সম্বিত ফেরে। লীলাবতী শ্যামাঙ্গের কণ্ঠ বেষ্টন করে মৃদু স্বরে বলে, দস্যু কোথাকার, সমস্তই তো হরণ করলে—এবার?

শ্যামাঙ্গ জানায়—চলো, এ স্থান ত্যাগ করি। আর এখানে নয়।

রাত্রির মধ্য প্রহরে তারা পথে নামে এবং যাত্রা করে পুন্ড্রনগরীর উদ্দেশে। কিঞ্চিদধিক দুই দণ্ডকালের পথ। যখন নগরীতে উপনীত হয় তখন প্রত্যূষকাল। এক প্রাচীন নির্জন অট্টালিকার বহিরলিন্দে দু'জনে অপেক্ষা করে সূর্যোদয়ের। সূর্যোদয় হলেই তারা কোনো পান্থশালা সন্ধান করে নেবে। এবং ঐ সময়ই প্রমত্ত মাদকসেবীদের একটি ক্ষুদ্র দল ঐ স্থানে উপনীত হয়। একাকী যুবতী ও গ্রাম্য পুরুষ দেখলে নগরবাসী তস্করেরা যা চিন্তা করে—এরাও সেই চিন্তা করলো। সামান্য কথায় বচসা হলো এবং সেইসূত্রে শ্যামাঙ্গকে আহত ও সংজ্ঞাহীন করে লীলাবতীকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে তারা ধাবমান হলো। লীলাবতী তখন প্রাণপণ চিৎকার করে। ঐ সময়ই সে দেখে দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী শ্মশ্রুমণ্ডিত-মুখ কয়েকজন লোক ছুটে আসছে। তাদের আসতে দেখে তস্করের দল লীলাবতীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে পলায়ন করলো। লীলাবতী তখনও চিৎকার করছিলো। একজন নিকটে এসে জানালো, ভয় নেই ভগিনী—আর ভয় নেই, তুমি কে? কোথায় যাবে?

অতঃপর লীলাবতীর নতুন আশ্রয় হলো পুন্ড্রনগরীর যবন কেন্দ্রটি। এ কেন্দ্রের লোকেরাই আহত, অচেতন, শ্যামাঙ্গকে সন্ধান করে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ ক'রে তোলে।

দীনদাস স্বগৃহে এসেছেন। তারপর পক্ষকাল গত। ইতোমধ্যে তিনি উজুবটেও গিয়েছিলেন। ভস্মীভূত ক্ষেত্রকর পল্লীটিতে এখন আর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। বাতাস এবং বৃষ্টি ভস্ম ও অঙ্গারগুলি মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত করে দিয়েছে। তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার আবির্ভাবে এমন হয়েছে স্থানটি, যে ঈষদুচ্চ গৃহ-পীঠগুলি না থাকলে অনুমানই করা যেতো না যে একদা এই স্থানে একটি সমৃদ্ধ পল্লী ছিলো।

শুনেছিলেন কোনো কোনো পল্লীবাসী ফিরে এসে পুনরায় গৃহ নির্মাণ করেছে। কিন্তু দেখলেন, কথাটি জনরব মাত্র। দু'একখানি গৃহ অবশ্য উঠেছে কিন্তু ঐ স্থানে নয়—কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে, ব্রাহ্মণপল্লীর একেবারে প্রান্তসীমায় সংলগ্ন। বোঝা যায়, ব্রাহ্মণরাই ব্যবস্থাটি করেছেন। দাস ভৃত্য না হলে তাঁদের চলবে কীভাবে?

তিনি বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। যেমন মহাসামন্ত হরিসেন রাজধানীতে ছিলেন মাসাধিককাল। সেখান থেকে এসে তাঁর প্রতাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রক্ষা এই যে, এখনও নতুন কোনো ঘটনা ঘটাননি। কেবল তাঁর চরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষেত্রকরদের নিশ্চিহ্ন পল্লীটির উপর এখনও তাঁর ক্রোধ। তাঁর নাকি অনুমান ঐ পল্লীর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো যুগপৎ যবন ও সদ্ধর্মীদের। তাদেরই ষড়যন্ত্রের কারণে যবনেরা হরিসেনের বাহিনীকে আঘাত করে। ঘটনাটির কথা যতোবার স্মরণ হয় ততোবারই নাকি তাঁর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। ঐ পল্লীর শিশু বৃদ্ধ রমণী কাউকেই তিনি জীবিত রাখতে চান না। শোনা যায়, একটি কিশোর বালককে বন্দী করা হয়েছিলো—সেই বালকটিকে সন্ধান ক'রে আর কেউ পায়নি। কাজটি নাকি অভিমন্যুদাসের। এই লোকটি এখন হরিসেনের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছে। যাবতীয় দুষ্কর্ম এখন অভিমন্যুদাসই সম্পাদন করে। সে উজুবটের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে চর নিয়োগ করে রেখেছে—ভিক্ষু অথবা যোগী ব'লে কোনো লোককে সন্দেহ হলেই তারা যেন সংবাদ দেয়। সে যোগী এবং ভিক্ষুদের লাঞ্ছনা করতে অত্যধিক আগ্রহী। ঐ কাজে সে যারপরনাই আনন্দ পায়। এও শোনা যায় যে হরকান্ত ও তার কন্যাটির সে সন্ধান করছে। হরকান্তের গৃহে একটি যোগী এসেছিলেন, সেই যোগীটিকেও নাকি তার বিশেষ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নাকি আরও একটি কুম্ভকার যুবকের সন্ধান করছে সে। দীনদাসের অনুমান, এই কুম্ভকার যুবক শ্যামাঙ্গ ব্যতীত আর কেউ নয়। শ্যামাঙ্গের যে কী অপরাধ তিনি ভেবে পান না।

দীনদাস এতো সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন এই জন্য যে, এই সকল সংবাদের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্বগ্রামে শুকদেবের প্রত্যাবর্তন সমীচীন কিনা। যদি না হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে অন্য কোথাও গৃহ নির্মাণ করতে হবে—তা সে যে স্থানেই হোক। দূরদেশে অন্যের আশ্রয়ে কতোদিন থাকবেন। সর্বোপরি জামাতা বসন্তদাস সম্পর্কে হরিসেনের অনুচরদের কি মনোভাব সেইটি জানা অধিক প্রয়োজন। কেননা বসন্তদাসের সঙ্গে সদ্ধর্মী ভিক্ষুদের সংস্রবের সংবাদটি এখন প্রায় সর্বজনবিদিত। এবং হরিসেনের অনুচরেরা যে উজুবটের ক্ষেত্রকর পল্লীটি আক্রমণ করে, তাও কিন্তু বসন্তদাসকে বন্দী করার জন্যই। এমতাবস্থায় বসন্তদাসের প্রতি হরিসেন ও তার অনুচরদের মনোভাবের পরিবর্তন যদি না ঘটে, তাহলে শুকদেবের উজুবট গ্রাম তো দূর স্থান, এতদঞ্চলেই প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

অথচ ওদিকে ভগিনী যোগমায়া ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। মায়াবতী চিন্তায় চিন্তায় শীর্ণকায়া, শুকদেব তো প্রায় সর্বক্ষণই নীরব ও নির্জীব থাকেন। তবে সৌভাগ্য যে, জামাতা বসন্তদাসের সংবাদ পাওয়া গেছে, সে জীবিত এবং সুস্থ। দীনদাস জানেন, এই সংবাদটি শ্রবণ করলেই শুকদেব পুনরায় সচল ও সজীব হয়ে উঠবেন, যোগমায়ার মুখে হাসি ফুটবে এবং মায়াবতী হয়ে উঠবে চঞ্চলা হরিণীটির মতো—যেমন সে পূর্বে ছিলো।

যবনদের আগমন সংক্রান্ত সংবাদ তাঁকে কেউ-ই দিতে পারেনি। কেউ কেউ বলে, তারা পশ্চিমে তঙ্গন নদীর পরপারে অবস্থান করছে, কেউ আবার বলে, তারা দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানন্দার তীরে শিবির স্থাপন করে আছে—প্রকৃত সংবাদ কেউ জানে না। তবে স্বস্তির কথা এই যে, তাদের নতুন কোনো কার্যকলাপ দেখা যায়নি। কিন্তু একটি চিন্তার বিষয়ও আছে। শোনা যাচ্ছে যে, সদ্ধর্মী ভিক্ষুরা নাকি সত্য সত্যই যবনদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

দীনদাসের বহু কাজ—প্রথমত মদনপুর গ্রামে শুকদেবের সুহৃদ প্রফুল্লদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তারপর সন্ধান করতে হবে বসন্তদাসের। যদি সাক্ষাৎ হয় উত্তম, না হলে প্রফুল্লদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হবে, শুকদেব আর তাঁর স্ত্রী কন্যাকে কোথায় আনা যায়—নিজ গ্রামে উদয়পুরে, না প্রফুল্লদাসের গৃহ মদনপুরে।

শুকদেব উজুবটের ব্রাহ্মণপল্লীতেও যেতে বলেছেন। সোমজিৎ উপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর অভিমতটি যেন সংগ্রহ করেন দীনদাস।

সোমজিৎ উপাধ্যায় বহির্বাটিতেই ছিলেন। দীনদাস প্রণাম করে সম্মুখে দাঁড়ালে জানতে চাইলেন, কে তুমি? তোমাকে তো পরিচিত মনে হচ্ছে না?

আজ্ঞে আমি উদয়পুরের লোক, এই গ্রামের ক্ষেত্রকর শুকদেব আমার ভগিনীপতি।

শুকদেবের নাম শুনে সোমজিৎ আগ্রহী হলেন। বললেন, শুকদেব কোথায়? তার কি সংবাদ, কুশলে আছে তো?

দীনদাস সত্য গোপন করলেন। বললেন, তিনি আমার গৃহে আছেন। শরীর অসুস্থ, বৃদ্ধ হয়েছেন তো—তিনি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন। আপনার পরামর্শ চান শুকদেব, তিনি কি উজুবটে ফিরে আসবেন? আপনি বললেই তিনি আসবেন।

সোমজিৎ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন একটি। কী বলবেন? এই অপরিচিত ক্ষেত্রকরটির কাছে কি বলা যায়, রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে তিনি কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন? বলবেন কি, যে মহাসামন্ত হরিসেনের স্বেচ্ছাচারে বাধা দেবার কেউ নেই। তিনি আপন মনে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, শুকদেব পরমকুটুম্বের গৃহে গেছে, সেখানে থাক কিছুদিন, এতো শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের কি প্রয়োজন? নাকি শ্যালক শ্যালক-পত্নী যথেষ্ট সমাদর করছেন না।

ঈষৎ কৌতুকে হাস্য করলেন কথাটি ব'লে। শেষে জানালেন, শুকদেবকে আগমনের পরামর্শ আমি দেবো না, কারণ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, দেহবল মনোবল উভয়ই আমার গত-প্রায়। তবে যদি আগমন করতেই হয়, তাহলে তাকে ব'লো সে যেন আমার গৃহের নিকটে কুটির নির্মাণ ক'রে থাকে। ঐ যে ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানা দেখছো, সোমজিৎ হাত তুলে দেখালেন। বললেন, তারপরই আমার দুই কূলব্যাপ ভূমি—ঐ স্থানে আরও দু'টি পরিবার গৃহ নির্মাণ করে আছে—শুকদেব এলে ওখানেই তাকে গৃহ নির্মাণ করতে হবে, তার নিজের পল্লীতে বসবাস এখনও বিপজ্জনক।

উপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পথে একটি লোক তার সম্মুখে দাঁড়ালো। তারপর আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করে বললো, মহাশয়কে নতুন দেখছি মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, আমি উদয়পুরের লোক, আপনি?

আমি এই গ্রামেরই লোক, একজন দীন অভাজন বলতে পারেন।

দীনদাস লক্ষ্য করলেন লোকটির দৃষ্টি অদ্ভুত। বিনয়ে মুখখানি নত। কিন্তু যখন দৃষ্টি তোলে তখন চক্ষু দু'টির বহুদূর ভেতরে কপিশবর্ণের আলোকরেখা দেখা যায় একটি। যেন বিষধর সর্পের দৃষ্টি।

তা মহাশয় বুঝি উপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষেত্রকর? লোকটি জানতে চায়।

না, আমি নই, আমার ভগ্নীপতি তাঁর ক্ষেত্রকর।

ও, তাই হবে, আপনি তাঁর ক্ষেত্রকর হলে তো নিশ্চয়ই আপনাকে পূর্বে দেখতাম। আমি নির্বোধ, জানেন, সকলেই আমাকে উন্মাদ বলে। কখন কোন কথা বলি কিছুরই স্থিরতা নেই—তা মহাশয়ের ভগ্নীপতিটির পরিচয় তো জানা হলো না?

দীনদাস দেখলেন, লোকটি সুবিধার নয়। বললেন, আমার ভগ্নীপতির নাম শুকদেব, এবার পথ ছাড়ুন, আমি যাবো।

কি যে বলেন, হেঁ হেঁ কি যে বলেন—শুকদেব আমার শ্বশুর স্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর আত্মীয় হলে তো আপনি আমারও আত্মীয়—আপনাকে এভাবে পথ থেকেই যেতে দিই কীভাবে—হেঁ হেঁ—আপনি গুরুজন, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, শুকদেব কোথায় আছেন? কেমন আছেন? তাঁর জন্য আমরা এতো উদ্বিগ্ন যে বলার কথা নয়। তাঁর কন্যা মায়াবতী কোথায়? তাঁর জামাতা বসন্তদাস কোথায়?

দীনদাস বুঝলেন, সমস্তই লোকটির অভিনয়, নিশ্চয় সে হরিসেনের অনুচর। তিনি সাবধান হলেন। বললেন, আমি মদনপুরে প্রফুল্লদাসের কাছে যাচ্ছি, এখানে উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ সমাপ্ত হয়নি—সন্ধ্যাকালে আবার হবে—রাত্রি আমি তাঁর গৃহেই যাপন করবো, আর বিলম্ব করাবেন না—যেতে দিন।

অবশ্যই যাবেন, হেঁ হেঁ, বিলম্ব করা আদৌ উচিত নয়, ঐ যে আমার কুটির, বড় অভাজন আমি, যদি পদধূলি দিতেন একবার, এ দীন অভাজন ধন্য হতো।

সোমজিৎ দূর থেকে দেখছিলেন ব্যাপারটি। তিনি সম্মুখে এলেন। জানতে চাইলেন, কি হয়েছে অভিমন্যুদাস? এঁকে তুমি যেতে দিচ্ছো না কেন?

অভিমন্যুদাস তাহলে এই লোক, দীনদাস লোকটিকে দেখে নিলেন উত্তমরূপে।

সে তখনও বলে চলেছে—হেঁ হেঁ গুরুদেব, আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র—সবই ভবিতব্য বলতে হবে। ইনি আত্মীয়জন, শুকদেবের শ্যালক, কি প্রকারে যেতে দিই বলুন—হেঁ হেঁ হেঁ—আপনিই বলুন শুকদেবের সংবাদ নিতে হবে না? তাঁর জামাতাটির জন্য কতো ব্যাকুল আমরা।

অভিমন্যুদাস, সোমজিৎ বুঝিয়ে বললেন, দেখো, তুমি অহেতুক এঁর উপর উপদ্রব সৃষ্টি করেছো—এঁকে যেতে দাও—আমি উত্তম মতো জানি, এ কোনো প্রকার দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়।

কিন্তু অভিমন্যুদাসের দন্তবিকাশের শেষ নেই। অনবরত হেঁ হেঁ রবে হেসে যাচ্ছে। শেষে জানালো, আমার প্রভু হরিসেন কিন্তু আপনার উপরও দৃষ্টি রাখতে বলেছেন, হেঁ হেঁ গুরুদেব। আপনার ভাবগতিকও নাকি সুবিধার নয়। কী যে বলেন, রাজপুরুষেরা, তাই না গুরুদেব? হেঁ হেঁ, কিছুই বোধগম্য হয় না, তাই না? আসুন আপনি, আমার সঙ্গে আসুন।

সোমজিৎ কিছুই বলতে পারলেন না। দীনদাস তাঁর মুখের দিকে চাইলে তিনি শুধু বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা ক'রো না—আমি বৃদ্ধ।

দীনদাস ততক্ষণে বুঝে নিয়েছেন, তাঁর সমূহ বিপদ। তিনি মহাসামন্ত হরিসেনের এক উন্মাদপ্রায় বিকৃত-বুদ্ধি লোকের হাতে পড়েছেন, তাঁর আর আশা নেই। তিনি ইতি কর্তব্য স্থির করে নিলেন। অভিমন্যুদাসের খর্বাকৃতি দেহাবয়বটি আপাদমস্তক দেখলেন, দূরে যে গৃহের দিকে অভিমন্যু তাকে নিয়ে যেতে চায় সেই গৃহখানি দেখলেন, তারপর মনে মনে বললেন, দীনদাস, এবার তোমার ইষ্ট নাম জপ করার সময় হয়েছে—যদি কিছু করতে চাও, তো এখনই করো।

সোমজিৎকে বললেন, গুরুদেব চলুন, আপনার গৃহে জলপান করি প্রথমে, তারপর অভিমন্যুদাসের গৃহে যাবো—দেখি কী প্রকার সমাদর করে সে।

অভিমন্যু দন্ত বিকাশ করে হাসে শুধু।

সোমজিতের গৃহের বহির্দ্বারে গৃহ সংস্কারের নানাবিধ উপকরণাদি সংগ্রহ করে রাখা ছিলো। দীনদাস বহির্দ্বারের নিকটে এসে অভাবিত এবং দুঃসাহসী কাজটি করলেন। কারও কিছু বোধগম্য হবার পূর্বেই তিনি একখানি কাষ্ঠখণ্ড হাতে তুলে নিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে আঘাত করলেন। কি হলো বুঝতে পারেননি সোমজিৎ। যখন বুঝলেন, তখন দেখেন, অভিমন্যুদাস ভূমিতে পপাত এবং দীনদাস অনতিদূরে ধাবমান।

ঐ ঘটনার পর দীনদাসের ঐ অঞ্চলে থাকবার কথা নয়—এবং তিনি ছিলেনও না। কিন্তু অভিমন্যুদাস নিজ সঙ্গীদের নিয়ে উদয়পুর পর্যন্ত যেতে বিলম্ব করেনি। সেখানে কি হতো বলা যায় না। কেননা দীনদাসকে না পেয়ে অভিমন্যুর লোকেরা তার গৃহে অগ্নিসংযোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো। ওদিকে আবার প্রস্তুত হয়েছিলো গ্রামবাসীরাও। অভিমন্যুদাস অবস্থা দেখে নিজ সঙ্গীদের নিবৃত্ত করে এবং উদয়পুর গ্রাম থেকে চলে আসে।

তার নানান গুণ। আচরণে সে অত্যধিক ভদ্র এবং বিনয়ী। প্রথম আলাপে তাকে নির্বোধও মনে হতে পারে। কেউ কেউ বলে, সে নাকি নপুংসক। কিন্তু যে পরিচিতি, সে জানে কি প্রকার চতুর এবং কৌশলী সে। অমন নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা সচরাচর দেখা যায় না। হরিসেনের বিশ্বাসভাজন হয়েছে সে এই গুণটির জন্য। তার মস্তিষ্ক কখনই তপ্ত হয় না। সে এক উদ্দেশ্য নিয়ে বৎসরের পর বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

দীনদাসের জন্যও অপেক্ষা করতে পারবে, মনে মনে সে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। তার এক অপেক্ষা সেই অপরিচিত কুম্ভকার যুবকটির জন্য, উজুবটে অগ্নিসংযোগের রাত্রে যাকে সে লীলাবতীর সঙ্গে পলায়ন করতে দেখেছিলো, আর দ্বিতীয় অপেক্ষা, এই দীনদাসের জন্য। তার নিশ্চিত ধারণা, লীলাবতী একদিন না একদিন উজুবট গ্রামে আসবে। সে না আসুক, ঐ যুবকটি আসবে আর দীনদাসকে তো উদয়পুর আসতেই হবে। কেননা ঐ গ্রামে তার গৃহ-সংসার।

দীন অভাজন ব্যক্তি সে, মস্তকাবনত ক'রে যতোদিন প্রয়োজন, সে অপেক্ষা করে থাকবে।

অপেক্ষা করার প্রয়োজন হতো না। মহাসামন্তের শস্ত্রধারী সুশিক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে ঐ লগুড়ধারী গ্রামবাসীদের তুলনা? সে চিন্তা করে দেখেছে। ও তো মাত্রই এক রাত্রির ব্যাপার, গ্রামখানির চিহ্ন পর্যন্ত থাকতো না। তবে সময় এখন অন্যরূপ। বলা যায় না, কখন যবন অশ্বারোহীদের উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। কেমন করে যে তারা সংবাদ পায় ভগবান, জানেন। কোন স্থান থেকে আসে, কোথায় যায়—কিছুই বলতে পারে না কেউ। না হলে লীলাবতী কি যুবাপুরুষটির হাত ধরে সেদিন ঐভাবে পলায়ন করতে পারে? যদি পশ্চাতে অশ্বারোহীটি ছুটে না আসতো, তাহলে একটি বর্শাঘাতের অপেক্ষামাত্র ছিলো। তারপর দেখা যেতো, লীলাবতীর অহঙ্কারখানি কত উচ্চ হয়েছে।

কিন্তু দেখা যায়নি শেষ পর্যন্ত। লীলাবতীর মাতুল সেই যোগী পুরুষটিকেও সে দেখতে চায়। আর শুকদেবের জামাতাটি, তাকেও তার প্রয়োজন। সুতরাং সে অপেক্ষা করবে।

কিন্তু কেন এই অপেক্ষা? কেউ-ই জানে না কিসের অপেক্ষায় দিন গণনা করছে বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতটের জনপদগুলি। লোভ হিংসা প্রতিহিংসা প্রতারণা যুদ্ধ ধ্বংস প্রেম সমস্ত কিছু একাকার হয়ে অপেক্ষায় আছে সেই অনাগত প্রহরটির জন্য।

রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে গোবর্ধন আচার্য ও হলায়ুধ মিশ্রের মতো লোকেরা অপেক্ষায় আছেন—অপেক্ষায় আছেন উজুবট গ্রামের সোমজিৎ উপাধ্যায়—হরিসেনও সম্ভবত অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা বসন্তদাসের, লীলাবতীর, শ্যামাঙ্গের, ছায়াবতীর, শুকদেবের, মিত্রানন্দের। কার অপেক্ষা নয়? সকলেই উপলব্ধি করে, যে জীবনযাপিত হচ্ছে, সে জীবন থাকবে না—এই অস্থিরতার অবশ্যই অবসান হবে। কিন্তু সেই অবসান কিসে? মৃত্যুর হতাশায়? না নবীন জীবনের উন্মেষে? কেউ-ই বলতে পারে না।

দীনদাস সুনন্দপুরে এসে শুকদেবকে ঐ অপেক্ষা করার কথাই বলেন। জানান, ভ্রাতঃ, উপায় নেই এখন অপেক্ষা করা ব্যতীত, উজুবটে প্রত্যাগমন এখন অসম্ভব।

শুকদেব কিঞ্চিৎ সুস্থ এখন। তাঁর বিষণ্ণ নির্জীব ভাবটি আর নেই। যোগমায়ার মুখেও হাসি দেখা যায়—আর মায়াবতী হয়ে উঠেছে পূর্বের মতোই। এই পরিবর্তনের কারণ একটিই আর তা হলো বসন্তদাসের আগমন। বসন্তদাস সুনন্দপুরে আসে দীনদাসের আগমনের সপ্তাহকাল পূর্বে। তার আগমনে, বলাই বাহুল্য, নির্জীব এবং হতাশ এই উদ্বাস্তু পরিবারে স্বস্তি আনন্দ এবং উল্লাস একইসঙ্গে জেগে ওঠে। বসন্তদাস উজুবট ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির অবস্থা জানিয়েছে শুকদেবকে। শুধু গ্রামের কথা নয়, রাজধানীর সংবাদও। যবনদের সংবাদ, ভিক্ষুদের সংবাদ, সমস্তই জানিয়েছে। এবং শেষ কথা বলেছে, আপাতত কিছুই করণীয় নেই, এ স্থানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সমস্ত কিছু শোনার পর শুকদেবের মনে হয়েছে ঐ একই কথা। এখন সত্যই কিছু করণীয় নেই—অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু যোগমায়ার কষ্ট হচ্ছে। দান ঋণ এবং স্বল্প সঞ্চয়ে তাঁর সংসার আর কতোদিন চলে? প্রতিবেশীরা করুণা করে, নানান মন্তব্য করে একেকজন, তাতে তাঁর অসহ্য বোধ হয়। নিজ গৃহে তাঁর কোনো অভাব ছিলো না—কিন্তু এখানে অভাব বোধ করছেন প্রতি পদে। তাঁর আশা হয়েছিলো, দীনদাস শুভ সংবাদ নিয়ে আসবেন এবং তারপরই তিনি স্বামী সংসার নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যাবেন। কিন্তু এ কোন কথা শুনছেন? আরও নাকি অপেক্ষা করতে হবে? কতোদিন? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। শুকদেব দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বলেন, জানি না।

কিন্তু মায়াবতী ঐ কথা শুনবে না। অভিমানে ওষ্ঠ স্ফুরিত হয়, চোখে অশ্রু উদ্বেল হতে দেখা যায়। আর বলে, না আমি আর একদণ্ডও থাকবো না এ স্থানে। স্বামীকে কাছে পেয়ে তার অভিমান হয়েছে আরও অধিক। বসন্তদাসের সঙ্গে সে কলহে প্রবৃত্ত হয়। বসন্তদাস স্ত্রীর অভিমান এবং ক্রোধের কারণ বোঝে, কিন্তু কোনো পথ যে সত্যই নেই, সে কথাটি সে স্ত্রীকে বোঝাতে পারে না।

অবকাশও স্বল্প। কারণ একটি কুটিরে বাস—কুটিরের ভিতরে শয়ন করেন শুকদেব স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আর দীনদাস এবং বসন্তদাসকে বাইরে রাত্রিযাপন করতে হয়। ফলে স্বামী-স্ত্রীর একান্ত হবার সুযোগ প্রায় একেবারেই নেই। মায়াবতীর অস্থিরতার এক কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। তার স্বামীসঙ্গ প্রয়োজন। একেকদিন নির্লজ্জ রমণীর মতো দ্বিপ্রহরে স্বামীকে সে কুটিরের ভিতরে ডাকে। দু'বাহুতে স্বামীকে কণ্ঠলগ্ন করে বলে, তুমি আমাকে নিয়ে চলো—তোমাকে আমি সর্বক্ষণ পাই না—এখানে থাকলে কখনই পাবো না—আমি এখানে থাকবো না।

বসন্তদাস নির্বোধের মতো আচরণ করে। অস্থির আবেগময়ী স্ত্রীকে সে শান্ত করতে পারে না। একেক সময় বহুক্ষণ রোদন করতে থাকলে বিরক্তি, ক্রোধ, ক্ষোভ ইত্যাকার মানসিক প্রতিক্রিয়া যে হয় না তা নয়—কিন্তু তথাপি সে সংযত থাকে। এখন কোনো প্রকার অস্থিরতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না।

ইতোমধ্যে একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে, পুনর্ভবা তীরের মদনপুর গ্রামখানি যবনদের দ্বারা উপদ্রুত হয়েছে। তাতে শুকদেব চঞ্চল হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর শক্তি নেই যে একাকী অতদূর যান। জামাতাকে বলেন, বসন্ত, দেখো, যদি প্রফুল্লের কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারো, ওর কন্যাটির জন্য আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

বসন্তদাস কোনোদিন পান্থশালায় যায়, কোনোদিন হাটে যায় আর চারিদিকের অবস্থা দেখে। তার অস্পষ্ট মনে হয়—সময় ঘনিয়ে আসছে। আর বোধ হয় কিছু করতে পারলো না কেউ।

একদিন সুনন্দপুরের হাটেই সংবাদ পাওয়া গেলো যে মহাসামন্ত সুধীমিত্র বিল্বগ্রামে নেই। কোথায় গেছেন, কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে যে তিনি তীর্থে গেছেন, অন্য জনরব আবার এই যে, যবনাক্রমণ আসন্ন দেখে তিনি দক্ষিণ দেশে পলায়ন করেছেন।

মিত্রানন্দ ইতোমধ্যে একদিন কদম্বঘাটে ছায়াবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। সেখানেও নতুন সংবাদ এই যে, নদীপথে দক্ষিণগামী বৃহৎ নৌকার সংখ্যা অধিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামন্তপতিরাই শুধু নয় তাদের অনুচরদের পরিবারও দক্ষিণে এবং পূর্বে চলে যাচ্ছে। ঐ ঘাটেই সাক্ষাৎ হলো এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে। তিনি দেখে এসেছেন পশ্চিমের গ্রামগুলি থেকেও লোক পলায়ন করছে। প্রত্যেকের মুখেই যবনাক্রমণের সংবাদ। হ্যাঁ, তিনিও শুনেছেন মদনপুর গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। তবে আক্রমণকারীরা গ্রামখানি ধ্বংস করে দেয়নি। দু'তিনটি যুবতী রমণী এবং কয়েকটি গাভী ও ছাগল নিয়ে গেছে। না, কেউ নিহত হয়নি। তবে যাবার সময় মন্দিরটি অপবিত্র করে গেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে গো-হত্যা ক'রে সেই গো-মাংস দগ্ধ করে ভক্ষণ করেছে—এবং ঐ মন্দিরেই নাকি রমণীদের বলাৎকার করা হয়েছে। তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন দুই আত্মঘাতিনী রমণীর মৃতদেহ। তৃতীয়টি নাকি পূর্ব থেকেই উন্মাদিনী ছিলো—সে এখন পথে পথে ঘুরছে।

মিত্রানন্দ অস্থির হয়ে উঠেছেন মনে মনে। তাঁর ধারণা, এখনও কিছু করা সম্ভব। যবনেরা বহিরাগত, স্থানীয় লোকের সহায়তা না পেলে তাদের পক্ষে এদেশে অধিককাল থাকা সম্ভব হবে না। সে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

মায়াবতী যেন অনুভব করে তার স্বামী চিন্তিত। উজুবটে যেমন মনে হতো—এ তার চাইতেও অধিক। সর্বক্ষণ যেন কী চিন্তা করে। একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বললো, তুমি কি আবার চলে যাবে?

না, কোথায় যাবো? তুমি অহেতুক চিন্তা ক'রো না—আমি তোমাকে ত্যাগ করে কোথাও যাবো না। স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বসন্তদাস।

না, আমার মন বলছে, তুমি চলে যাবে, বলো, তুমি কী ভাবছো?

বসন্তদাস স্ত্রীর মুখপানে চেয়ে দেখে বারেক। ভাবে, সরলা এই গৃহবধূর কাছে সে নিজ চিন্তা-ভাবনার কথা বলবে কি বলবে না। তারপর সে বলে, আমি কি চিন্তা করি শুনবে? শোনো তাহলে, আমি তোমার আমার মতো মানুষের কথা ভাবি। দেখো, এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই, কেবলি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে—এর শেষ কোথায়? এ জীবন কি যাপন করা যায়? বলো, কতোদিন এভাবে চলবে? গ্রামপতি, সামন্তপতিরা যথেচ্ছ অত্যাচার করে যাবে, কেউ কিছু বলতে পারবে না—ওদিকে আবার যবনরা ধেয়ে আসছে, তাদের তরবারির নীচে কত মানুষের শির ছিন্ন হবে তাও কেউ বলতে পারে না। আমি চিন্তা করি এই অবস্থার পরিবর্তনের কথা।

কিন্তু তুমি কী করবে, যুদ্ধ করবে? মায়াবতীর স্বরে আতঙ্ক ফোটে। বলে, তুমি একাকী কেমন করে যুদ্ধ করবে—যুদ্ধ করলে তো মানুষের মৃত্যু হয়।

মায়াবতী স্বামীকে দু'বাহুতে বেষ্টন ক'রে ধরে।

বসন্তদাস স্ত্রীর কথায় হাসে। বলে, না আমি কেন যুদ্ধ করবো, যারা যুদ্ধ করতে চায়, আমি তাদের বলবো যে যুদ্ধ ক'রো না, যুদ্ধ করলে মানুষ ধ্বংস হয়।

না, সে কথা বলার তুমি কে? এ সকল কথা ভয়ানক—তুমি সামন্তপতিদের সঙ্গে কথা বলতে যাবে না—তাদের ভারী ক্রোধ—দেখোনি, তুমি ভিক্ষুদের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলে বলে কতো কাণ্ড ঘটলো?

বসন্তদাস বিমূঢ় বোধ করে। কোন্ ভাষায় সে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বোঝাবে। তথাপি বলে, এ একজনের ব্যাপার নয় মায়া—এ হচ্ছে সকল মানুষের ব্যাপার। আমি যদি ঐ সকল কথা নাও বলি, তাহলেও আমরা রক্ষা পাবো না। যদি বিলম্ব হয়ে যায়—যুদ্ধকারীদের বোঝানো না যায়—তাহলে সর্বত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। কেউ রক্ষা পাবে না, আমরাও না। এ অবস্থার কিছু একটা করা প্রয়োজন।

মায়াবতীর কিছুই বোধগম্য হয় না। তার এক কথা, তুমি ঐ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপারে যাবে না। গেলে আমি আত্মঘাতিনী হবো।

কিন্তু এভাবে কতোদিন? একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আর চরম সর্বনাশের জন্য অপেক্ষা করা? তার মনে হয়, এভাবে দিনযাপন একেবারেই অর্থহীন। সমূহ সর্বনাশ আসন্ন অথচ সে কিছুই করছে না, কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। ধিক বসন্তদাস, ধিক তোমার এই জীবনে! সে একাকী কেবলি নিজেকে ধিক্কার দেয়। ভিক্ষু মিত্রানন্দ জীবন বিপন্ন করে কোন স্থান থেকে কোন স্থানে চলে যাচ্ছে—বিভাবতী কৃষ্ণা শুক্লার মতো রমণীরা আত্মাহুতি দিচ্ছে আর তুমি গৃহসুখ উপভোগ করছো? অল্প ক'দিনের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। এবং একদা হঠাৎ জানালো, আমি নিজ গৃহে যাবো, পিতা-মাতাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে।

এই কথার পর কারও কিছু বলার থাকে না। যোগমায়া মৃদু আপত্তি করেন, কিন্তু সেই আপত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। অবশেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে মায়াবতী স্বামীকে বিদায় দেয়। বিদায়কালে বলে, শীঘ্র ফিরে এসো, বিলম্ব হলে আর আমাকে জীবিত দেখবে না।

স্বগৃহে যাওয়া তার প্রয়োজন বটে, কিন্তু সে যাত্রা করে বিপরীত দিকে, পুন্ড্রনগরীর উদ্দেশে।

সেখানে গিয়ে দেখে, মিত্রানন্দ ফিরে এসেছে। এবং সে অত্যধিক ব্যস্ত। কেন ব্যস্ত, কিসে ব্যস্ত, কিছুই বলে না সে। নগরপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটি বিহার—যেমন প্রাচীন, তেমনই তার ভগ্নদশা। সে অবাকই হলো এক প্রকার। এতো ভিক্ষু একত্রে সে জীবনে দেখেনি। বাহির থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এতো অধিক সংখ্যক ভিক্ষু এ স্থানে বসবাস করে।

মিত্রানন্দ অবশ্য জানিয়েছে যে ভিক্ষুদের সকলেই এই স্থানের নয়। বহুসংখ্যক ভিক্ষু বহিরাগত। কিন্তু তথাপি এতো অধিকসংখ্যক ভিক্ষুর একত্র সমাবেশ তার কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হয়েছে। মিত্রানন্দকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে বলে, অপেক্ষা করো, অচিরেই সমস্ত কিছু জানতে পারবে। সম্ভবত আমরা শীঘ্রই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যাচ্ছি।

আবার সেই অপেক্ষার কথা।

অবশেষে দেখলো, ঐটিই হলো মূল কথা—অপেক্ষা করা হবে, কি হবে না। তরুণ ভিক্ষু নিরঞ্জন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ঐ অপেক্ষার কথা শুনে।

বসন্তদাস লক্ষ্য ক'রে দেখলো, অত্যন্ত তেজস্বী এই তরুণ ভিক্ষুটি। লক্ষ্য ক'রে দেখার আরও একটি কারণ ছিলো। ছায়াবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই নিরঞ্জন।

ভিক্ষুসভায় তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নিরঞ্জন। বলে, আর কতোকাল আমরা অপেক্ষা করবো, বলুন? বহুকাল অপেক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে, আমাদের ধর্ম নিঃশেষ প্রায়, জ্ঞান আচ্ছন্ন, বুদ্ধি অবসাদগ্রস্ত—এরপরও কি অপেক্ষা করতে হবে? এ অপেক্ষার অপর নাম তা'হলে মরণ। এভাবে আমরা মৃত্যুকে গ্রহণ করতে চাই না। আপনারা মহাভিক্ষুদের নির্দেশ নিয়ে আসুন।

অপরাহ্ণের রৌদ্র এসে পড়েছিলো তার মুখে—এবং ঐ রৌদ্রে তার কাষায় বস্ত্র, গৌরবোজ্জ্বল মুখ, মুণ্ডিত মস্তক—সমস্ত একত্রে অগ্নিশিখার মতো জ্বলছিলো।

একজন বয়স্ক ভিক্ষু তাকে নিবৃত্ত করার জন্য বললেন, ভ্রাতঃ নিরঞ্জন, বলতে পারো, আমাদের ক্ষমতা কতোখানি? তোমার পরিকল্পনা কী, আমাদের কাছে বলবে?

নিরঞ্জনের ঐ কথায় যেন সম্বিত হয়, ঈষৎ লজ্জায় মাথা নত করে। তবে সে দমিত হয় না। বলে, মহাভিক্ষুরা সমবেত হয়ে বিচার করুন, এবং শীঘ্র সিদ্ধান্ত নিন, এইটিই আমাদের কথা।

না, ঐভাবে বললে হবে না, আমরা আপনার কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব চাই—দূর থেকে একটি তরুণ ভিক্ষু চিৎকার ক'রে বলে।

সুস্পষ্ট প্রস্তাব আমি অবশ্যই আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো ব'লে আশা করি। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে হবে, নিরঞ্জন বলতে থাকে, আমি পশ্চিমের গ্রামগুলি ভ্রমণ করে এসেছি। দেখেছি মানুষের জীবন অতিষ্ঠ এবং অসহ্য। সর্বত্রই দেখেছি উচ্চশ্রেণীর লোকদের হাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিপীড়ন হবেই—প্রত্যক্ষে হোক আর পরোক্ষে হোক। লুণ্ঠন, হত্যা, দস্যুবৃত্তি—এগুলি প্রায় নিত্যসঙ্গী মানুষের জীবনে। রাজপাদোপজীবী যাঁরা, তাঁরা কিছুই করেন না—সম্ভোগ ও ব্যসনে তাঁদের আসক্তি সীমাহীন। প্রজারা তাঁদের কাছে যেন পীড়নের পাত্র—পালনের নয়। ছিন্নমূল ক্ষুদ্রতরুর মতোই তাদের অবস্থা। ফলে যখনই দেখি যবনেরা আসে, তখনই তারা হয় পলায়ন করে, নতুবা বশ্যতা স্বীকার করে—কখনই যুদ্ধ করে না। যবন শক্তি ভিন্নদেশীয়। তারা আজ আছে কাল নেই—এমতাবস্থায় এই-ই মাহেন্দ্রক্ষণ, রাষ্ট্রশক্তি একেবারে শতধা বিচ্ছিন্ন—এই ক্ষয়িত রাষ্ট্রশক্তিকে আঘাত করলেই ধসে পড়বে।

আঘাত কে করবে, আমরা? আমাদের কি তাহলে যুদ্ধ করতে হবে? কোন শাস্ত্রে আছে যে ভিক্ষুরা যুদ্ধ করে? সেন রাজার সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা কতো জানো? অশ্বারোহী কতো বলো? যুদ্ধহস্তির সংখ্যাটি বলতে পারো?

শ্রোতারা একের পর এক প্রশ্ন করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সন্দেহের কথা জানায়।

কেন, আমরা কি যুদ্ধ করতে পারি না? নিরঞ্জন প্রত্যুত্তরে বলতে আরম্ভ করে, আমি আপনাদের দীপঙ্কর অতীশের কথা স্মরণ করিয়ে দিই—তিনি তিব্বতে বলেছিলেন, ধর্মকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সংঘকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, সংঘই হবে সমস্ত কিছুর নির্ধারক। প্রয়োজনবোধে সে-ই রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ঘটাবে।

কিন্তু এ কথা তো তিব্বতী ভিক্ষুদের উদ্দেশে বলেছিলেন দীপঙ্কর, এদেশ তো তিব্বত নয়।

নিরঞ্জন গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করে। মন্তব্যকারীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে একবার, তারপর বলে, ভ্রাতঃ এ তর্ক অর্থহীন। মহাপণ্ডিতের বাণী কেবল এক দেশের সমস্যা সমাধান করবে, অন্য দেশের সমস্যা সমাধানে তা ব্যবহার করা যাবে না—এমন কি হতে পারে? আপনারা জানেন, হতে পারে না, তথাগত বাণীর কথা চিন্তা করুন, বোধিসত্ত্বের কথা চিন্তা করুন। আমার বিশ্বাস, মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের বাণী সকল দেশের সদ্ধর্মীদের জন্য অবশ্যই পালনীয়—বিশেষত এই দেশে—কারণ এদেশ তাঁর জন্মভূমি।

মিত্রানন্দ জানতো না এই প্রকার একটি নির্দেশ মহাপণ্ডিত দান করেছেন। দীপঙ্করের তিব্বতে পরিনির্বাণ হয়েছে সে আজ প্রায় শতাব্দকালের কথা। তাঁর গ্রন্থগুলির কয়েকখানি, শোনা যায়, জগদ্দলে আনা হয়েছে। অতঃপর সেগুলির কি হলো, সন্ধান নেই। নিরঞ্জন কোথায় শুনেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সংঘের করণীয় বিষয়ের নির্দেশটি সেই জানে। তবে মনে হচ্ছে, নিরঞ্জন অধিক আবেগপ্রবণ, সে আবেগ নিয়ে একটি সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই সে বাধা দিলো। বললো, না এখনও সময় হয়নি, ভ্রাতঃ নিরঞ্জন; তোমার বক্তব্যের প্রথম অংশ আমি সমর্থন করি—তোমার বিশ্লেষণও চমৎকার এবং যুক্তিযুক্ত—কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করতে পারি না—আমার বিশ্বাস, এ সিদ্ধান্ত হঠকারী যে, বহিরাগত যবনদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। তোমার বক্তব্যের ঐ অংশ যুক্তিযুক্ত ব'লে আমি মনে করি যে, সত্যই সংঘকে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণও করতে হবে। রাষ্ট্রের শাসন যদি ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে, তাহলে সেই শাসনকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আমার অনুমান, অতীশ সদ্ধর্মীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মের যে পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন, তা সম্ভব হতো না, যদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় সদ্ধর্মীরা মনোযোগী হতেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, সংঘ কি যথেষ্ট শক্তিশালী এখন? ভিক্ষুরা পলায়নপর, শাসকরা মারমুখী। এক্ষেত্রে ব্রাত্য এবং অন্ত্যজ ক্ষেত্রকরেরা দ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেই কি সাফল্য আসবে? কয়েকটি স্থানের সংবাদ আমরা জানি, ডোম এবং চণ্ডালেরা ক্রুদ্ধ হয়ে শাসকদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু সফল হয়নি শেষ পর্যন্ত। শাসকদের আক্রমণে নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; ক্ষেত্রকরেরা কেউ সক্রিয় সহযোগিতা দান করেনি। যদি ধরেও নিই যে দ্রোহ সফল হয়েছে, তাহলে তারপরে কে

নেবে রাজদণ্ড? সামন্ত মহাসামন্তদের স্থানে কারা আসবে? আমার ধারণায় আসে না সমগ্র ব্যাপারটি।

মিত্রানন্দ পুনরায় জানায়, না ভ্রাতঃ নিরঞ্জন, এখনও সময় হয়নি, আরও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

নিরঞ্জনের ঋজুদেহ অধিকতর ঋজু হয়। দুই চক্ষুতে বিদ্যুৎ চমকিত হয়—সে দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত ক'রে উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীকে দেখে নেয়। তারপর মিত্রানন্দের উদ্দেশে বলে, না ভ্রাতঃ মিত্রানন্দ, আমাদের অপেক্ষার আর সময় নেই। মগধ এখন যবন সেনাদলের অধিকারে। ওদন্তপুরী বিহার তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। গৌড় পর্যন্ত আগমন এখন তাদের ইচ্ছার ব্যাপার মাত্র—চলে এলেই হয়।

এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে আর আমাদের ভূমিকা কোথায়? অন্য এক ভিক্ষু প্রশ্নটি করে। বলে, আমরা দ্রোহ করলাম, রাজাকে বিতাড়ন করলাম, আর রাজ্যের অধিকারী হয়ে গেলো যবন রাজা—এ কেমন ব্যবস্থা হবে, চিন্তা করেছেন?

হ্যাঁ, চিন্তা করেছি, নিরঞ্জন জানায়। বলে, যবনরা বহিরাগত, এসেছে, ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যাবে। তারপর আর কে? তারপর তো আমরা, প্রকৃতিপুঞ্জ। আমাদেরই মনোমতো নির্বাচিত রাজা আমাদের শাসন করবেন, যেমন একদা করেছিলেন গোপালদেব।

নিরঞ্জনের অদ্ভুত শাণিত যুক্তি—এবং অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত তার বক্তব্য—কিন্তু তথাপি মনে হয় না যে তার কথায় কারও মনে আস্থার ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে। বসন্তদাসের নিজেরও মনে হয় সমস্ত পরিকল্পনাটিই মিথ্যা ও সুযোগ সন্ধানের উপর নির্মিত। যেন আর এক কৌটিল্যের প্রজ্ঞা। আর সেই সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত অহেতুক উচ্চাশা।

বসন্তদাস দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখছিলো এবং শুনছিলো। তার নিকটেই কয়েকজন শ্রমণও দাঁড়িয়ে ছিলো। লক্ষ্য করলো শ্রমণরা স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য করছে। তাদের মধ্যে তীব্র ক্রোধ এবং আক্রোশ—তারা চিৎকার করে নিরঞ্জনকে সমর্থন জানাচ্ছে।

কিন্তু সে নিজে নিরঞ্জনের বক্তব্যকে যুক্তিসহ বলে গ্রহণ করতে পারছিলো না। তার মনে হচ্ছিলো, এরা অর্থহীন একটা উচ্চাশা নিয়ে বসে আছে। মাত্র জনা কয় ভিক্ষু গ্রাম গ্রামান্তরে চণ্ডাল ব্রাত্যদের বলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ জেগে উঠবে? বিদ্রোহ কি অতোই সহজ? তার অনুমান, এরা প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানে না—গ্রামে ব্রাত্য আর কয়জন? অধিকাংশই তো ক্ষেত্রকর। ক্ষেত্রকরেরা সদ্ধর্মীদের কথা শুনবেই, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ঐ সময় একজন ভিক্ষুর বক্তব্য তার শ্রবণে আসে। খর্বকায় প্রৌঢ় ভিক্ষুটি গম্ভীর স্বরে কথা বলছিলেন, বসন্তদাস শুনলো।

ভ্রাতা নিরঞ্জন উচিত কথা বলেছেন, তাঁর কথা আমি সমর্থন করি। তবে তাঁর মূল প্রস্তাবটির বিচার হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলছেন, সংঘকেই সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে—রাষ্ট্র ব্যাপারেও সংঘের ভূমিকা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, সংঘের কথা কেউ চিন্তা করেছেন?

আমার তো মনে হয় না, কোনো লোক আমাদের ধর্ম অনুসরণ করতে আসবে। আমাদের মধ্যে কতো বিভাগ, চিন্তা করে দেখুন। সিদ্ধাচার্যরা কতো প্রকার সাধনরীতির কথা বলেন। সংসারত্যাগী সাধকদের ঐ সাধনাচার কি সকলের জন্য গ্রহণীয়? আপনারাই বলুন? আর যদি সাধারণ মানুষ আমাদের সহজভাবে গ্রহণ না করতে পারে, তাহলে আমাদের স্থান কোথায়? আপনারা চিন্তা করুন, আমাদের প্রকৃত শক্তি কতখানি। পক্ষান্তরে দেখুন, একজন গ্রামপতি কিরূপ শক্তিমান। দুই চারিজন সামন্তানুচরই একখানি সম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংস করে দিতে পারে। গ্রামবাসীরা জানে না প্রতিবাদ কাকে বলে, সমস্তই তারা ললাটলিপি বলে গ্রহণ করে।

তাহলে কি আমরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট থাকবো? নিরঞ্জনের স্বরে তীব্র বিদ্রূপ।

না, তা কেন, জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরা সমস্বরে বলতে লাগলেন, আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন—সংঘকে শক্তিশালী করা, জনগণকে সত্যধর্মে দীক্ষা দেওয়া, এই সকল কাজ আমাদের অবশ্যই ক'রে যেতে হবে। অপেক্ষা ব্যতীত এখন আর আমাদের পথ নেই।

শুধু অপেক্ষাই নয়, আমার মনে হয়, আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত সমাজের সকল শ্রেণীর সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টি করা।

বসন্তদাস দেখলো, দূরে প্রায়ান্ধকার ছায়ায় একজন ভিক্ষু উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে মৃদু কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেলো। কোলাহল শান্ত করার জন্য মিত্রানন্দ চিৎকার ক'রে বললো, বলুন শিবানন্দ, আপনার বক্তব্য বলুন।

সদ্ধর্মী ভিক্ষুটির নাম শিবানন্দ, অদ্ভুত কাণ্ড বলতে হবে, বসন্ত অবাক হয়। পার্শ্ববর্তী শ্রমণটি জানালো, লোকটির মস্তিষ্কে দোষ আছে—উনি সর্বধর্মের সমন্বয় চান—তাঁর ধারণা, শিব বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

শুনুন, ভিক্ষু শিবানন্দের কথা শুনুন।

যা বলছিলাম, সদ্ভাবের কথা, শিবানন্দ বলতে লাগলেন, আমাদের সদ্ভাব ও মিত্রতা করতে হবে, রাজশক্তির সঙ্গে। তাদের বোঝাতে হবে প্রকৃত পরিস্থিতিটি কি—

ভিক্ষু শিবানন্দ কি শৃগাল সমীপে মিনতি করতে বলেন, কুম্ভীর শাবকদের যেন সে ভক্ষণ না করে? একজন তরুণ শ্রমণ প্রশ্নটি করে।

না, তা নয়, ব্যাঘ্রকে করজোড়ে অনুরোধ করতে হবে, প্রভু আপনি তৃণ ভোজন করুন! সহাস্যে মন্তব্য করে অন্য আর এক তরুণ ভিক্ষু।

নিরঞ্জন পুনরায় উঠে দাঁড়ায়। বলে, ভিক্ষু শিবানন্দ, আপনার প্রস্তাব উত্তম। অবশ্যই আমরা সদ্ভাব ও প্রীতির হস্ত প্রসারণ করবো। কিন্তু প্রশ্ন, সদ্ভাব ও প্রীতি কিসে উপজাত হয়? নিশ্চয়ই বিশ্বাসে, আন্তরিকতায়, উদারতায়—কিন্তু তার চিহ্ন কি কোথাও দেখেছেন সেন রাষ্ট্রব্যবস্থায়?

সে ত্রুটি তো উভয় পক্ষেই নিরঞ্জন, শিবানন্দ ক্ষুব্ধ স্বরে জানান, সদ্ধর্মীরাও তো উদার হতে পারছে না!

এ আপনি কি বলছেন ভিক্ষু শিবানন্দ? সদ্ধর্মীরা যদি উদার না হয় তো উদার কে? নিরঞ্জন বলতে থাকে, মহারাজ শশাঙ্ক এই পুন্ড্রবর্ধনের কতিপয় সদ্ধর্মীর বিসদৃশ আচরণের কারণে কয়েক সহস্র সদ্ধর্মীকে হত্যা করেছিলেন, সে কথা স্মরণ করুন—স্মরণ করুন, সোমপুর বিহারের কথা—মহারাজ জাতবর্মণের সৈন্যদল বিহার ধ্বংস করে প্রধান ভিক্ষুকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো। একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানও কি সামান্যতম রাজানুকূল্য পেয়েছে সমগ্র সেন শাসনকালে? বলুন, দেখাতে পারবেন কোনো প্রমাণ? আপনি উদারতার কথা বলছেন, সেন রাজাদের মতো যদি হতেন পাল রাজারা, তাহলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ অঞ্চলে থাকতে পারতো? ও কথা বলবেন না—রাজপুরুষদের সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব নয়, অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই। আসুন, আমরা ভিক্ষুমণ্ডলীর এই সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করি যে, সেন রাজশক্তি লুণ্ঠক, অপহারক ঘাতক এবং নারী হরণকারী, এই রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের সকল বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে—তাই আমরা এই রাজশক্তির অপসারণ চাই।

অসম্ভব, মিত্রানন্দ তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে। চিৎকার করে জানায়, ভিক্ষুসভায় এ প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব নয়—এ প্রস্তাব ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রসূত, হঠকারী এবং একদেশদর্শী। আমরা মনে করি, এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে যবনদের আগমনের পথ সুগম হবে—সে ব্যবস্থা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা অবশ্যই মানব মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবো, প্রয়োজন হলে শতাব্দকাল পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে—কিন্তু বহিঃশক্তির এ দেশে আগমন সহ্য করবো না, আমাদের সংগ্রাম আমাদেরই করতে হবে। আমরা যবন আহ্বানের বিপক্ষেই অভিমত জ্ঞাপন করি। আসুন, সেইমর্মে প্রস্তাব গৃহীত হোক।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, না-না, এই প্রকার কোলাহল উঠলো। ভিক্ষুরা একে একে সভাস্থল থেকে বাহিরে চলে যেতে আরম্ভ করলো। এবং এক সময় দেখা গেলো, সভাস্থলে কেউ নেই, সকলেই বাহিরে।

নিরঞ্জনকে দেখলো বসন্তদাস। অতিশয় ক্ষুব্ধ মুখভাব, বাহিরে এসে চীবরের প্রান্তখানি স্কন্ধে তুলে অগ্রসর হচ্ছিলো। বসন্তদাস ডাকলো, ভিক্ষু নিরঞ্জন, আপনার সঙ্গে দু'টি কথা আছে আমার।

নিরঞ্জন দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বসন্তদাসের মুখে। তারপর জানতে চায়, আপনি কে?

আমার নাম বসন্তদাস, আমি সদ্ধর্মী নই, তবে বলতে পারেন আপনাদের একপ্রকার সহগামী।

মুহূর্তে নিরঞ্জনের মুখভাব শান্ত এবং ধীর হয়, নমস্কার ক'রে বলে, বলুন আপনার কী কথা আছে?

আপনি ছায়াবতীর কোনো সংবাদ জানেন?

নিরঞ্জনের ভ্রূরেখা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়। বলে, হ্যাঁ, ছায়াবতী আমার ভগিনী, তাঁর কোনো সংবাদ আছে?

হ্যাঁ, তিনি আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন—আপনি কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না?

নিরঞ্জন হাসে। বলে, নারীদের নিয়ে সমস্যা কি জানেন, তাঁরা চিরন্তন মাতা এবং ভগিনী। তিনি জানেন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি—গৃহীর মানসিকতা আমার নেই, তথাপি তিনি আমাকে কাছে পেতে চান—আমার কি সময় আছে, আপনিই বলুন? তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, আমি অবশ্যই কদম্বঘাটে যাবো, তবে বিলম্ব হবে। জানাবেন, আমি সুস্থ আছি, ভগবান তথাগতের কৃপায় সুখী আছি।

সবিনয়ে নমস্কার ক'রে অতঃপর নিরঞ্জন আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়।

বসন্তদাস দেখলো, দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছে তরুণ ভিক্ষুটি। মস্তক উন্নত, গম্ভীর এবং ধীর। মনে মনে সে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলো না। এ তরুণ সাধারণ ভিক্ষু নয়, সে বুঝলো, এ সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারবে।

মিত্রানন্দ হতাশ। সভায় সিদ্ধান্ত কিছুই হলো না। মহাভিক্ষু জ্ঞানানন্দ সাধারণ ভিক্ষুদের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন—তা আর জানানো সম্ভব নয়। বসন্তদাসকে ডেকে বললো, বসন্ত তুমি কি এবার যাবে?

মিত্রানন্দ আর কী করবে—তার কোনোই কাজ নেই। সেও একপ্রকার হতাশ। আশা ছিলো, সদ্ধর্মীরা মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে একটি ঐক্যভাব সৃষ্টির চেষ্টা করবে। তাতে অন্যকিছু না হোক, অন্তত সামন্ত মহাসামন্তরা কিছুকালের জন্য দমিত থাকতো। কিন্তু দেখছে, সে পথ একেবারেই বন্ধ—সদ্ধর্মীরা রাজশক্তির মিত্র হতে চায় না। কী যে তারা চায়, কিছুই অনুমান করা গেলো না। একপক্ষ যা চায়, অন্যপক্ষ চায় তার বিপরীত। সুতরাং আর পুন্ড্রনগরীতে অবস্থান কেন? এবার সে যাবে। বললো, মিত্রানন্দ, আমার আর বিলম্ব করে কোনো লাভ আছে, বলো?

না, আর কি লাভ বিলম্ব ক'রে, মিত্রানন্দ জানায়, আমিও এ স্থানে থাকবো না, তবে একটি কাজ এখনও বাকি আছে—আর একটি সংবাদ জানা প্রয়োজন, সেটি হলে আমিও যাবো—তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। ভিক্ষুরা উপাসনার আয়োজন করছিলো। মিত্রানন্দের এক সহচর এসে জানালো, আসুন উপাসনার আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে।

মিত্রানন্দ বললো, তুমি যাও, আমি আসছি।

লোকটি চলে গেলে সে আবার বললো, বসন্ত, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

কোথায়, উপাসনায়?

না, আমি যেখানে যাবার কথা বলছিলাম।

অধিক দূরে কি?

না, দূরে নয়, নিকটেই, নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে।

চলো যাই।

তাহলে তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও, উপাসনা আরম্ভ হলেই আমি চলে আসছি—বিলম্ব হবে না।

সত্যই অধিক বিলম্ব হলো না। অল্পক্ষণ পরই ফিরে এলো বসন্ত। বললো, এবার চলো।

সন্ধ্যা গত হয়েছে, তথাপি পশ্চিম আকাশে পাটল মেঘগুলির প্রান্তভাগ রক্তিম ভাব। সেদিকে ইঙ্গিত করে মিত্রানন্দ বললো, দেখেছো, আকাশে কেমন রঙ?

হ্যাঁ, যেন সিন্দুর বর্ণ।

না বসন্ত, আমার মনে হয়, বর্ণটি রক্তের মতোই, সন্ধ্যারম্ভে তুমি দেখোনি, দেখলে বুঝতে। বৃদ্ধরা বলে, আকাশে ঐরূপ রক্ত বর্ণের মেঘ রক্তপাতের ইঙ্গিত বহন করে।

ওসব কুসংস্কার মাত্র, লোকের কল্পনা।

কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছে, ঐ সময়ই আবার অদূরে একটি পথকুক্কুর কেঁদে উঠলো।

শুনছো বসন্ত?

হ্যাঁ, পথকুক্কুর কাঁদছে—পথকুক্কুর কাঁদলে মন্বন্তর হয়, এই প্রকার লোকপ্রবাদ আছে।

তুমি বিশ্বাস করো?

না, মিত্রানন্দ। এসব আমার বিশ্বাস হয় না—জ্যেষ্ঠী, শূন্যকুম্ভ, শৃগাল, গোধিকা—এসব দেখলে নাকি বহুকিছু হয়, সর্বই অমঙ্গল-চিহ্ন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

আমারও হয় না, মিত্রানন্দও জানায়। তারপর বলে, কিন্তু মধ্যরাত্রে গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে যখন কুক্কুরের ঐ প্রকার কান্না ওঠে, তখন সত্যই ভয়াবহ কিছু ঘটবে ব'লে আশঙ্কা হয়। আজ ক'দিন ধরেই সন্ধ্যাকাশে রক্তিমাভা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বাস করি না, তথাপি মনের মধ্যে কেমন আশঙ্কার ছায়া দোলে।

যে স্থানে মিত্রানন্দ নিয়ে এলো সেটি একটি যবন কেন্দ্র। দ্বারদেশে বহু লোক। সকলেই বলছে, দরবেশ দর্শন চাই, দরবেশ দর্শন চাই।

বসন্তদাস শুনে অবাক। জানতে চাইলো, দরবেশ কি বস্তু? এ কি কারও নাম?

হ্যাঁ, যবনদের এ স্থানীয় প্রধানকে এরা দরবেশ ব'লে থাকে—শব্দটি যাবনী ভাষায়—এর অর্থ নাকি সংসার ত্যাগী সাধুপুরুষ।

বিচিত্র স্থান, দ্বারদেশে নারী পুরুষের কোলাহল, কিন্তু অভ্যন্তর একেবারেই নীরব। প্রলম্বিত শ্বেতবস্ত্রধারী, দীর্ঘদেহ, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, ধীর পদে যবনেরা গমনাগমন করছে। তাদের দেখিয়ে মিত্রানন্দ বললো, এরা এই কেন্দ্রের অধিকারীটির শিষ্য—প্রত্যেকেই ধর্মপ্রাণ।

বসন্তদাসের মনে পড়লো দেবীকোট মেলার সেই যবন বৃদ্ধটির কথা। বললো, এরা তো দেখছি শান্ত এবং ভদ্র—কিন্তু জনরব যে শুনি, যবন জাতি নাকি নিষ্ঠুর এবং দুর্ধর্ষ? এরা কি সত্যই এক জাতি?

আমি বলতে পারবো না। পরিচিত মুখ দেখে মিত্রানন্দ ডাকলো, এই যে মহাশয়, শুনছেন?

এক যবন পুরুষ সম্মুখে এগিয়ে এলো। মুখে স্মিত হাস্য। বললো, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কি সংবাদ? বহুদিন পরে এলেন মনে হচ্ছে?

মহাত্মা আহমদের সঙ্গে কি সাক্ষাৎ হবে? মিত্রানন্দ জানালো, বলবেন, মহাভিক্ষু জ্ঞানানন্দের একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি।

নিশ্চয় সাক্ষাৎ হবে, আসুন।

লোকটি নিজ ভাষায় অপর একজন সহচরকে কিছু বললে সহচরটি দ্রুত প্রস্থান করে। অতঃপর এক কুটিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে একটি বেদী দেখিয়ে লোকটি বলে, এখানে বসুন, আমি প্রভুকে আপনার আগমন সংবাদ দিয়ে আসি।

কুটিরের সম্মুখে কয়েকজন লোক অপেক্ষমাণ। দেশীয় লোক তারা, কেন অপেক্ষা করছে, কিছুই অনুমান করতে পারে না বসন্তদাস।

ক্ষণকাল অতিবাহিত না হতেই দেখা গেলো, একটি লোক ক্ষুদ্র একটি কলস এবং পানপাত্র এনে সম্মুখে রাখছে। লোকটি নিজ ভাষায় কিছু ব'লে ইঙ্গিত করলো। বোঝা গেলো, ঐ পানীয় পান করতে হবে। বসন্তদাস অনুমান করে, নিশ্চয়ই কোনো প্রকার আসব। সে উৎফুল্ল বোধ করলো, যাক, বহুদিন পর আসব পানের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু পান করে দেখলো নিতান্তই মিষ্ট জল—তবে সুগন্ধী এবং তৃপ্তিদায়ক।

পান শেষ হবার পূর্বেই প্রথম লোকটি ফিরে এসে জানালো, বন্ধু মিত্রানন্দ, আসুন, এখনই তিনি আপনাদের সাক্ষাৎ দান করবেন।

কুটিরের ভিতরটি শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত। এক প্রান্তে কৃষ্ণাম্বরধারী শক্তিমান এক প্রৌঢ় বসে আছেন। নিকটেই কোথাও ধূপজাতীয় কিছু দগ্ধ হচ্ছে, সুগন্ধে কক্ষটি আমোদিত। প্রৌঢ়ের সম্মুখে একটি উপাধান, সেই উপাধানের উপর একখানি পুঁথি। মনে হলো, কিছুক্ষণ আগেও পুঁথি পাঠ হচ্ছিলো।

দু'জনে সম্মুখে বসে প্রথমে প্রণাম জানালো। সাধুপুরুষ বললেন, ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর। তারপর জানতে চাইলেন, মিত্রানন্দ, তোমাদের সমস্ত কুশল তো, মহাভিক্ষু জ্ঞানানন্দ কি ফিরেছেন?

আজ্ঞে না।

না ফেরাই মঙ্গল। ইনি কে? বসন্তদাসের মুখপানে দৃষ্টিপাত করলেন সাধুপুরুষ।

ইনি আমার মিত্র, এবং সহগামী।

উত্তম, বলো, কী সংবাদ?

অর্হৎ জ্ঞানানন্দ আপনার অভিমত জানতে চেয়েছেন—যবন সেনাদলের সঙ্গে কী সম্পর্ক হবে আমাদের? মিত্রতার, না অসহযোগের?

সাধুপুরুষ স্মিত হাসলেন। বললেন, যারা আসছে তারা ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, অসহযোগিতা করে কী লাভ বলো? আমি তো মনে করি, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রথম সম্পর্কই হওয়া উচিত মিত্রতার।

কিন্তু একটি বিষয় চিন্তা করার আছে, এই পর্যন্ত বলে সাধুপুরুষটি বিরত হলেন। নিজ ভাষায় মৃদুকণ্ঠে মন্ত্রজাতীয় কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন, চিন্তার বিষয়টি হচ্ছে, কার সঙ্গে মিত্রতা করবে? তারা কি মিত্রতার হস্ত সম্প্রসারণ করে দিয়েছে তোমাদের দিকে? যারা তরবারি উত্তোলন করেছে আঘাত করার জন্য, তোমার হস্ত সম্প্রসারণ করে দিলে তাদেরই দিকে, তাতে ফল কী হবে? তোমাদের হাতগুলি অহেতুক ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং কার সঙ্গে মিত্রতা, সেইটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। জ্ঞানানন্দকে ব'লো আমি সংবাদ পেয়েছি যে সদ্ধর্মীদের কেউ কেউ সামন্তপতিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যবন বাহিনীকে পথ দেখিয়ে আনতে চান—সাবধান, ঐ কাজ যেন কেউ না করে—এই যবনেরা তুর্কি, এরা বর্বর, জ্ঞান বিদ্যা ধর্ম কোনো কিছুতেই এদের শ্রদ্ধা নেই। এদের ডেকে আনা আর আত্মঘাতী হওয়া একই ব্যাপার।

প্রভু, আপনি কি মনে করেন, যবন সেনারা এদেশে আসবে? বসন্তদাস প্রশ্নটি না করে পারে না।

অবশ্যই আসবে—দস্যু যদি জানতে পারে যে দস্যুবৃত্তি করলে কেউ বাধা দেবার নেই, তাহলে সে কি করে, বলো?

তা'হলে এদেশের মানুষের উপায়?

উপায় তো আমি দেখি না, পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা ব্যতীত। তবে মনে হয় না, তারা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারিবে, কারণ তাদের সংখ্যা অধিক নয়।

আর একটা কথা বলি তোমাদের, মহাত্মা আহমদ জানান, যারা বহিরাগত, তারা যদি মনে প্রাণে বহিরাগতই থেকে যায়, তাহলে এদেশে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু যদি তারা মৃত্তিকালগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে, প্রকৃতিপুঞ্জের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, তবে কিন্তু তাদের এদেশ থেকে বিতাড়ন করা অসম্ভব হবে।

ঐ পর্যন্তই কথা। দু'জনে উঠে আসছিলো। সাধুপুরুষটি বললেন, তোমরা সাবধানে নগরীতে থাকবে—আমি সংকেত পেয়েছি, যবনেরা রাজধানী আক্রমণ যে কোনোদিন করতে পারে। যদি আগামীকালই শুনতে পাই যে এই নগরীও আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে আমি অবাক হবো না।

এই পর্যন্ত ব'লে তিনি হাসলেন। বললেন, জ্ঞানানন্দকে ব'লো তো, তিনি আমাদের ধর্মগ্রহণ করবেন কি না? তোমাদের ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের তো বহু সাদৃশ্য আছে, সেটি জানো তো?

ঐ কথার পর হাসতে হাসতে বিদায়।

বাইরে এসে মিত্রানন্দ বললো, দেখলে তো? যবন সেনাদল সম্পর্কে যবন সাধুপুরুষটির কী ধারণা? নিরঞ্জন হঠকারী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

বহির্দ্বারের নিকটে এসে হঠাৎ বসন্তদাস দাঁড়ালো, আশ্চর্য, এ কে? উজুবটের লীলাবতী না?

তরুণীটিকে দেখলো মিত্রানন্দও। বললো, তুমি ওকে চেনো?

হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর বাল্যসখী, ও এখানে কেন?

নিকটবর্তী হতেই লীলাবতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ভ্রাতঃ আপনি?

হ্যাঁ, তুমি এখানে কেন?

তারপর লীলাবতী কাঁদলো হাসলো ক্রমান্বয়ে কয়েকবার এবং ঐ হাসি কান্নার মধ্যেই নিজ দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করলো। শেষে জানতে চাইলো, মায়াবতী কেমন আছে, তার বিপদ হয়নি তো?

অল্প সময়, কতোটুকুই বা বলা যায়। কখনও এ কথা মনে হয়, কখনও ও কথা মনে হয়। বসন্তদাস লক্ষ্য করলো, লীলাবতীর কথায় সংলগ্নতা নেই।

অদূরে মিত্রানন্দ অপেক্ষা করছিলো। সে বললো, এখন যাই লীলা, পরে সাক্ষাৎ হবে।

মিত্রানন্দকে আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই। সবই তো জানা হয়ে গেছে। কি অসম্ভব দুরাশা মিত্রানন্দের। কতো স্বপ্ন, মানুষের মুক্তি হবে দাসত্ব থেকে, যুগযুগ ধরে লাঞ্ছিত মানুষ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত হবে, মানুষের সৃজন ক্ষমতা শত স্রোতোধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ কী হতে যাচ্ছে, মিত্রানন্দ?

মিত্রানন্দ নীরব। কতো দীর্ঘ পথ তাকে পরিক্রমা করতে হয়েছে। কোথায় পট্টিকেরা রাজ্য আর কোথায় জগদ্দল মহাবিহার। সমগ্র ভূ-ভাগের ধূলিকণা তার দুই পায়ে লেগে আছে—সমস্তই কি বৃথা? কৃষ্ণা শুক্লা বিভাবতীর লাঞ্ছনা, সেও কি বৃথা? তার মন স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু স্বীকার না করেও উপায় নেই। সে বসন্তদাসের হাত ধরলো। বললো, মিত্র বসন্ত, আমাদের স্বপ্ন রচনা কি স্বপ্নই থেকে যাবে? এতো শ্রম, এতো স্বেদ, এতো আত্মদান—সমস্তই বৃথা? বলো, তোমারও কি মনে হয় সমস্তই বৃথা যাবে?

বসন্তদাস রাত্রির আকাশে নক্ষত্রমালা দেখে। কোন তারকাটির নাম সে কৃষ্ণা রেখেছিলো, এখন সন্ধান ক'রে পায় না। বলে, না মিত্রানন্দ, ও কথা আমার কাছে জানতে চেয়ো না—আমি বলতে পারবো না। কারণ, আমি জানি না।

তাহলে কে জানে? মিত্রানন্দ বিভ্রান্ত বোধ করে। একদিকে হতাশা আর অন্যদিকে বেদনা। কিছুই কি করণীয় নেই? পথক্রমণকালে তার মনে নানান চিন্তা আলোড়িত হয়। জগৎ কি বস্তুপুঞ্জ মাত্র। জীব কি তাহলে বস্তুতেই জাত হয় এবং বস্তুতেই হয় বিলীন? অনন্ত তার বন্দীদশা—বস্তুকে অতিক্রম করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই? যদি থাকতো, তাহলো জ্ঞান এবং করুণার আবির্ভাব অবশ্যই প্রত্যক্ষ করা যেতো—বিচ্ছিন্ন মানুষ ঐকমত্যে উপনীত হতে পারতো। কিন্তু তা তো হলো না। অথচ তার বিশ্বাস ছিলো একটি ঐকমত্য হবে। কারণ জ্ঞানানন্দ বলেছিলেন, চিন্তা ক'রো না মিত্রানন্দ, বস্তুময়

জগৎ পরুষ, কঠোর এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্মমও বটে, কিন্তু এও আবার সত্য যে ঐ বস্তুময় জগতে অবগাহন করেই জীবসত্তা জ্ঞানের অধিকারী হয়। সুতরাং সাময়িক বিপর্যয় দেখে ভীত হবার কারণ নেই—দেখবে, ঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়ে যথাসময়েই জ্ঞান এবং করুণার আবির্ভাব হচ্ছে, আর তা হলেই তখন আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

জ্ঞানানন্দের ঐ স্থির বিশ্বাসের এখন কি হবে? সে ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারটি ঘটেছে। নিরঞ্জনের মতো নিষ্ঠাবান ভিক্ষুও হিংসাকে প্রতিরোধ করতে চায় প্রতিহিংসা দিয়ে—অত্যাচারী ভ্রাতাকে বিতাড়ন করার জন্য বহিরাগত দস্যুকে আহ্বান করতে দ্বিধা নেই তার। সুতরাং সকল উদ্দেশ্যই তার বিফলে গেলো। এ অবস্থায় জীবের রক্ষা এখন কীভাবে সম্ভব? সে চিন্তা করে কূল পায় না।

ত্রিশরণ মন্ত্রটি সে এখন প্রায় সর্বক্ষণই মনে মনে জপ করে, কিন্তু তথাপি স্বস্তি বোধ হয় না। চক্ষু মুদিত করলে দিব্যচক্রটি আর সে দেখে না—দেখে লেলিহান অগ্নিশিখা এবং রক্তস্রোত। মনে হয়, বহুদূরে কোথায় যেন অসংখ্য আর্ত মানুষ হাহাকার করে যাচ্ছে। ফলে সে প্রায় নীরবেই পথ চলে।

বসন্তদাস জিজ্ঞাসা করে, সখা, তুমি কী ভাবো, বলো তো?

মিত্রানন্দ ম্লান হাসে। বলে, নতুন কিছু নয় বসন্ত, পুরাতন কথাই ভাবি—চিন্তা হয়, ভবিষ্যতে কী হবে।

বসন্ত দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে বলে—আর ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে কি আর লাভ আছে কিছু! বরং এখন কী করবে সেইটি চিন্তা করো।

আমার তো করণীয় কিছু নেই এখন, মিত্রানন্দ জানায়। তারপর বলে, তুমি কি কিছু করবে ব'লে ভাবছো?

নাহ্, আমি আর কী করবো—ভাবছি সত্বর গৃহে ফিরবো—তুমি?

আমি, মিত্রানন্দ দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলে, হ্যাঁ, আমাকেও ফিরতে হবে—মহাভিক্ষু জ্ঞানানন্দের সন্ধান ক'রে তাঁর কাছে যাবো।

তারপর?

তারপর আর জানি না।

বসন্তদাসের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—যদি জানাই না থাকে তোমাদের, তাহলে কেন এতো আয়োজন করতে নেমেছিলে? যারা তোমাদের ভরসায় নবীন আশায় উজ্জীবিত হয়েছিলো, তাদের কী হবে? প্রশ্নটা জাগে বসন্তদাসের মনে, কিন্তু প্রকাশ করে না সে। মিত্রানন্দ নিজেই যে অসম্ভব মনোকষ্টে পীড়িত হচ্ছে সেটা তো তার অগোচর নয়। সুতরাং কিছু বলতে পারে না সে। একত্রে পথ ভ্রমণ তাদের—কিন্তু দু'জনের মধ্যে বিপুল একটা দূরত্ব থেকে যায়।

সন্ধ্যাকালে পথিপার্শ্বের এক গ্রামে তারা যাত্রা বিরতি করে। দেহ আর চলছিলো না। দুই দিবসের ক্রমাগত, এবং বিরতিবিহীন পদক্ষেপণ—শরীরের দোষ কি! গ্রাম প্রান্তের মন্দিরটি দেখে বসন্তদাস বললো, সখা চলো, এই মন্দিরেই আশ্রয় নেওয়া যাক।

মন্দিরটি শিবের, এবং অতিশয় প্রাচীন। গর্ভগৃহে একটি তৈল দীপ জ্বলছিলো। কিন্তু নিকটে কোনো জনপ্রাণী দেখা গেলো না।

মন্দির সংলগ্ন কুটির আছে একটি—কিন্তু সেখানেও কোনো মানুষ আছে ব'লে মনে হলো না। ক্রমে এক সময় দু'জনেরই সন্দেহ হলো, এ তারা কোথায় এসেছে? সমগ্র গ্রামটিই যে নিঃশব্দ। কোনো গৃহে শিশুর রোদন নেই, প্রদীপালোক নেই কোনো গবাক্ষে, রমণীকণ্ঠের তীব্র কলহ শোনা যাচ্ছে না একবারও। অদ্ভুত কাণ্ড—দু'জনেই হতবাক হয়—গ্রামের লোকেরা গেলো কোথায়?

বসন্তদাসের আশঙ্কা হয়—তবে কি এই গ্রামটিও উপদ্রুত হয়েছে? কয়েকটি গৃহের দ্বারদেশ পর্যন্ত সন্ধান করে তারা দেখে, না—সত্যই কোনো জনপ্রাণী নেই। তবে এও বোঝা যায় যে গ্রামখানি আক্রান্ত হয়নি। হলে, কুটিরগুলির দশা অক্ষত থাকতো না। মনে হয় এরা নিকটস্থ বনভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে—মিত্রানন্দ নিজ অনুমানের কথা ব্যক্ত করে। বলে, দেখছো না, এই গ্রামের অবস্থান একেবারেই পথের উপর।

মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে বসন্তদাস বলে, সখা, এ গ্রামে রাত্রিযাপন বোধ হয় সমীচীন হবে না।

কেন? মিত্রানন্দ হাসে। বলে, তোমার কি ভয় হচ্ছে?

বসন্তদাস হাসে না। বলে, অবশ্যই হচ্ছে—ভয়ের কারণ থাকলেও যে ভয় না পায়, সে তো নির্বোধ।

মিত্রানন্দ পুনরপি হাসে। বলে, মিত্র বসন্ত, ভয় পেয়ে কোনো লাভ আছে, বলো? ভয়ের কারণ যেক্ষেত্রে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র উপস্থিত, সেক্ষেত্রে ভয়ের কি আর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকে? ভয় পেয়ে তুমি নিজেকে কোথায় লুক্কায়িত করবে? বরং ও চিন্তা ত্যাগ করো—মনে করো, তথাগতের যা ইচ্ছা, তাই হবে।

বসন্তদাস মিত্রানন্দের মতো হতাশ হতে পারে না। বলে, মিত্রানন্দ, ভীতির একটা মঙ্গলজনক দিক কী জানো? ভীতি জীবনকে অন্তরাল করে রাখে—আর তাতে সে বাঁচে।

ধিক অমন বেঁচে থাকায়!

তুমি ধিক্কার দিতে পারো, বসন্তদাস বলে, কিন্তু আমার কাছে বাঁচবার ঐ কৌশলটি ধিক্কারের বস্তু বলে মনে হয় না। কারণ জীবের প্রাণরক্ষা করা মানুষের একটি পবিত্র কর্তব্য—নিজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও। চিন্তা ক'রে দেখো, জীব থাকলেই না জগৎ আছে, এবং তা থাকলে তবেই না পরিবর্তনের সম্ভাবনাটিও থাকবে।

ধরো, তুমি নির্বোধের মতো প্রাণ দিয়ে দিলে, বসন্তদাস নিজের ধারণা ব্যাখ্যা করে। বলে, তাতে কারও কোনো লাভ হবে, বলো? অহেতুক তোমার প্রাণটি চলে যাবে, বরং তুমি যদি এই দুর্যোগে নিজেকে রক্ষা করতে পারো, তাতে যদি তৃণাদপি নীচ এবং অবহেলিত হতে হয় তোমাকে, তথাপি সেই কৌশলটি তোমার জন্য উত্তম। কারণ তুমি বেঁচে থাকলে প্রাণ বাঁচলো—এবং সেই সজীব জাগ্রত প্রাণ অবশ্যই তোমার আরব্ধ কাজটি একদা সম্পন্ন করবে—যদি না পারে, অন্তত সম্ভাবনাটিকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু প্রাণই যদি না থাকে, তাহলে সকলি তো গেলো। সুতরাং চলো, এই বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করি।

মিত্রানন্দ সম্মত হতে পারে না। বলে, আমি দেখতে চাই বসন্ত, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

ঐ কথায় বসন্ত হাত ধরে মিত্রানন্দের, বলে, তোমাকে এই অবস্থায় ত্যাগ করতে বলো? তা কি আমি পারবো? পারবো না। এদিকে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহলে কী হবে চিন্তা করে দেখো—আমার স্ত্রী, তার উদরের সন্তানটি, নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রীর পিতা-মাতা—এতোগুলি জীবন অকূলে পতিত হবে—সে অবস্থায় আমার প্রাণ দানের কোন যৌক্তিকতা থাকবে বলতে পারো?

মিত্রানন্দ কিছু বলে না ক্ষণকাল। শেষে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলে, চলো, তাহলে।

আহার্য সংগ্রহ করা যায়নি। তারা মন্দির কূপে জলপান করে রাত্রির মধ্যযামে পুনরায় পথে নামে।

কিন্তু দু'জনের পথ কি এক? কতদূর তারা একত্রে যেতে পারবে? একজন গৃহী, অন্যজন ভিক্ষু। একজনের গন্তব্য সংসারে, অন্যজন যাবে সংঘে। সুতরাং পথ শীঘ্রই পৃথক হয়ে যাবে তা দু'জনেই বুঝতে পারছিলো। বসন্তদাসের কষ্ট হচ্ছিলো মনে। বড় আপনজন হয়ে উঠেছিলো দু'জনে পরস্পরের কাছে। মঙ্গলদীপ গ্রামে প্রথম পরিচয়—তারপর কতো ঘটনা এবং কতো দীর্ঘ পথ একত্রে রয়েছে তারা। অবশেষে বিদায়—আর বিদায়ও এমনকালে যে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

তৃতীয় দিবসে অপরাহ্নকালে তারা এক ক্ষুদ্র হাটে উপনীত হলো। জনসমাগম অধিক নয়—কিন্তু বিচিত্র একটি ত্রস্তব্যস্ত ভাব চারিদিকে—প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় সমাপন ক'রে শীঘ্র গৃহে ফিরতে চায় সকলে। তবে হাট ব'লে কথা—তার নিজস্ব স্বভাব কিছু না কিছু থাকবেই। ঐ ব্যস্ততার মধ্যেই কুশল জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে পরিচিত

লোকেরা—পিতার সঙ্গী বালকটি ক্ষুদ্র বংশীটিতে ফুৎকার দিয়ে চলেছে ক্রমাগত—একজন তার কন্যাকে বলছে, তুমি কি ঐ খণ্ড মিষ্টান্নটি নেবে, না এই মঠটি হলে তোমার চলবে—একপ্রান্তে আবার দুটি বানর নিয়ে এক বাজিকর তার ক্ষুদ্র ডমরুটি বাজিয়ে চলেছে। বসন্তদাস চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললো, এ স্থানে লোকদের মধ্যে দেখছি এখনও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়নি।

সে একটি লোককে ডেকে বলে, মহাশয়, এদিকে কি যবন সেনাদলের আগমনের কথা শুনেছেন?

লোকটি হাসে। বলে, তাদের কথা কে না শুনেছে, তবে আমরা ভীত নই—দেখছেন না, নিকটেই আমাদের নদী—এদিকে কোনো অঘটন ঘটলেই আমরা পরপারে চলে যাই।

তাতে লাভ হয় কিছু?

হ্যাঁ, হয়—নদী অতিক্রম করতে যায় না কেউ। লোকটি বিদায়কালে হাসতে হাসতে বলে, মহাশয়, বুদ্ধি থাকলে পুরুষ শ্বশুর গৃহে দেহপাত করতে যায় না কখনও, বুঝলেন?

লোকটি চলে গেলে বসন্তদাস বললো, শুনলে মিত্র, লোকটির কথা? ও কেমন কটাক্ষটি করলো আমার উদ্দেশে?

মিত্রানন্দ হাসে। বলে, এ স্থানের লোকেরা অতিশয় বুদ্ধিমান—সাবধানে কথা ব'লো।

হ্যাঁ তা-ই দেখছি। বসন্তদাস জানায়, কিন্তু নদীর পরপারে গিয়ে আত্মরক্ষার কথাটি চিন্তা করো দেখি—এদের কে বলেছে এই কৌশলের কথা?

মিত্রানন্দেরও আশ্চর্য মনে হয়। তাহলে কি নিজেকে রক্ষার জন্য এরা নিজেরাই যথেষ্ট?

আহারাদি সম্পন্ন ক'রে দু'জনে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিচ্ছে ঐ সময় হঠাৎ দেখা গেলো, হাটের লোকেরা উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে। ব্যাপারটা কী বোধগম্য হবার পূর্বেই বসন্তদাস দু'জন শস্ত্রধারী অশ্বারোহীকে হাটে বিচরণ করতে দেখলো।

মিত্রানন্দ বললো, এরা মনে হচ্ছে যবন সেনা, হঠাৎ এখানে কেন? তার প্রশ্নের উত্তর তখন কে দেবে। বসন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বললো, চলো, আমরা বিদায় হই।

হাটে তখনও অনেক লোক। প্রত্যেকেই বিমূঢ়—যে যার ভূমিতে স্থির। মিত্রানন্দ বললো, অস্থির হয়ো না—পলায়ন করতে কি পারবে?

সৈনিক পুরুষ দু'টি মনে হয় কোনো লোকের সন্ধান করছে। বার দুই এদিক ওদিক যায়। অতঃপর এগিয়ে আসে মিত্রানন্দের দিকে। বসন্তদাসের ভয় হচ্ছিলো, মিত্রানন্দের ভিক্ষুবেশই তার কাল হয়ে না দাঁড়ায়!

কিন্তু দেখা গেলো, তাদের কোনো হিংস্র অভিলাষ নেই। তারা কোনো এক হর্ষ দত্তের সন্ধান করছে।

মিত্রানন্দ বললো, আমরা দু'জনই বহিরাগত—তবে দেখি, যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে।

পাওয়া গেলো হর্ষ দত্তের সন্ধান। তার নিবাস পলাশবাটি গ্রামে, ক্রোশ দুই উত্তরে—ক্ষণকাল পূর্বেও তাকে হাটে দেখা গেছে—এখন নেই।

সংবাদটি জেনে একজন অশ্ব থেকে অবতরণ করে বললো, আহার্য কিছু পাওয়া যাবে এখানে?

বিপণীতে কয়েকটি মিষ্টান্ন ভাণ্ড ছিলো। সৈনিকটি তার একটি তুলে নিলো। মিষ্টান্ন নিলো, কিন্তু মূল্যদানের ব্যাপারে তার আর ভ্রূক্ষেপ নেই। এদিকে যে প্রৌঢ়াটির বিপণী, সে অতশত বোঝে না। সে অবলীলাক্রমে হস্ত প্রসারণ করে বলে, ও মহাশয়, মূল্য দেননি তো, মূল্য দিয়ে যান।

হায় হায়, করে কি মূর্খ রমণী—অস্ফুটে প্রায় সকল মানুষই বলাবলি করতে লাগলো।

সৈনিক পুরুষটি বারেক ফিরে তাকায়, তারপর পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং মিটি মিটি হাসে—যেন বড়ই কৌতুককর একটি ঘটনা ঘটিয়েছে সে।

প্রৌঢ়াটির সম্ভবত আশঙ্কা হয়ে থাকবে তার মিষ্টান্নগুলি অপহৃত হয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার আরম্ভ করে দিলো। সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো। হ্যাঁরে ড্যাকরা, মূল্য দিবি না কেন, অ্যাঁ? একি তোর মায়ের সেই বস্তু যে মূল্য ব্যতীতই খাওয়া যাবে? তুই ভেবেছিস কি, অ্যাঁ, মূল্য না দিয়েই চলে যাবি—তুই কেন, তোর পিতা এসে মূল্য দিয়ে যাবে—বুঝেছিস, ওরে দগ্ধমুখ হনুমান!

সৈনিকটির দেশীয় ভাষাজ্ঞান সম্ভবত যথেষ্ট নয়। তাকে কী কী বলা হচ্ছে, তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছিলো না। তবে অনুমান করছিলো সে, নিশ্চয়ই তাকে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়ন করা হচ্ছে না। ফলে তার বিরক্তি জাগে সম্ভবত এবং সে ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারিটি কোষমুক্ত করে উর্ধ্বে আস্ফালন করে।

আর তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্তা প্রৌঢ়াটি 'তবে রে' ব'লে একটি ভাণ্ড পূর্ণ ঈষদুষ্ণ মিষ্টান্নরস তার মুখে নিক্ষেপ করে। ঘটনাটি এতোই অভাবিতপূর্ব এবং আকস্মিক যে সৈনিক পুরুষটি বিমূঢ় হয়ে থাকে ক্ষণকালের জন্য। বিলক্ষণ একটি বিচিত্র দশায় পতিত হয় সে ঐ সময়। তার শিরোবেষ্টনী থেকে, শ্মশ্রু থেকে, কেশ থেকে মিষ্টান্নরস ঝ'রে পরিচ্ছদাদি সিক্ত করে দিচ্ছে আর সে তরবারিধৃত হস্তেই চক্ষুমার্জনায় ব্যস্ত। বাম হস্তের মিষ্টান্ন ভাণ্ডটি তখনও সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু করতে হলো। কারণ সুপক্ব মিষ্টান্নরসের মধুর আস্বাদন রসনার পক্ষে সম্ভব—চক্ষুর সাধ্য কি যে সেই মিষ্ট স্বাদগ্রহণ করে? সেখানে আরম্ভ হয় বিপরীত প্রতিক্রিয়া। অসহ্য যন্ত্রণায় সৈনিকটি অস্থির হয়ে পড়ে এবং সে মিষ্টান্ন ভাণ্ডটি ভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে দুই হাতে চক্ষু মার্জনা ও উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে। হাটের লোকেরা কোলাহল করে ওঠে তার অবস্থা দেখে। অপর সৈনিক পুরুষটি তরবারি আস্ফালন করতে করতে বন্ধুর সাহায্যার্থে ছুটে আসে। এদিকে কোন এক দুষ্টমতি বালক প্রজ্বলিত একখানি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে আরোহীবিহীন অশ্বটির সুচিক্কণ পুচ্ছে অগ্নি স্পর্শ করে। ফলে অশ্বটি লম্ফ দিয়ে নিমেষে কোথায় যেন চলে যায়।

মনে হচ্ছিলো, সমূহ একটি সর্বনাশ অত্যাসন্ন। তরবারির আঘাতে ছিন্ন শির ভূলুণ্ঠিত হতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু দেখা গেলো কিছুই ঘটলো না তেমন। দ্বিতীয় অশ্বারোহীটি তার সঙ্গীকে তুলে নিয়ে যথাশীঘ্র হাট ত্যাগ করলো।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটি যেমন আকস্মিক, তেমনই আতঙ্কজনক, আবার সেই প্রকারই হাস্যকর।

মিত্রানন্দ বললো, দেখলে, উন্মাদ রমণীটি কি কাণ্ড করলো—এখন তো এদের আর রক্ষা নেই।

বসন্ত সকৌতুকে হাসছিলো। বললো, সে না হয় হলো—কিন্তু এও তো দেখলে বঙ্গবাসিনী রমণী কিরূপ ভয়শূন্যা হতে পারে। আর নিক্ষেপিত তরবারির বিরুদ্ধে তার অস্ত্রখানি কি প্রকার—কল্পনা করতে পারবে কেউ?

হয়েছে হয়েছে, আর বিলম্ব নয়—মিত্রানন্দ বন্ধুকে তাড়না করে। বলে মূর্খা রমণীর কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে এখন লোকালয়টি ধ্বংস না হয়ে যায়।

বসন্তদাস গম্ভীর হয়। বলে, মিত্র, এদেশে ধ্বংসের কি অবশেষ আছে কিছু? ধ্বংস তো হয়েই আসছে। তুমি ধ্বংসের দিকটা দেখলে, কিন্তু তোমার দেশের এক জননী দস্যু আক্রমণ কীভাবে প্রতিহত করতে পারে, সেটি তোমার দৃষ্টিগোচর হলো না। ভাবো তো, যদি সকল প্রাকৃতজন একত্রে এই প্রকারই প্রতিরোধ করে, তাহলে কী হতে পারে? মিত্র, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা কিছুই করতে পারোনি। যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতজন এইভাবেই প্রতিরোধ করে। লাঞ্ছিত হয়, নিহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তথাপি ঐ একইসঙ্গে সে প্রতিরোধ করতে ভোলে না—হয়তো বিচ্ছিন্ন, হয়তো একাকী এবং শস্ত্রবিহীন—তথাপি তার দিক থেকে প্রতিরোধ থেকেই যায়।

হাট শূন্য হয়ে গেছে তৎক্ষণে। কেবল প্রৌঢ়াটি তখনও তার ভগ্ন পাত্রাদি সম্মুখে নিয়ে রোদন এবং বিলাপ করছে। বসন্ত আর মিত্রানন্দ হাট পরিত্যাগ করলো। এবার আর রাজপথ নয়—প্রাকৃতজনের পথ, যা সঙ্কীর্ণ, কখনও যা জলাভূমিতে গেছে, কখনও গেছে বনভূমিতে। দু'জনেরই এখন ধারণা, এই পথই নিরাপদ, গমনাগমন যদি করতে হয়, তাহলে এই পথেই করতে হবে।

গ্রামপ্রান্তের অখ্যাত নদীটির কূলে যখন উপস্থিত হলো তখন দিবা অবসান-প্রায়। উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকেরই নৌকা ছিলো। বসন্তদাস মিত্রানন্দের হাত ধরলো। বললো, সখা, চলো আমার সঙ্গে।

মিত্রানন্দ হাসে বন্ধুর কথা শুনে। বলে, অবশ্যই যাবো, তবে এখন নয়—ভিক্ষু জ্ঞানানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন আমার। এখনও জানি না, কী বলবেন তিনি এবং ভিক্ষু সংঘেরই বা কী অভিমত হবে শেষ পর্যন্ত। তবে জেনে রাখো, তোমার কাছে আমাকে আসতেই হবে, যদি বেঁচে থাকি—কারণ তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু—প্রাকৃতজনের অমিত শক্তির দিকটি তুমিই নির্দেশ করে দেখিয়েছো, সখা, আমি আসবো—মায়াবতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার পক্ষ থেকে আশির্বাদ চুম্বনটি দিতে ব'লো।

সন্ধ্যাকালে নৌযান দুটি দুই মুখে জলে ভাসলো—একটি দক্ষিণে, স্রোতের অনুকূলে—অন্যটি উত্তরে, স্রোতের প্রতিকূলে।

বহু পথ, বহু লোকালয়, বহু বিঘ্ন এবং প্রণয়-প্রতিহিংসা অতিক্রম করে বসন্তদাস এখন স্বদেশে এবং স্বভূমিতে প্রত্যাগমন করছে। ক্লান্তি এবং অবসাদে তার দেহমন ভারাতুর। তার দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয় একটি। ভিক্ষু সংঘ কিছুই করতে পারেনি—হরিসেনের অত্যাচারের কোনো প্রতিকার হলো না, মহাসামন্ত শক্তিবর্মণ কিংবা সামন্ত শ্রীনাথবর্মণও রয়ে গেলো একই প্রকার। লাভ হলো না কিছু—পথে পথে ভ্রমণই সার।

বসন্তদাস নদীর ছলোচ্ছল তরঙ্গাভিঘাত শোনে আর দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখে দিগন্তের দিকে। কৃষ্ণার কথা স্মরণ হয় তার, স্মরণ হয় ছায়াবতীর কথা এবং নিরঞ্জনের কথা আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটি একটি করে। স্বপ্ন থেকে, ক্রোধ থেকে, জ্বালা থেকে, প্রণয় থেকে, এখন আবার সংসারের উদ্দেশে যাত্রা। মনে হয়—আপাতত এইটিই তার পথ। কারণ সংসারে মায়াবতী আছে এবং মায়াবতীর গর্ভে তার সন্তান জন্ম লাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। আর সংসার ব্যতীত অপেক্ষাকালের যোগ্য আশ্রয় অন্য কোথাও কি আছে? থাকলেও সে আশ্রয়ের কথা বসন্তদাসের জানা নেই।

যবন কেন্দ্রের মধ্যে দুই ভাগ। একদিকে বণিকদের অবস্থান, অন্যদিকে সাধুপুরুষ আহমদ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকেন। দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনার পর যবন কেন্দ্রেই আশ্রয় হয়েছে লীলাবতীর। কেন্দ্রে রমণীদের থাকবার কোনোই ব্যবস্থা ছিলো না—ঐ দিনই আরও দু'টি নিরাশ্রয়া তরুণী মহাত্মা আহমদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অগত্যা আহমদ একটি গৃহের ব্যবস্থা করেন। গৃহটি দারু নির্মিত এবং প্রাচীন, কিন্তু সুন্দর।

আহমদ শেষ মুহূর্তেও বলেছিলেন, তুমি কি এই স্থানে থাকবে, না অন্য কোথাও যাবে? প্রশ্ন শুনে লীলাবতী শেষবারের মতো শ্যামাঙ্গের মুখপানে চেয়েছিলো। তারপরে নিঃসংশয়ে বলেছিলো, আমরা আপনাদের আশ্রয়ে থাকতে চাই।

শ্যামাঙ্গ লীলাবতীর কথা শুনে আহত হয়েছিলো। পরে এক সময় বলেছিলো, তুমি ঐ কথা কেন বললে? সত্যি সত্যি তো আমরা এই স্থানে অবস্থান করছি না।

তবে আমরা এখন কোথায় যাবো, বলো? মাতুল বিদায়কালে একটি কথা বলেছিলেন, মনে আছে?

শ্যামাঙ্গের স্মরণ হয়, সিদ্ধপা বলেছিলেন, পথে যদি কোনো যবন কেন্দ্র দেখো, তাহলে সেখানে আশ্রয় নিও। তবে কি যবন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সিদ্ধপার সম্যক ধারণা ছিলো?

সিদ্ধপার উপদেশটি স্মরণ হলো, কিন্তু তথাপি শ্যামাঙ্গ যবন কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণ করলো না। লীলাবতীকে বলে গেলো, তুমি দিবস কয়েক এখানে অবস্থান করো, আমি শীঘ্রই বাসস্থলের ব্যবস্থা করছি।

শ্যামাঙ্গ যবনদের আচার-আচরণ সম্পর্কে শুনেছিলো মায়াবতীদের গৃহে। মায়াবতীর মাতুল দীনদাস একদল যবন অশ্ব ব্যবসায়ীর উপাসনা ও অন্নগ্রহণের রীতিটি বর্ণনা করেছিলেন। দেখলো, দীনদাস যা যা বলেছিলেন সমস্তই সত্য। এদের উপাসনায় কোনো বিগ্রহ থাকে না। নির্দিষ্ট উপাসনা গৃহ থাকলেও তারা ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানকেই অপবিত্র জ্ঞান করে না—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই হলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে কোনো স্থানেই তারা 'নামাজ' পাঠ করে। উপাসনাকে এরা বলে নামাজ। শ্যামাঙ্গ শুনতে পায়, প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ এদের ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করছে।

আর করবেই বা না কেন? মাত্রই দিবস কয় পূর্বের কথা। একটি বালক করতোয়া নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়। বালকটি এক বিধবা রমণীর একমাত্র সন্তান, তাকে মৃতাবস্থায় তুলে আনা হয়। সৎকারের আয়োজন হচ্ছিলো। ঐ সময় পুত্রহারা মায়ের শোকার্ত রোদনধ্বনি শুনতে পান দরবেশ সাধুপুরুষ। তিনি বিধবার গৃহে প্রবেশ করে সমস্ত জানলেন তারপর বালকটির পা ধরে উর্ধ্বে তুলে চক্রাকারে ঘূর্ণন আরম্ভ করে দিলেন, বালকটির মুখ দিয়ে প্রচুর জল নির্গত হয়ে গেলে তিনি বালকটিকে ভূমিতে শায়িত ক'রে বক্ষদেশে চাপ প্রয়োগ করলেন বার কয়েক এবং শেষে মন্ত্রপাঠ করলেন কয়েকবার। আর তাতেই বালকটি চক্ষুরুন্মীলন করলো এবং মা বলে ডেকে উঠলো।

এই দৃশ্য যারা প্রত্যক্ষ করেছিলো তারা জানে, কি অসাধারণ দিব্য ক্ষমতার অধিকারী ঐ সাধুপুরুষ। তিনি মৃত বালকটিকে বললেন, ওঠো, তোমার মাকে গৃহে নিয়ে যাও, আর অবাক কাণ্ড, সত্য সত্যই বালকটি হাত ধরে নিজ মাতাকে গৃহে নিয়ে গেলো। আহা, তখন নাকি প্রভুর দেহ থেকে দিব্যালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো! এই প্রকার সব কথা মানুষের।

প্রতিদিন কেন্দ্রের বহির্দ্বারে কুষ্ঠ রোগীদের সারিটি দেখবার মতো। সাধুপুরুষ স্বহস্তে তাদের চিকিৎসা করে থাকেন। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত এতো মানুষ এ দেশে আছে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। কোথায় কোন রমণীটি নিগৃহীতা হয়েছে, সে এসে দাঁড়াবে বহির্দ্বারে। ডোম কন্যাটি স্বামীগৃহে যাবে না, তাকেও তুমি দেখতে পাবে ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। সর্ববিধ পীড়ন থেকে মুক্তিলাভের জন্য যেন এই স্থান। হড়ডি কন্যাটি চর্মকারের পুত্রের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, এদিকে চর্মকার গৃহিণী ঐ কন্যাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে চান না।

এখন প্রভু, কি হবে এই কন্যার? এ সমস্যা সমাধানের দায়ও যেন যবন সাধুপুরুষটির। স্বয়ং সামন্তপতি প্রতিপক্ষে একবার তাঁকে প্রণাম জানাতে আসেন। এমন জনরবও আছে যে, এই সাধুপুরুষের অগণিত অনুচরদের মধ্যে অনেকেই রক্ত মাংসের মানুষ নয়—ঐ অশরীরীদের নাম নাকি জ্বীন। আরও জনরব এই প্রকার যে, তাঁকে সর্পে দংশন করে না, ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে না।

লীলাবতী বলে, জানো, এদের ধর্ম একেবারেই অন্যরূপ। বিবাহ যদি সুখের না হয়, তাহলে এরা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুনর্বিবাহ করে। আর উচ্চ নীচ ভেদাভেদ একেবারেই নেই। না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না যে, প্রভু ভৃত্য একত্রে, একস্থালীতে, আহার করে। মা গো, কি ঘৃণার কথা! একস্থালী থেকে আহার করলে একে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে না, বলো? আরও অদ্ভুত কাণ্ড, এদের ভগবানের বিগ্রহ মূর্তি নেই—এমন ধর্মের কথা শুনেছো কোথাও?

কেন যবন ধর্মের প্রসঙ্গ লীলাবতী বারবার তোলে, শ্যামাঙ্গের বোধগম্য হয় না। যখনই ওর সঙ্গে কথা বলতে যাও ঐ সকল প্রসঙ্গ সে তুলবেই। জানায়, হড্ডি এবং চণ্ডালেরা প্রায় প্রতিদিনই দীক্ষিত হচ্ছে, আর ক্ষেত্রকরেরা আসছে দলে দলে—তবে প্রতিদিন নয়। এদের দীক্ষাগ্রহণের অনুষ্ঠানটিও সহজ। স্নান ক'রে শুদ্ধ বস্ত্রে পবিত্র দেহে তুমি দীক্ষাগুরুর কাছে ক্ষুদ্র একটি মন্ত্রপাঠ করলে—তারপর আর কিছু নেই, হয়ে গেলে তুমি নতুন ধর্মের লোক। আর যদি দেখতে তুমি উপাসনাকালের দৃশ্য, হাসতে হাসতে ম'রে যেতে। বারংবার পশ্চাদ্দেশটি ঊর্ধ্বে তুলে এরা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। একসঙ্গে বহুলোক সারি সারি পশ্চাদ্দেশ তুলে রয়েছে—দৃশ্যটি কল্পনা করো তো?

লীলাবতী আনন্দেই আছে বলতে হবে। শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করে, সে আবার পূর্বের মতো হয়ে উঠেছে। সেই পূর্বের মতোই চটুল, হাস্যমুখর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। সে বলে, এখানে একটি নবদীক্ষিত বালক আছে, তারও নাম বসন্তদাস—তার যাবনী নাম কী হয়েছে জানো? তার নাম হয়েছে, বাতেন। তোমার নাম যদি ঐরূপ কিছু হয়? মা গো, লীলাবতী হাস্যাবেগে বেপথু হয়ে পড়ে। আর শোনো, বাতেন আমাকে দীক্ষামন্ত্রটিও শিখিয়ে দিয়েছে—অত্যধিক সহজ, কয়টি শব্দমাত্র—তুমি শিখবে? বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা, মোহাম্মাদুর রাসুলাল্লা। আচ্ছা, এদের ভাষায় এতো ল কেন জানো?

ঐ প্রকার কথা শুনে শ্যামাঙ্গ হতবুদ্ধি হয়ে থাকে। ইতস্তত করে, সদ্যলব্ধ বাসভবনের কথাটি জানাবে কি না। শেষে বলে, তুমি কি এখানেই থাকবে মনস্থির করেছো, নাকি বাইরে অন্য বাসভবনে যাবে?

কথা শুনে লীলাবতীর মুখ ম্লান হয়ে যায়। বলে, কই তুমি যে বললে, গৃহের সন্ধান পাও না—এভাবে একাকী থাকতে বুঝি আমার ইচ্ছা হয়? লীলার অভিমানী স্বর শুনে শ্যামাঙ্গ স্বস্তি বোধ করে। বলে, আগামীকালই আমরা নিজেদের বাসগৃহে যাবো।

লীলাবতীর চোখে নতুন আলো চমকিত হয়। বলে, সত্য বলছো, তাহলে আগামীকাল কেন? এখন গেলে কী হয়? তাকে অত্যন্ত অস্থির এবং চঞ্চল মনে হয়। পারলে যেন এই

মুহূর্তেই সে যখন কেন্দ্র ত্যাগ করে। কিন্তু যখন শ্যামাঙ্গের বিদায়ের মুহূর্তটি এলো, তখন সে ইতস্তত করতে থাকে। বলে, ঐ স্থানে আমাদের বাস করতে দেবে তো, নাকি আবার পূর্বের মতো—

কথাটি অসমাপ্ত রাখে লীলা। তারপরেই হঠাৎ বলে, এই সাধুপুরুষের কাছে দীক্ষা নিলে হয় না?

অত্যন্ত দ্রুত ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ উচ্চারিত একটি কথা। কিন্তু শ্যামাঙ্গ গভীরভাবে আহত হয়। বলে, লীলা, স্বধর্ম ত্যাগ যে করে, সে পাপিষ্ঠ—আমরা কি পাপ করেছি, বলো? কেন আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করবো?

লীলা কী ভাবে অনুমান করা যায় না। চকিতে তার ভ্রূরেখা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এবং চোখে দেখা দেয় বহ্নিজ্বালা। বলে, এ তুমি কী বলো শ্যামাঙ্গ, পাপ করিনি আমরা? তাহলে এভাবে নিজ পরিচয় গোপন ক'রে পলায়ন করছি কেন? আমরা যা করেছি তা যদি পাপ না হয়, তাহলে পাপ আর কাকে বলে? তুমি কি আমাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে চাও? বলো, আমার কী অপরাধ? আমি কেন সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত হবো। আমি তো বলেছি তোমাকে, জীবনকে আমি পরিপূর্ণভাবেই চাই। আমি সংসার চাই, স্বামী চাই, সন্তান চাই—প্রত্যেকটিই আমার প্রয়োজন, একটি ন্যূন হলে চলবে না। যদি আমার পরিপূর্ণ জীবন হয় উত্তম, না হলে জীবনকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো।

তাই বলে তুমি নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে চাও?

হ্যাঁ, চাই। আমার ধর্ম কোথায়? আমি তো বুঝি না, সত্য সত্যই আমার ধর্ম বলে কোনো বস্তু কখনও ছিলো কি না। যদি ছিলো ধরে নিই, তাহলে সে ধর্ম আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এমন বিবাহ দিয়েছে, যা আমি চাইনি—সে ধর্ম আমার জীবনকে বিপন্ন করেছে, সে ধর্ম আমাকে পিতৃহীন করেছে—বলো, তাকে আমি ধর্ম বলবো?

শ্যামাঙ্গ বিমূঢ় হয়। দেখে, তার সম্মুখে লীলাবতী নয়, যেন অন্য কোনো অপরিচিতা রমণী। সে বলে, লীলাবতী, এ প্রসঙ্গ থাক—এখন চলো, আমরা নিজ গৃহে যাই।

লীলাবতী হাসে। বলে, তুমি আমাকে উন্মাদিনী জ্ঞান করছো। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখেছি, এক গৃহে বাস, এক শয্যায় শয়ন—এতেই কি জীবনকে পাবো আমি, বলো? এক গৃহে বাস করিনি কি? এক শয্যায় শয়ন করিনি কি? কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন, এই তো? এভাবে কতোবার পলায়ন করবো, কোথায় পলায়ন করবো, বলো? চুরি করেছি, না দস্যুতা করেছি?

শ্যামাঙ্গ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। বলে, তুমি যাদের সাহচর্যে আছো তারা বুঝি সকলেই যবন ধর্মগ্রহণ করেছে, তাই না? বালকটির কি নাম বললে যেন?

লীলাবতী এবারও হাসে। বলে, প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাও শ্যামাঙ্গ, কিন্তু আমি বালিকা নই। জীবন আমার কম বিপর্যস্ত নয়, লাঞ্ছনা কম হয়নি, আমাকে যদি জীবিত থাকতে হয়, তাহলে সেই জীবন আমার নিজেকেই গঠন করে নিতে হবে।

শ্যামাঙ্গ প্রশ্ন করে, একাকী কি জীবন রচনা সম্ভব?

না, সম্ভব নয়, লীলা স্বীকার করে।

প্রণয় কি প্রয়োজন নয়?

হ্যাঁ, শতবার প্রয়োজন।

আমি?

তুমি আমার, তুমি ব্যতীত আমার জীবন অর্থহীন।

যদি আমি স্বধর্ম ত্যাগ না করি?

অমন কথা ব'লো না শ্যামাঙ্গ। লীলা এবার বিপন্ন দৃষ্টিতে শ্যামাঙ্গের মুখপানে চায়। বলে, অমন কথা ব'লো না—তোমাকে না পেলে মরণ ব্যতীত আমার গতি নেই।

শ্যামাঙ্গ বলে তখন, লীলা, আবেগাশ্রয়ী হ'য়ো না, আমরা এই মৃত্তিকার সন্তান, বহুযুগ ধ'রে পুরুষানুক্রমে আমরা নিজ ধর্ম পালন করে আসছি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-শোক, আবেগ কল্পনা, সমস্তই যেমন আমাদের ধর্মাশ্রয়ী তেমনি আবার মৃত্তিকাশ্রয়ী—এ ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ নিজেকেই ত্যাগ করা—এ অসম্ভব ব্যাপার, তুমি ঐ চিন্তা ক'রো না।

লীলার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, কতদূর সে নিজেও জানে না। শ্যামাঙ্গের কথা তার শ্রবণে পশে কি না তাও বোঝা যায় না। এক সময় সে বলে, শ্যামাঙ্গ, জীবন কি বিচিত্র, তাই না? তুমি কী ভাবো আর আমি কী ভাবি। অথচ আমরা একত্র হয়েছিলাম!

তার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট শুনতে পায় শ্যামাঙ্গ। লীলাবতীকে প্রস্থানোদ্যত দেখে সে হাত ধরে। বলে, চলো, আমরা নিজেদের গৃহে যাই।

গৃহে? লীলা যেন অবাক হয়। বলে, গৃহের কথা বলছো, না শয্যার কথা?

শ্যামাঙ্গ নিজেকে অপমানিত বোধ করে ঐ কথায়। বলে ওভাবে ব'লো না লীলা, তুমি আমার—

আমি তোমার, কিন্তু তোমার কী, সেটি বলো?

শ্যামাঙ্গ স্থির দৃষ্টি মেলে রাখে লীলাবতীর মুখপানে। হৃদয়ে তার রক্তক্ষরণ হয়। ভাবে, এ কোন রমণীকে দেখছে সে? আত্মবিস্মৃতা এই নারী কি সুখের জন্য এতোই লালায়িতা যে নিজ ধর্মকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে চায়?

লীলা নিজের হাত মুক্ত করে নেয়। বলে, আমি তোমার পুত্তলিটি নই শ্যামাঙ্গ, আমি জীবন্ত নারী—আমার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই—ঐগুলিই আমার ধর্ম, অন্য ধর্ম আমি জানি না—আমাকে তুমি প্রকাশ্যে বিবাহ করো।

শ্যামাঙ্গকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। লীলাবতী উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতে করতে দ্বারপথে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

অভিমন্যুদাসকে আহত ক'রে দীনদাসের পলায়নের কয়েক দিবস পরই সংবাদটি পাওয়া যায়। সংবাদটি নিয়ে আসে কন্যা সরস্বতীর দেবর নবীন স্নাতক মাধবাচার্য।

অভিমন্যু লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় সোমজিৎ ঈষৎ চিন্তিত হয়েছিলেন। আশঙ্কা হয়েছিলো, মহাসামন্ত হরিসেন কোনো না কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু দেখা গেলো, হরিসেনের পক্ষ থেকে কোনো উচ্চবাচ্য নেই—এমনকি অভিমন্যুদাসও তাঁর কাছে অতিমাত্রায় বিনয়ী হয়ে পড়েছে। তিনি আশ্চর্য হচ্ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র সংবাদ অবশ্য তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিলো, কিন্তু তিনি সংবাদটির গুরুত্ব দেননি। হরিসেনের পরিবার পরিজন নাকি কামাখ্যা তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। সংবাদটি শুনে তাঁর মনে হয়েছিলো—এ আর এমন কি ঘটনা? এরূপ ঘটনা তো ঘটতেই পারে।

মাধবাচার্যের আনা সংবাদ হরিসেনের আচরণের কারণ উদঘাটিত ক'রে দিলো।

জামাতা কেশবাচার্যের পত্রের বিষয় এইরূপ: দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন, শীঘ্রই যবনাক্রমণ হবে, রাজধানীর বণিক এবং ব্রাহ্মণেরা সকলেই পলায়ন করছেন—এমতাবস্থায় দেশত্যাগ করাই ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিধেয়—পত্রপাঠ যেন সোমজিৎ সপরিবারে মাধবাচার্যের সঙ্গে যাত্রা করেন।

সোমজিৎ মাধবাচার্যের কাছে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করলেন না। শুধু জানালেন, বৎস, তুমি ফিরে যাও—আমি আত্মরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা নিতে পারবো—কেশব ও সরস্বতীকে ব'লো, আমার জন্য চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

মাধবাচার্য বিদায় নিলে সোমজিৎ স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ব্রাহ্মণি, এবার প্রস্তুত হও, মহাবিপদের কাল দ্বারে এসে উপস্থিত।

ব্রাহ্মণী হাসলেন স্বামীর উক্তি শুনে। বললেন, আমার ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নিশ্চয়ই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি—ঠাকুর আছেন আমাদের।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, এমন দুষ্কালে কয়েকজন যবন অশ্ব বিক্রেতা উজুবটে এলো। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, এই যবন বণিকেরা প্রত্যেকেই শস্ত্রধারী। সংবাদ পাওয়া গেলো, তারা মহাসামন্ত হরিসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বেই প্রস্থান করেছে।

সোমজিৎ সন্দিগ্ধ হলেন। যবনাক্রমণের সংবাদে তাঁর ভয় হয়নি। কিন্তু হরিসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের এই ঘটনা তাঁকে চিন্তিত করে তুললো।

পথ এখন শকট চক্রের আর্তনাদে মুখর। শকটের পর শকট চলেছে উত্তরাভিমুখে। নদীতে নৌকা, পথে গো-মহিষাদির শকট। কোথায় যাবে হে, কৌতূহলী গ্রামবাসীর চিৎকার শোনা যায়। কিন্তু উত্তর আসে না, এলেও আসে বিলম্বে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে।

অর্থাৎ স্ত্রী-কন্যা-পুত্র ও পিতা-মাতাদের নিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কেউ কুটুম্ব গৃহে যাচ্ছেন, কেউ যাচ্ছেন তীর্থস্থানে।

কোন গ্রাম থেকে আগমন হে? প্রশ্ন শুনে নৌকার ক্ষেপণী তুলে নৌবাহক পশ্চাতের দিগন্ত দেখিয়ে বলে, তোমার পিতৃগৃহ যে গ্রামে, সেই গ্রাম থেকে আসছি, ভগিনীর সঙ্গে যেতে চাইলে এসো।

কে যাচ্ছেন? না কুসুম্বীর গ্রামপতি।

ঐ শকট সারি কার? না বিল্বমূলের সুধী মিত্রের।

আরে উদ্ধব দত্ত যে, কোথায় যাচ্ছো?

হেঁ হেঁ ভাই, গৃহিণীর ইচ্ছা, তীর্থস্নান করবেন—তাই—

যাচ্ছেন ব্রাহ্মণেরা, যাচ্ছেন বণিকেরা, কিন্তু লক্ষণীয় যে, সামন্ত ও মহাসামন্তরা স্বয়ং যাচ্ছেন না কোথাও—এবং করণ কায়স্থদেরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ক্রমে পুন্ড্রনগরীতেও যবনাক্রমণের আতঙ্ক স্পর্শ করলো। মুখে মুখে জনরব। কেউ বলে, তারা প্রথমে পুন্ড্রনগরীতে আসবে, রাজধানীতে যাবে পরে। কেউ বলে, পুন্ড্রনগরীতে তারা আদৌ আসবে না, পুন্ড্রনগরী তো আর পূর্বের মতো সমৃদ্ধ নয়। যাঁরা বিজ্ঞলোক, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, যবন সেনারা প্রথমে রাজধানী অধিকার করবে, তারপর আসবে অন্যান্য নগরীতে।

স্থানে স্থানে জল্পনা—যুদ্ধ হলে নগরীর কিছুই থাকবে না, সবই যাবে ভস্মসাৎ হয়ে! একজন সংবাদ জানায় যে, যবন সেনাপতির বাহু দু'টি ভূমি স্পর্শ করে—আর সে অসুর বিশেষ, নর-রক্তপানে তার দারুণ আগ্রহ। কারও মুখে শোনা যায়, এরা যবন নয়, ভিন্ন জতি, এদের বলা হয় তুরুক—কিছুই নেবে না এরা, শুধু তোমার পত্নীটিকে, নয়তো কন্যাটিকে তুলে নিয়ে যাবে। এই প্রকার সব আতঙ্কজনক জনরব।

একদা দ্বিপ্রহরে হঠাৎ দেখা গেলো, নগরীর লোক পলায়ন করছে। কেউ কিছু বলতে পারে না, শুধু উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হয়। ঐ আসছে, ঐ এসে গেলো—পশ্চিম দ্বারে গিয়ে দেখো রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। কেউ বলে, নগরপাল যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, আর রক্ষা নাই। কোথায় যুদ্ধ, কি বৃত্তান্ত, কেউ কিছু বলতে পারে না। নগরীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খল অবস্থা। অপরাহ্ণ হতে না হতে নগরীর পথ নির্জন হয়ে গেলো। যারা সক্ষম ছিলো, পলায়ন করেছে, যারা পারেনি, তারা গৃহের বহির্দ্বার রুদ্ধ করে ভিতরে বসে আছে।

শ্যামাঙ্গ নগরীর ঐ অবস্থা দেখে যবন কেন্দ্রে গেলো। সেখানে অসংখ্য জনসমাবেশ, দ্বারপথ প্রায় অবরুদ্ধ। মানুষের আকুল আগ্রহ। সকলেই জানতে চায়, দরবেশ সাধুপুরুষ কী বলেন, তিনি কি আমাদের রক্ষা করবেন না?

শ্যামাঙ্গ অতিকষ্টে বহির্দ্বার অতিক্রম ক'রে ভেতরে প্রবেশ করে। সংবাদ জানাতে হলো না, লীলাবতী ছুটে এলো। বললো, এতো বিলম্ব করলে কেন—আমার চিন্তা হচ্ছিলো।

লীলাবতীর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে শ্যামাঙ্গ বলে, চলো লীলা, আমরা পলায়ন করি—এ নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে।

লীলাবতী জানায়, কিছু হবে না, আমরা এখানে থাকবো। সাধুপুরুষ বলেছেন, তুমিও এখানে থাকবে।

শ্যামাঙ্গ চারিদিক দৃষ্টিপাত করে। কেন্দ্রের চারিদিকে অসংখ্য লোক, অধিকাংশই নবদীক্ষিত যবন-ধর্মী মোসলেমিন। সে বললো, আমি তো এদের ধর্মগ্রহণ করিনি, এরা কেন আমাকে থাকতে দেবে?

দেবে, তুমি চুপ করো—আমি দীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করছি।

লীলাবতীর মুখপানে চেয়ে শ্যামাঙ্গ কষ্ট পায় মনে। বলে, লীলাবতী, তুমি এসব কী বলছো? তুমি কি আমার অভিমত জানো না?

জানি, কিন্তু এখন প্রাণরক্ষার জন্যই না হয় দীক্ষা নিলে—পরে প্রায়শ্চিত্ত ক'রো।

না, অসম্ভব, ধর্ম ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষা করবো—অমন প্রাণের আমার প্রয়োজন নেই, আমি যাই।

লীলাবতী তার হাত ধরে, কোথায় যাবে, আমাকে কোথায় রেখে যাবে?

শ্যামাঙ্গ উত্তরে কিছু বলতে পারে না।

বলো, আমি কোথায় যাবো? আমি তো এদের ধর্মগ্রহণ করিনি—আমাকেই বা এরা থাকতে দেবে কেন? এরা অস্বীকৃতি না জানালেও যারা নবদীক্ষিত, তারা জানাবে, তখন?

শ্যামাঙ্গ তবু বলে, আমি যাই, আমাকে যেতে দাও।

চলো তাহলে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

শ্যামাঙ্গ দেখলো, লীলাবতী সত্যই যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার সাহস হয় না। বাহিরে যদি বিপর্যয় সত্যই আরম্ভ হয়ে যায় তখন লীলাবতীকে সে কীভাবে রক্ষা করবে। সে মিনতি করে বলে, লীলাবতী কথা শোনো, অবুঝ হ'য়ো না—তোমার জন্য এ স্থান নিরাপদ—যবনেরা যতো নিষ্ঠুরই হোক, স্বধর্মীদের উপর অত্যাচার করবে না।

তুমি না থাকলে, নিরাপদ স্থানে থেকে আমার কী হবে। শোনো শ্যামাঙ্গ, আমার কথা শোনো, লীলাবতী নিরুপায় স্বরে বলে, আমার কোনো গত্যন্তর নেই—তুমি যেও না, তোমার সন্তান আমার উদরে।

শ্যামাঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায় ঐ কথা শুনে। এ কী বলছে লীলাবতী? চারিদিকে কোলাহল, মানুষ প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করছে, ভয়ানক অনিশ্চিত অবস্থা—এই অবস্থায় এ

কোন কথা বলছে লীলাবতী? সে লীলাবতীর মুখপানে চাইলো। লীলা তখনও তার মুখপানে চেয়ে আছে। শ্যামাঙ্গ লীলার দু'চোখে দৃষ্টি রেখে বললো, সত্যি বলছো?

ঐ কথায় চিরন্তনী নারীর মুখে রহস্যময় হাসিটি ফুটলো। বললো, কেন বিশ্বাস হয় না আমার কথা?

কথাটি বলবার সময় লীলার দু'চোখে কি কৌতুকের ছায়া দেখা গেলো? শ্যামাঙ্গ নিশ্চিত নয়। কিন্তু তবু মনে হলো, যেন দেখা গেলো একটি ছায়া। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো, লীলাবতীর এটি একটি ছলনাময় কৌশল নয় তো? পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছো লীলাবতী?

লীলাবতী যেন বিজয়িনী। অশ্রুলাঞ্ছিত মুখে বিজয়িনীর হাসিটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটলো। আর তাতেই শ্যামাঙ্গ বুঝলো ভুল। মনে হলো, তার অনুমানটি সত্য—লীলাবতী ছলনাই করছে। ক্ষণেক পরে লীলা যখন বললো, পারবে এখন আমাকে একাকী রেখে যেতে? তখন সে প্রায় নিশ্চিত হলো। বুঝলো, লীলাবতী তাকে কাছে রাখতে চায় এবং যবন ধর্মে দীক্ষিত করতে চায়—সেই জন্যই তার এই ছলনাময় কৌশল। সেও হাসলো এবার। বললো, উত্তম কথা, তোমারই জয় হলো—আমি এ নগরী ত্যাগ করবো না—নবধর্মে দীক্ষাও আমি নেবো, কিন্তু এখন নয়—বাইরে যখন অবস্থান করা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তখন, তখন আমি তোমাদের এই কেন্দ্রে আসবো—এখন আমাকে যেতে দাও।

লীলাবতীর মুখে হাসি উচ্ছল হয়ে উঠলো ঐ কথায়। শ্যামাঙ্গের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, তোমাকে দেখে এখন আমার লোভ হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে রাক্ষসীর মতো তোমাকে চর্বণ করে খাই।

শ্যামাঙ্গ আহত এবং প্রতারিত বোধ করতে লাগলো নিজেকে। লীলাবতী এমন হতে পারলো? এমন হীন কৌশল গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হলো! নিজে তো ধর্ম ত্যাগ করতেই চায়, অন্যকেও সে প্ররোচিত করে! তবে কি যবন কেন্দ্রের সাধুপুরুষটি কোনো প্রকার যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেছেন লীলাবতীর উপরে? তার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আবার কখনও মনে হয়, লীলাবতীর সন্তান সম্ভাবনা কি একেবারেই অসম্ভব? নারী-পুরুষে মিলিত হলে সন্তান সম্ভাবনা তো হতেই পারে। যদি লীলাবতীর কথা সত্য হয়? সে অতঃপর আর চিন্তা করতে পারে না। নিজের অনিবার্য পরিণামটি সে স্পষ্ট দেখতে পায় মানসচক্ষুতে। অমন পরিণাম তো সে চিন্তা করেনি কখনও।

অন্ধের কি বা রাত্রি, কি বা দিন। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা নির্যাতন করতো, এখন যবনেরা করবে—একই ব্যাপার।

শ্যামাঙ্গ সমস্ত দিন বিহারে অবস্থান করে।

অবস্থানের কারণ ছিলো। বিহারের প্রাচীন গাত্রের মৃৎপটগুলি দেখছিলো সে। প্রস্তর মূর্তিগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। দেখতে দেখতে তার দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু মন রয়ে যায় অতৃপ্ত। সে রাত্রিযাপন করলো বিহারে, পরদিন পুনরায় সে শিল্পকর্মগুলি দেখতে গেলো। কি অদ্ভুত কাজ—কঠিন প্রস্তর, কিন্তু লাবণ্যের যেন শেষ নেই। স্থবির প্রস্তর থেকে সম্পূর্ণ মানুষটি আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—কিন্তু যতোটুকু এসেছে, ততোটুকুই কতো জীবন্ত। গুরু বসুদেব এই জন্যই বলেছিলেন গৌড়ীয় রীতিটির কথা। তার মনে পড়ে—গৌড়ীয় রীতি কোনো রীতি নয়—এ হলো রীতি ভঙ্গের রীতি—জগতের সত্য রূপটি, শাশ্বত রূপটি যে রীতিতে ধারণ করা যায়, সেইটিই গৌড়ীয় রীতি। সে একটি প্রস্তর মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তার অনুমান ওটি গৌতম পত্নী গোপার মূর্তি, মস্তকটির ভার বাম হস্তে বিন্যস্ত, ভঙ্গিটি অর্ধশায়িত, পদযুগলে দাসী পরিচর্যারতা, সম্মুখে শিশু রাহুল শায়িত। দেহের বঙ্কিম ভঙ্গিটিতে কি মাধুর্য, কি লালিত্য—গ্রীবা দেখো, স্কন্ধ দেখো, বস্ত্রাচ্ছাদিত স্তনযুগল দেখো, কটিদেশ দেখো। সে যতোবার দেখে, ততোবার তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এবং হঠাৎ তার মনে হয়, এই নারী যেন তার পরিচিত—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার পরিচিত। এবং পরিচয় আবিষ্কার করে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ কেমন করে সম্ভব। এ যে অবিকল লীলাবতী, দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ যৌবনময় দেহে একইসঙ্গে শক্তির দৃঢ়তা এবং মাতৃত্বের কোমল সুষমা, অহঙ্কার এবং বিনয়, ছলনা এবং স্নেহ—এমন যে একত্রে মূর্ত হতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে না।

সন্ধান নিতে গেলে জানলো, মূর্তিটির নির্মাতা কে, কেউ জানে না। তবে কিংবদন্তী এইরূপ যে, এক তরুণ ভিক্ষু মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন। এবং নির্মাণ করেই তিনি বিহার ত্যাগ ক'রে চলে যান, প্রত্যাগমন করেননি।

শ্যামাঙ্গের মনে হয়, তার পুত্তলিগুলির সঙ্গে এ মূর্তিটির কোথায় যেন গভীর সাদৃশ্য আছে। তবে কি শিল্পী, শিল্পের উপাদান এবং শিল্পের বিষয় মূলত চিরন্তন? বস্তু ভেদে, ব্যক্তি ভেদে, কাল ভেদে—মূলগতভাবে তার কোনোই ব্যত্যয় হয় না?

সে স্থির করে, এই বিহারেই সে অবস্থান করবে—এখানেই সে মৃৎমূর্তি নির্মাণ করবে একটি। ঐ প্রস্তর মূর্তিটিরই পার্শ্বে সে স্থাপন করবে তার মৃন্ময় মূর্তিটি। মূর্তিটিতে বিধৃত থাকবে একটি নারীর গমন ভঙ্গি—নারী তার নিজ শক্তিতে ক্রমেই অনন্তের দিক অগ্রসর হয়ে চলেছে—এই ভাবটি সে প্রকাশ করবে তার শিল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে নগরীর দিক থেকে কোলাহল শোনা গেলো। একটি তরুণ ভিক্ষু সংবাদ নিয়ে এলো যে, যবন সেনারা নগরীতে প্রবেশ করেছে—আজ অপরাহ্ণে সেখানে তাদের বিজয়োৎসব। নগরবাসী প্রত্যেককে সে উৎসবে যোগ দিতে হবে, না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কি ভ্রাতঃ, বিজয়োৎসব দেখতে যাবেন না কি? একটি ভিক্ষু জানতে চাইলো।

হ্যাঁ, যাবো, শ্যামাঙ্গ জানায়। তারপর বলে, আপনারা?

আমরা, আমরা তো উপদ্রব বিশেষ, ভিক্ষুটি হাসে। বলে, দেখি সংবাদ নিয়ে, প্রকৃত অবস্থাটি কী দাঁড়িয়েছে।

যবন দলটি রাজধানী থেকে আসেনি। এরা প্রথমে ছিলো তঙ্গন নদীর পশ্চিম তীরে, তারপর এরা পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়। সেনাপতি কাফুর খান এই ক্ষুদ্র দলটির সেনাপতি। দুইশত সৈন্য ছিলো প্রথমে—এখন হয়েছে দুই সহস্র—এদের অধিকাংশই দেশীয় সৈন্য। অবাধ লুণ্ঠনের লোভে এরা কাফুর খানের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রথমে এরা কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করে। প্রথম সামন্তপতিদের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় দু'একটি—তারপর প্রায় সকল সামন্তপতির সঙ্গেই কাফুর খানের মিত্রতা হয়েছে—মিত্র সামন্তদের সেনাদল এবং যবন সেনাদল এখন প্রায় একাকার। পথিমধ্যে একত্রেই এখন তারা গ্রাম লুণ্ঠন করছে।

উজুবটে এলে মহাসামন্ত হরিসেন এদের বিপুল সমাদর করেন। তথাপি দলটি উদয়পুরে প্রথমে, তারপর মদনপুরে, এই দুটি গ্রামে অবাধে লুণ্ঠন ও নরহত্যা চালায়। তখন থেকে অভিমন্যুদাস কিছু সংখ্যক সৈন্যের কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে। সে এখন প্রায় সর্বক্ষণই তাদের সঙ্গী। উদয়পুরে দীনদাসকে সে এবারও পায়নি। তবে হ্যাঁ, সোমজিতের গৃহে সে নিজ হস্তে অগ্নিসংযোগ করেছে। শুক্লদাসকে অবশ্য সে নিজে হত্যা করেনি—তবে করতো—সেরূপ একটি সংকল্প ছিলো তার। অবশ্য তার কন্যাটির উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে—ঐ শূকরপুত্রী এক পাত্র উত্তপ্ত জল তার উপর নিক্ষেপ করে। ঐ জল চক্ষে এসে লাগলে আর রক্ষা ছিলো না—তার সৌভাগ্য, চক্ষু দু'টি রক্ষা পেয়েছে।

পুণ্ড্রনগরীতে উপনীত হয়ে সে উল্লাস বোধ করলো। একেকটি গৃহের দ্বার ভঙ্গ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করো এবং যথেচ্ছ দ্রব্যাদি নাও, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না।

ইতোমধ্যে সে একটি অশ্বও সংগ্রহ করেছে এবং কয়দিনের চেষ্টায় সে এখন অশ্ব চালনাও করতে পারে। ফলে তার গতি এখন দ্রুত। যথেচ্ছ সে গমনাগমন করে।

সে লোকমুখে শুনেছিলো যে পুণ্ড্রনগরীতে সদ্ধর্মী পাষণ্ডদের একটি বিহার আছে। নগরীতে প্রবেশ করেই সে বিহারটির সন্ধান করে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড, নগরীর লোকেরা এমন ভাব করে, যেন তারা বিহার নামক স্থানের নাম জন্মেও শোনেনি। একজন তো একেবারে মূক হয়ে রইলো। যতোই তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ততোই সে নিজ মুখে অঙ্গুলি স্পর্শ করে যুগপৎ হস্ত এবং মস্তক আন্দোলন করে। বোঝাতে চায় যে সে মূক ও বধির। অভিমন্যুদাস কৌতুক বোধ করে। সে স্থির করে, যে লোকই অসহযোগিতা করবে তারই পশ্চাদ্দেশে বংশদণ্ড প্রবেশ করানো হবে। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আয়োজনে বিলম্ব হলো না। মূক লোকটির পশ্চাদ্দেশের নিকট বংশদণ্ডটি নিয়ে যেতেই সে 'ওরে বাবারে' বলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো এবং সমস্ত সংবাদই যন্ত্রবৎ বলতে আরম্ভ করে দিলো।

তার কাণ্ড দেখে যবন সেনারা দারুণ কৌতুক উপভোগ করে। তারা বুদ্ধিতে একেবারে বলীবর্দের মতো, এবং তাদের শাস্তিদানও সেই প্রকার। লোকটি দুর্বিনয় প্রকাশ করছে, দাও তার শিরটি ছেদন করে। কেন বাপু, অন্য কৌশল প্রয়োগ করলে তো তোমার কাজও উদ্ধার হয়, আবার লোকটির প্রাণও বাঁচে। অভিমন্যুদাসের নতুন নতুন শাস্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা তাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সে দ্বিপ্রহরে দুই-তিনজন সঙ্গী অশ্বারোহী নিয়ে বিহারের উদ্দেশে যাত্রা করলো।

না, অভিমন্যুদাসের কার্য সমাধা করতে বিলম্ব হয়নি—উৎসব আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সে নগরে ফিরে এসেছিলো।

তরুণ ভিক্ষু দু'টিকে তারা পায় দ্বারদেশেই। যবন সৈন্যদের দিকে তারা সহাস্যে অগ্রসর হয়েছিলো কয়েক পদ। তারপর আর পারেনি। কবন্ধ দেহ দুটি ঐ স্থানেই পপাত হয়। তবে ছিন্ন হয়ে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরও মুণ্ড দু'টির মুখে হাসি ছিলো। আর তৃতীয় লোকটিকে যবনেরা পশ্চাদ্দিক থেকে শূলে বিদ্ধ করে। কিঞ্চিৎ ক্ষোভ রয়েছে অভিমন্যুর। লোকটিকে সে চিনেছে—এ হলো সেই কুম্ভকার, যে লীলাবতীর হাত ধরে পলায়ন করেছিলো। আহা, লোকটিকে সে ঐভাবে হত্যা করতো না। লোকটির মুখে লীলা নামটি উচ্চারিত হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শূকরপুত্রটা ছিলো নিতান্ত ক্ষীণজীবী। অন্য কিছু বলবার আগেই তার প্রাণপক্ষীটি দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে শূন্যে উড়াল দেয়। কপাল মন্দ তার—এখন কোথায় সে লীলাবতীর সন্ধান করবে? আর্ত চিৎকারে দীর্ণ দিগন্তরেখায় ধূম্রকুণ্ডলী এবং অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে অভিমন্যুদাসের চিন্তা হয়। লীলাবতীকে নিজ অধিকারে তাকে পেতেই হবে, মৃত অথবা জীবিত, যেভাবেই হোক।

প্রদোষে প্রাকৃতজনের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, লীলাবতী, বসন্তদাস, ছায়াবতী, মিত্রানন্দ, নিরঞ্জন প্রমুখ চরিত্রগুলির শেষ পর্যন্ত কী হলো? কেন তাদের পরিণতি লিপিবদ্ধ হলো না?

এ প্রশ্নের উত্তরে সবিনয় নিবেদন এই যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাই লেখককে অধিক বিস্তারে যেতে সাহসী করেনি। উপরন্তু ঐসব চরিত্রের পরিণতি ইতিহাসে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ।

দুষ্কালের দিবানিশি

বিপুল সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণ, যে কারণেই হোক, এদেশের ইতিহাসে একটি সর্বজ্ঞাত ঘটনা। উল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে কারও কারও বিলুপ্তি এবং কারও কারও আবার শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ, এও আমরা ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। সুধীমিত্র, হলায়ুধ মিশ্র, সোমজিৎ উপাধ্যায় প্রমুখের উত্তরাধিকার যে পরবর্তীকালে স্মার্ত রঘুনন্দনের টোল এবং চতুষ্পাঠীগুলিতে লালিত এবং প্রচারিত হয়েছে—এ বিষয়েও ইতিহাসে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখা হয়নি। সুতরাং লেখকের আর কল্পনার অবকাশ কোথায়?

তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতে পারে শ্যামাঙ্গকে নিয়ে—তার মৃত্যু কি অনিবার্য ছিলো? ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বলতে হয়, হ্যাঁ, অনিবার্যই ছিলো তার মৃত্যু। তার মতো মৃৎশিল্পীকে জীবিত থাকার অধিকার দেয়নি ঐ সময়ের সমাজ-ইতিহাস। কিন্তু সোমপুর মহাবিহারে প্রকীর্তিত শিল্পধারার উত্তরাধিকারী যে, তার নিঃশেষে মৃত্যু কি সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস সম্ভব নয়। দৈহিক মৃত্যু হলেও প্রকৃত মৃত্যু তার হয়নি। তার সমস্ত জীবনোপলব্ধি বীজের মতো প্রোথিত ছিলো অনন্ত জন্মধারাবাহী প্রাকৃতজনের নিত্যসংগ্রামী জীবনবৃত্তের মধ্যে। আর সেই কারণেই কয়েক শতাব্দী পরে পুনর্ভবা তীরে এক মন্দির গাত্রের মৃৎফলকে পুনরায় আমরা অপরূপ শিল্পসুষমা ফুটে উঠতে দেখি। এবং ঐ একই শিল্প সুষমা রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতটের পুত্তলি নির্মাণেও লক্ষ্য করা যায়। যদি কোনো পল্লী বালিকার হাতে কখনও মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কি না—আর যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বের শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগ্য মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও।